প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর
শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৬

বাংলাদেশে আমার সমানধর্মা
আবুল ফজল
বন্ধুবরেষু

ভূমিকা

সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। তিনি আসতেন পূবদিক থেকে, আর আমি যেতুম পশ্চিমদিক থেকে। আলাপ ছিল না, তবে নমস্কারবিনিময় ছিল। একদিন তিনি আমাকে পথের মাঝখানে আটক করে ইংরেজীতে বলেন, "শুনছি আপনি নাকি একজন প্রসিদ্ধ লেখক।" আমি কী বলব, মুচকে হাসি।

তখন তিনি আমার কাছে সরে এসে বলেন, "এই যা মালমশলা পেলেন এ দিয়ে আপনি তিন ভলুম লিখতে পারবেন।"

দিন দুই আগে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমাদের সকলের মন ভরে রয়েছে। আমি বলি, "তা লেখা যায়।"

তিনি এগিয়ে যেতে যেতে আবার পেছন ফেরেন। তর্জনী উঁচিয়ে জোর দিয়ে বলেন, "তিন ভলুম।"

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধহয় পাঞ্জাবী কি সিন্ধী। আজকাল আর তাঁকে দেখতে পাইনে। তাঁর সেই উক্তি কিন্তু ভুলে যাইনি। বাংলাদেশে যা ঘটে গেল তা নিয়ে অনায়াসেই তিন ভলুমের একখানা উপন্যাস লেখা যায়। লেখবার মতো বিষয় বটে। আমি নই, ওপারের কোনো যোগ্যতর পাত্র লিখবেন। যিনি প্রত্যক্ষদর্শী।

তা বলে আমি তো একেবারে নীরব থাকতে পারিনে। আমিও একজন সাক্ষী। দূরের সাক্ষী। আমার বক্তব্য আমি প্রবন্ধ আকারে মাসের পর মাস পেশ করেছি। কারো নজরে পড়েছে, কারো নজরে পড়েনি। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তা আমরা কেউ পূর্বে থেকে অনুমান করতে পারিনি। তাই যখন যেমন মনে হয়েছে তখন তেমন লিখেছি। দিনে দিনে আমার মত বদলেছে।

গোড়ায় যেটা সমর্থন করিনি পরে সেটা সমর্থন করেছি। কিন্তু বরাবরই আমি রক্তপাত এড়াতে, এড়াতে না পারলে সীমার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছি। দুর্ভাগ্য যে প্রাণহানি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মর্যাদাহানি তো অভূতপূর্ব।

সংগ্রামটা যতদিন চলছিল ততদিন আমার অন্তরে বিষাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সংগ্রামের পরেও অনেকদিন অবধি। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর থেকেই আমার বিষাদের ভাবটা কেটে আসছে। ত্রিশ লক্ষের মৃত্যুযন্ত্রণা ভোলা যায় না। আর ওই অগণিত নারীর জীবনযন্ত্রণা! সদ্যোজাত সন্তানের মুখ চেয়ে মা যেমন তার প্রসবযন্ত্রণা ভোলে তেমনি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মুখ চেয়ে ভুলতে হবে এসব যন্ত্রণা।

"শেখ শুভোদয়া" নামে একখানি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই পুঁথির নাম অনুসারে আমার এই গ্রন্থের নামকরণ। এবারেও একজন শেখ বাংলাদেশের পূর্ব গগনে উদয় হয়েছেন। তাঁর উদয়ও শুভোদয়। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ বলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উদয় হয়েছে। তার উদয়ও শুভোদয়।

প্রবন্ধের সংগ্রহে কবিতার সংযোজন প্রচলিত প্রথা নয়। বিশেষ কারণেই এটা করা হলো। এই গ্রন্থটি একহিসাবে একটি স্মারক গ্রন্থ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক। আরো কয়েকটি ছড়াও এই উপলক্ষে লিখেছি। সেগুলি আমার নতুন ছড়ার বইয়ের সামিল হচ্ছে। এগুলিও তার সামিল হবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

শুভোদয়

বঙ্গবন্ধু

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান।

দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবর রহমান।

বাংলাদেশ

তোমার আমার আঁকা পথে
চলবে না ঘটনার ধারা
এঁকে বেঁকে চলবে আপন
খুশিমতো আঁকাবাঁকা পথে।
কী হবে কী হবে কী যে হবে
তুমি আমি ভেবে হই সারা
ইতিহাস তবু বলবে না
ধাঁধার জবাব কোনোমতে!
ধরে নাও হবে যাই চাও
এত ত্যাগ যাবে না বৃথায়
যদি যায় নিরুপায় মন
একদিন মেনে নেবে তাও
আশার প্রদীপখানি জ্বেলে
থেকো তবু মৌন প্রতীক্ষায়
অকস্মাৎ আরো একদিন
মিলে যাবে যাই তুমি চাও।

সোনার অক্ষরে লেখা

চেঙ্গিজকে ভাগিয়ে দিয়ে দম্ভ তার ভাঙালি,
বাঙালী
তৈমুরকে হারিয়ে দিয়ে প্রাণভিক্ষা মাঙালি,
বাঙালী।
নাদিরশাকে বন্দী করে সাজিয়ে দিলি কাঙালী,
বাঙালী।
ইতিহাসের কালি মুছে সোনার রঙে রাঙালি,
বাঙালী।

সংকল্প

অনেকদিন থেকেই আমার সংকল্প যে আমি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ও ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে সহায়তা করব। অবশ্য আমার জীবনের কাজ সাহিত্যসৃষ্টি। সাহিত্যসৃষ্টিতে অমনোযোগী হব না। কিন্তু একজন মানুষ কি কেবল সাহিত্যিক? আর কিছু নয়? আমি শুধু সাহিত্যিক নই, আমি আরো কিছু। আরো অনেক কিছু।

সেইজন্যে, যখনি কোথাও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধে বা ভারত পাকিস্তানের সংঘাত বাধে তখনি অশান্ত বোধ করি। এই অশান্তভাব আমার স্বভাব হয়ে গেছে। আমি আর আপনাকে সামলাতে পারিনে। লিখি একটা কিছু। ছাপাও হয়। আর অমনি গালমন্দ শুরু হয়ে যায়। আরেকদফা অশান্তি।

কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য কাউকে ক্ষেপিয়ে তোলা নয়। আমি চাই যে লোকে পরস্পরের কাছাকাছি আসে, পরস্পরকে বোঝে, বিশ্বাস করে। তেমনি করেই সেতুবন্ধন হতে পারে। দূরে সরে থেকে নয়।

ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র হিন্দুর ইতিহাস নয়। তাই যদি হতো তবে অখণ্ড ভারতবর্ষের জনসংখ্যার চারভাগের একভাগ মুসলমান হতো না। চল্লিশ লক্ষ খ্রীস্টানও থাকত না। দেশভাগের পরেও দেখা যাচ্ছে ছ'কোটি মুসলমান এপারে, এককোটি হিন্দু ওপারে। পাকিস্তানের ইতিহাসও তা হলে কেবলমাত্র মুসলমানের ইতিহাস নয়। সেখানেও খ্রীস্টান আছে, বৌদ্ধ আছে। দেশভাগ মানে লোক ভাগ নয়। ইতিহাস আমাদের সবাইকে একত্র করেছে। দেশ দু'ভাগ হলেও আমরা একত্র। এ সত্য সবসময় মনে রাখতে হবে।

সুখে দুঃখে

যারা পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী তারাই মিলে মিশে এক নেশন গড়তে পারে। যাদের অন্তর পরস্পরের প্রতি বিমুখ তারা এক নেশন গড়বে কোন্ যাদুবলে ?

আমরা এক নেশন গড়ার ব্রত নিয়েছি। আমাদের ব্রত সফল হবে তখনই যখন আমরা এক অপরের সুখে সুখী হব, এক অপরের দুঃখে দুঃখী হব। তা যতদিন না হতে পারছি ততদিন নেশন গড়ার কাজ অসমাপ্ত থাকবে।

কোনো মতে সহ অবস্থানটাই এক নেশন হওয়া নয়। একই রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই যে এক নেশন হওয়া যায় তা নয়। রাষ্ট্র গড়ে তোলা ও নেশন গড়ে তোলা একই কথা নয়। রাষ্ট্র আর নেশন একার্থক নয়।

নেশন গড়ে তোলার সঙ্কেত হচ্ছে এক অপরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া। এর জন্যে খুব বেশী কষ্ট করতে হয় না। ভালোবাসতে পারাই যথেষ্ট। কিন্তু এ সংসারে ভালোবাসাটাই বা ক'জন সত্যি সত্যি অনুভব করে?

ভাত কাপড়ের অভাব শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। কিন্তু ভালোবাসার অভাব তো কেউ বলে না। অথচ মানুষ বলে যারা পরিচয় দেয় তাদের পক্ষে সেইটেই তো আরও স্বাভাবিক হওয়া উচিত।

ধর্মভেদের দরুন আমরা এক সমাজ গড়ে তুলতে পারিনি। যদিও জাপানীরা তা পেরেছে। তারা বৌদ্ধ শিন্তো খ্রীস্টান যে যাই হোক না কেন এক পরিবারে বাস করে। নিজেদের মধ্যে ওরা একটা আপস করে নিয়েছে।

লোকে যখন জাপানের উন্নতির কথা বলে তখন ভেবে দেখে না যে জাপানীদের উন্নতির মূলে তাদের এই সামাজিক একতা। এই সামাজিক একতা আছে বলেই ওরা এত সহজে এক নেশন হতে পেরেছে। নয়তো ওরাও বারো মাস দাঙ্গা করত আর দেশের সব সম্পদ পুড়িয়ে ছারখার করত।

হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টানের এক সমাজ আপাতত আমাদের লক্ষ্য নয়। তার জন্যে দু'চারজন তৈরি হলেও সাধারণ মানুষ তৈরি নয়। কিন্তু নেশন হয়ে ওঠার সংকল্প যারা নিয়েছে, যারা সংগ্রাম করেছে, যারা ত্যাগ করেছে, যাদের নেতা প্রাণ দিয়েছেন তারা যেন তাদের নেশন হওয়ার লক্ষ্যে ফাঁকি না দেয়। ফাঁকি না দিলে কি এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামা যত্রতত্র ঘটে! কে বলবে যে আমরা একটা নেশন!

ভ্রান্তিমোচন

দুটি ধারণা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হিন্দু সাধারণের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্ট চলেছে। দুটি ধারণাই ভুল। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না যে ভুল।

একটি ধারণা হচ্ছে এই যে, অতীতের মুসলমানদের অত্যাচার অপমানের জন্যে বর্তমান কালের মুসলমানরাও দায়ী। অতএব অতীতের অত্যাচার অপমানের জন্যে আজকের দিনের মুসলমানদেরই সাজা দিতে হবে। অমনি করে ঐতিহাসিক অন্যায়ের শোধবোধ হবে।

আর একটি ধারণা হলো পাকিস্তানের মুসলমানদের অত্যাচার অপমানের জন্যে ভারতের মুসলমানরাও দায়ী। অতএব ওপারের অত্যাচার অপমানের জন্যে এপারের মুসলমানদের দণ্ড দিতে হবে সেইভাবেই ওপারের অন্যায়ের শোধবোধ হবে।

এখন কী করে এই দুটি ভুল ধারণার মূলোচ্ছেদ হয় সেই আমাদের ভাবনা। আমরা যদি হিন্দু মুসলমানের সোদর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই তবে এ দুটি ভুল ধারণাকে জীইয়ে রেখে ভ্রাতৃভাব ফিরিয়ে আনতে পারব না।

আমাদের ইতিহাসে মন্দ ঘটনা নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিন্তু ভালো ঘটনা মহৎ ঘটনা কি একেবারে নেই? এমন অনেক মুসলিম রাজারাজড়া ছিলেন যাঁদের দৃষ্টিতে সব প্রজাই সমান। প্রজাদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম ভেদ নেই। এঁদের পেছনেও বহু হিন্দু ছিল হিন্দুদের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা এঁদের রাজত্বের স্তম্ভ ছিল। সেইজন্যে মুঘল রাজত্বের অবসানে হিন্দুরাও দুঃখিত হয়েছে। পরে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন হিন্দু

বিদ্রোহীরাও চেয়েছিল মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে হিন্দুস্থানের সম্রাট করতে। তখন মরাঠা পেশোয়াব বংশধরও তাই চেয়েছিলেন।

শতখানেক বছর আগেও যে ঐক্যবোধ ছিল সে ঐক্য অটুট থাকলে দেশভাগ হতো না। দেশভাগ হয়েছে বলে কি আমরা সবাই এতদূর পর হয়ে গেছি যে পরস্পরের উপর আঘাত প্রত্যাঘাতই হবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যক্রম? একদিন না একদিন এর থেকে নিবৃত্ত হতে হবে। ইচ্ছা করলে আজকেই নিবৃত্ত হওয়া যায়।

পাকিস্তানে মন্দ লোক যেমন আছে মহৎ লোকও তেমনি আছেন। মন্দ কাজ যেমন হচ্ছে ভালো কাজও তেমনি হচ্ছে। পাকিস্তানীদের অন্যায়ের প্রতিকার ভাবতে হতে পারে না। যেখানকার অন্যায় সেখানেই তার প্রতিকার খুঁজতে হবে। প্রতিকার হবেও। সে আশা আছে। পৃথক হয়ে গেলেও ওরা তো আমাদের পর নয়। আমাদেরি স্বজন ওরা। সর্বদা মনে রাখতে হবে। আমি মিটমাটে বিশ্বাস করি!

পেছন ফিরে তাকানো

পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। তেইশ বছর আগে আশঙ্কা হয়েছিল যে দেশ ভাগ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকভাগ হয়ে যাবে। পাকিস্তানে একজনও হিন্দু থাকবে না। ভারতে একজনও মুসলমান। লোকবিনিময়ের সেই অসীম সম্ভাবনা পরে সীমার মধ্যে আসে। কতক লোক এপার ওপার করে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাঞ্জাব। সে বেদনা কোন পক্ষ ভূলতে পারেনি। সে অপরাধও ক্ষমা করেনি।

যত বড়ো বিপর্যয়ই ঘটে থাকুক না কেন এতদিনে তা বাসি হয়ে গেছে। মানুষ ক্রমাগত নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। নতুনের কথা না ভেবে পুরোনোর স্মৃতি পুষে রাখলে নতুনও তো সাড়া দেবে না। মনে করুন, পূর্ব পাকিস্তান বছর বছর বানে ভাসছে। সে সমস্যার তো প্রতিকার চাই। কিংবা ধরুন, পশ্চিম বঙ্গের প্রাণগঙ্গা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান করা দরকার। এইসবই আগে। লোকবিনিময় পরে।

কাজেই হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের মুখ দর্শন না করার সম্ভাবনা আধখানা হয়েই রইল। সে ঝোঁকটা কেটে গেছে বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে শরণার্থী সমাগম হচ্ছে, কিন্তু তা নিয়ে দোষারোপের ধারা বদলে গেছে। ওপারের বাঙালী মুসলমানকে কেউ দোষ দিচ্ছে না। সেইজন্যে এপারের বাঙালী মুসলমানকে ভিটেছাড়া করার ভাবনা ভাবছে না। দোষ যারা দেয় তারা দেয় ওপারের পশ্চিমা ধর্মান্ধদের। যারা ভোটে জিততে চায়। কিংবা দেয় ওপারের অর্থনৈতিক অবস্থাকে। যার উপরে সাধারণ মুসলমানের হাত নেই।

লোকবিনিময়ের অধ্যায়টা যে শেষ হয়ে গেছে এর জন্যে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছি। যারা এপারে রয়ে গেল তারা এপারেরই চিরদিনের অধিবাসী হয়ে গেল। তেমনি ওপারে রয়ে গেল যারা তারা ওপারেরই চিরন্তন নাগরিক। এপারের মুসলমানের নিয়তি এইপারের হিন্দুর নিয়তির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। তেমনি ওপারের হিন্দুর নিয়তি ওইপারের মুসলমানের নিয়তির সঙ্গে। নিয়তির পরিবর্তন এক আধজনের বেলা ঘটতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনের বেলা নয়। আমি আশা করি সম্প্রতি যেসব শরণার্থী এসেছে তারা ওপারের নির্বাচনের পরে স্বস্থানে ফিরে যাবে ও শান্তিতে বসবাস করবে। ওপারের অর্থনৈতিক অবস্থাও তাদের অনুকুল হবে।

এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার উপর শেষবার যবনিকা পড়লেই বাঁচি।

এই প্লেগ

"ইউরোপের মাটিতে ইহুদীবিদ্বেষ এখন এণ্ডেমিক হয়ে গেছে।" বলেছিলেন আমাকে আমার এক বন্ধুজায়া। ইহুদীবংশীয়া। তাঁর সেই বিষণ্ণ মুখ আমার এখনো মনে পড়ে।

এখন আমিও তেমনি বিষণ্ণ মুখে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভারতের মাটিতে মুসলিমবিদ্বেষ প্রায় এণ্ডেমিক হয়ে গেছে। লোকে আর গান্ধীবাদীদের উপর ভরসা রাখে না, পুলিশকেও বিশ্বাস করে না, কথায় কথায় মিলিটারির উপর বরাত দেয়।

আর মিলিটারি এসে দাঙ্গা থামিয়ে দেয় সত্যি। কিন্তু এই সম্প্রতি কোনো এক পত্রিকায় পড়লুম যে আহমদাবাদের কোনো এক অঞ্চলে বুকে হাঁটার হুকুম জারি হয়েছিল। তাই যদি হয়ে থাকে তবে অর্ধশতাব্দী পূর্বে পাঞ্জাবে যে ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই স্বস্থানে আবার সেই ঘটনাটি ঘটেছে। তাঁর জীবনের কাজ এইভাবে অকৃত করা হয়েছে। যেন গান্ধী বলে কেউ একজন জন্মাননি, যেন সারাজীবন ধরে অহিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ করেননি। তাই হিংসার প্রতিরোধ করতে হচ্ছে আরো বড়ো হিংসা দিয়ে। বুকে হাঁটিয়ে।

বিদেশীরা ছবি তুলে নিয়ে টেলিভিশনে দেখিয়েছে আমরা কেমন বর্বর হয়ে গেছি। যারা এত বর্বর তাদের উপর যদি বুকে হাঁটার হুকুম জারি হয় তবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? মানুষ মানুষকে যেভাবে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মেরেছে বলে শোনা যায় তারপরে আর বুকে হাঁটার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর কোথায়? বুদ্ধিজীবীরা হতভম্ব।

আজকাল ইংরেজ নেই। তাই যত দোষ ইংরেজের বলে হাত ধুয়ে ফেলতে পারা যায় না। ইদানীং কয়েক বছর থেকে পাকিস্থানেও হিন্দুনিধন হয় না। সুতরাং যত দোষ পাকিস্তানের বলে সাফাই গাওয়া চলে না। আজকাল যত্র তত্র যখন তখন যে কোনো ছলে হিন্দু মুসলমানের সংঘাত বাধে। সকল ঘটনাই ভারতের মাটিতে।

কেউ কেউ বলছেন যে অধিকাংশ ঘটনার সূচনা নাকি মুসলমানকে দিয়ে। আর তার পেছনে নাকি পাকিস্তানের হাত। এই দুটি উক্তি এখনো প্রমাণিত হয়নি। বিনা প্রমাণে এসব উক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এসব উক্তি যাঁরা করছেন তাঁরা যে প্রত্যেকটি ঘটনার খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে জেনেছেন তা নয়। কিংবা সরকারী নথিপত্র দেখেছেন তাও নয়। এসব দায়িত্বহীন উক্তির পরিণাম হবে আরো বেশী মুসলিমবিদ্বেষ।

আহমদাবাদের মিউনিসিপাল নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করতে পেরে কোনো একটি দল মিছিল বার করে ও আওয়াজ দেয়, "গদ্দর হর মুসলমান। ভেজো উস্‌কো পাকিস্তান!" বিশ্বাসঘাতক সব মুসলমান। পাঠাও ওদের পাকিস্তান! এর দিন চারেক পরেই দাঙ্গা!

দাঙ্গার উপলক্ষ যাই হোক না কেন উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসঘাতক সব মুসলমানকে পাকিস্তানে চালান দেওয়া। তা হলে তাদের জমিবাড়ী দখল করে ভোগ করা যেত। আহমদাবাদে এক টুকরো জমি এখন অগ্নিমূল্য। বস্তিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলে বিনামূল্যে জমি পাওয়া যায়। এ খেলা আমরা কলকাতাতেও দেখেছি।

ধর্মের নামে যা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ধর্মের অংশ অল্পই থাকে। ধর্মযুদ্ধের যুগ এটা নয়। সে যুগ যখন ছিল তখনো এমন দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল না। লোকের মনে এ পরিমাণ মুসলিম বিদ্বেষ

বা হিন্দুবিদ্বেষ ছিল না। ইংরেজ আমলে অধিকাংশ দাঙ্গার মূলে ছিল চাকরিবাকরি নিয়ে মধ্যবিত্তদের দাবীদাওয়া, আইনসভার আসন বা মন্ত্রীমণ্ডলের ক্ষমতা নিয়ে রাজনীতিকদের দ্বন্দ্ব, জমিদার মহাজনদের শোষণ নিয়ে চাষীখাতকদের বিক্ষোভ।

নূতন আমলে স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি ও চাকরিবাকরিতে নির্দিষ্ট ভাগ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানরা একেবারে পথে বসেছে। প্রতিযোগিতায় ওরা পারে না। যেসব জায়গায় প্রতিযোগিতা হয় না সে সব জায়গায় তো ওরা পাত্তাই পায় না। ওদের ছেলেরা আপনা হতেই পাকিস্তানে চালান যায়। ওদের জোর করে ঠেলতে হয় না। যারা যাবে না তারা বেকার হয়ে চোখের জল ফেলে। আমিও ওদের জন্যে চোখের জল ফেলি। কিন্তু প্রতিকারের নতুন কোনো উপায় খুঁজে পাইনে। ইংরেজ আমলের মতো সংখ্যানুপাতে চাকরি বা আসন আমার বিবেচনায় ভুল। তার দরুন যোগ্যতরের উপর অবিচার হয়। আমি নিজেই ভুক্তভোগী।

ইতিহাসে এরকম ব্যাপার অন্যান্য দেশেও ঘটেছে। ক্যাথলিক বা নন্‌কনফরমিস্ট বা ইহুদীর পক্ষে চাকরি পাওয়া বা পার্লামেণ্টে যাওয়া ইংরেজদের দেশেও প্রায় অসম্ভব ছিল। ওরা তা বলে নিরুদ্যম হয়নি। চাষবাস ব্যবসাবাণিজ্য কারুশিল্প কলকারখানা ব্যাঙ্কিং প্রভৃতিতে উন্নতি করেছে। কেউ ওদের হটাতে পারেনি।

চকোলেট নির্মাতা কোয়েকাররা একবার বিজ্ঞাপনে বলেন যে তিনশো বছর আগে কোয়েকার সম্প্রদায় চাকরিবাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্যবসাবাণিজ্যে মনোযোগ দেন। তাঁরা অস্ত্রধারণে বিশ্বাস করেন না বলে মিলিটারি চাকরিও করবেন না। সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থা থেকে তাঁরা এখন বিপুল বিভবের মালিক হয়েছেন। আর সে বিভবের সদ্ব্যয় করছেন। তাঁদের শাপে বর হয়েছে। তাঁদের কোনো খেদ নেই। এখন তো রিচার্ড নিক্‌সন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কোয়েকাররা রাজত্ব চালাতেও পারেন।

মুসলমানরা কোয়েকারদের মতো অহিংসাবাদী নন। মিলিটারি চাকরিতে তাঁদের অরুচি নেই। ইতিমধ্যে বহু মুসলমান মিলিটারিতে গেছেন। আরো যেতে পারেন। চাকরি সমস্যার সেটাও একটা সমাধান। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন পুলিশ বিভাগেও মুসলমান নেওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের দৃঢ়তর আস্থার জন্যে।

আইনসভার আসন সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রভৃতি দল যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছে। আলাদা একটা সাম্প্রদায়িক দল গঠন না করে সেকুলার দলগুলিতে যে যার রুচিমতো যোগদান করতে পারেন। ইংলণ্ডেও তাই হয়। পার্লামেন্টারি প্রথা আমরা যেদেশ থেকে নিয়েছি সেদেশে কোনো সাম্প্রদায়িক দল নেই।

মোট কথা স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি বা সংখ্যা অনুপাতে চাকরিবাকরি আর ফিরবে না। মুসলমানদের কেউ কেউ স্বপ্ন দেখছেন যে ফিরবে। সেটা অবাস্তব। যেটা সম্ভব সেটা এই যে সকলের জন্যে সব ক'টা দরজা খোলা থাকবে, কোথাও কারো উপরে অবিচার করা হবে না। ধর্মবিশ্বাসের দরুণ কেউ যোগ্যও হবেন না, কেউ অযোগ্যও হবেন না।

যা নিয়ে এদেশে সব চেয়ে রক্তারক্তি হয়ে থাকে তার নাম গোরু। আহমদাবাদেও গোরুর গুঁতো খেয়ে মুসলমান জখম হয়। তার থেকে আসে মন্দিরের উপর হামলা। যে মন্দিরের গোরু সেই মন্দিরের উপর।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের বহু রাজ্যে গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ। সেটা যদি মুসলমান সম্প্রদায়েয় সম্মতি নিয়ে হতো তা হলে গোল বাধত না কিন্তু হয়েছে নিছক হিন্দুর ভোটে। গণতন্ত্রে অধিকাংশের ভোট অনুসারে কাজ হয়। সুতরাং কাজটা অগণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু গণতন্ত্রের এটাও একটা কনভেনশন যে ধর্মসংক্রান্ত

বিষয়ে অধিকাশের ভোটই যথেষ্ট নয়। তেমনি খাদ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে। বাঙালীরা মাছ খায়, বিহারীরা আগে খেত না, আজকাল খাচ্ছে। বিহার যদি আইন করে মাছ খাওয়া বারণ করে দেয় সেটা গণতন্ত্রবিরুদ্ধ হবে না, অথচ গণতন্ত্রের স্পিরিট তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ সেইজন্যে গোহত্যা নিষেধ করেনি, অন্য যারা নিষেধ করেছে তারা মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়েছে। বিক্ষুব্ধ মন দাঙ্গার দিকেই ঝোঁকে।

মসজিদের সামনে বাজনা নিয়েও রক্তারক্তি বড়ো কম হয়নি। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট থেকে রুলিং দেওয়া হয়েছে যে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তায় বাজনা বাজিয়ে যাবার অধিকার সকলের আছে। রুলিং পেয়ে হিন্দুরা যেমন খুশি মুসলিমরা তেমনি অখুশি। এই নিয়ে কটকে বেধে গেল দাঙ্গা। ব্যাপার এতদূর গড়াল যে এক মুসলমান বাড়ীতে বোমা ফেটে বহু লোক মারা গেল। নিজেদেরই বোমায় নিজেরা নিপাত। এর থেকে বোঝা যায় মুসলমানরা মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে কী পরিমাণ উত্তেজিত।

কেন তাদের উপাসনার সময় বাজনা বাজিয়ে যাওয়ার জেদ ধরা? আগেকার দিনে নিয়ম ছিল উপাসনার সময়টা বাদ দিয়ে অন্য সময় বাজনা বাজাতে পারা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এখনো সে নিয়ম মেনে চলা হয়।

আরো এক বিবাদের বস্তু উর্দূ ভাষা। ভাষাটা হিন্দু মুসলমানে মিলে বিবর্তন করেছে। সেটা কারো একার বিবর্তন নয়। পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশে বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দূ। হিন্দীর জয় হোক, তা বলে উর্দূর লয় হবে কেন? কিন্তু গত বাইশ বছর ধরে উর্দূর উপর যে অবিচার হয়েছে তা দেখে মুসলমানদের অনেকের মনে আশঙ্কা জন্মেছে যে উর্দূ ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে। আশঙ্কাটা হয়তো অতিরঞ্জিত তবু সেটা সত্যিকার। সত্যিকার আশঙ্কাকে চোখ বুজে অস্বীকার করা উচিত নয়।

পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের একটি যোগসূত্র হলো বাংলা, অপরটি উর্দু। এ দুটি যোগসূত্র ছিন্ন হলে ভারত পাকিস্তান সর্বতোভাবে বিদেশ। বাংলার যোগসূত্র যাতে ছিন্ন হয় তার জন্যে পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এখনো হাল ছাড়েননি। উর্দুর যোগসূত্র যাতে ছিন্ন হয় সে চেষ্টাও কি উত্তরভারতের শাসক বা প্রভাবশালী সম্প্রদায় করেননি ? মুসলমানকে হিন্দু করা সম্ভব নয়, কিন্তু হিন্দীভাষী করা সম্ভব। বিতাড়নের মতো সেটা অত নিষ্ঠুর নয়, কিন্তু সেটাও একপ্রকার জবরদস্তি।

নাম না করলেও সকলে বুঝবেন যে আমাদের এই সেকুলার রাষ্ট্রে এমন একটি দল আছে যে মুসলমানকে পারলে বিতাড়ন করবে, না পারলে হিন্দু বানাবে। তাও যদি বা পারে তবে সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দুতে পরিণত করবে। হিন্দ্, হিন্দী, হিন্দু—এই হলো তার জাতীয়তাবাদের ত্রিনীতি ; গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ের আদর্শে তার মৌল আপত্তি। যেমন মুসলিম লীগেরও তাতে মৌল আপত্তি। গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ের আদর্শ যদি হটে যায় তবে হিন্দ্ হিন্দী হিন্দু জাতীয়তাবাদ মুসলমানকে কোণঠাসা করবে।

গুজরাটীদের নাকি বোঝানো হয়েছিল যে, মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান বলে একটা দেশ যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন মুসলমানরা কেন এদেশে থাকবে। বাইশ বছর বাদে আবার সেই মৌল প্রশ্ন উঠেছে। আমরা যে আমাদের দেশের নাম রেখেছি ইণ্ডিয়া বা ভারত, আমরা যে সব সম্প্রদায়ের জন্যে আমাদের দরজা খোলা রেখেছি ও সেইজন্যে আমাদের রাষ্ট্রকে করেছি সেকুলার স্টেট, আমরা যে বহুভাষী তথা বহুধর্মী নেশনে বিশ্বাস করে এসেছি, আমরা যে তেমন একটি নেশনের জন্যে সংগ্রাম করেছি, আমরা যে আমাদের ভবিষ্যতের সংগ্রামেও সবাইকে ডাক দিতে চাই, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি যে একটি মিশ্র সংস্কৃতি যাতে মুসলমানেরও প্রভূত দান আছে, আমাদের ইকনমি যে একটি মিশ্র ইকনমি যাতে মুসলমানেরও একটা

ভূমিকা আছে - সাধারণ হিন্দুকে এসব বোঝাবে কে? একাজে অবহেলা ঘটেছে বলেই বাইশ বছর বাদে সাম্প্রদায়িক প্রচারকরা লোকের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।

আমরা মুসলমানদের ছেড়ে ভারতীয় হতে পারিনে। আমাদের ভারতীয়তা তাদের থাকার উপর নির্ভর। মুসলমানরা যদি চলে যায় তা হলে আমরা ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারব না। আমাদের পরিচয় হবে হিন্দুস্থানী। আমাদের দেশের নাম হবে হিন্দুস্থান। বলা বাহুল্য পাকিস্তানীরাও ঠিক এই জিনিসটি চায়। আমরা যে ভারতীয় বলে পরিচয় দিই এটা তাদের গায়ে লাগে। তাদের মতে ভারতীয় কেউ নয়, তাদের বিচার অনুসারে ভারত বলে কোনো দেশ নেই। যা আছে তা হিন্দুস্থান ও হিন্দুস্থানী। ভারতের এক ভাগকে ভারত বলে স্বীকার করতেই পাকিস্তানীদের বাধে। এক ভাগের অধিবাসীদের ভারতীয় বলে মেনে নিতেই তাদের অনিচ্ছা। এতে তাদের কেস দুর্বল হয়ে যায়। কাশ্মীরের উপর তাদের দাবী কেঁচে যায়।

অথচ ঠিক পাকিস্তানীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল যা বলছে তা জাতীয়তাবাদের মতোই শোনাচ্ছে। এরা যখন 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন কেবলমাত্র হিন্দুদের বাসভূমি অর্থেই ব্যবহার করে। আর যখন 'ভারতীয়' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন কেবলমাত্র হিন্দু অর্থেই। একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করলে লোকের মনে ধাঁধা লাগে। এক্ষেত্রে লোকের মাথা ঘুলিয়ে গেছে।

সুতরাং পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে, ভারত হচ্ছে সর্ব সম্প্রদায়ের সাধারণ বাসভূমি, যদিও তার কতক অংশ পৃথক হয়ে গেছে। তেমনি ভারতীয়তা হচ্ছে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে স্থিত জাতীয়তা।

॥ ২ ॥

"এই প্লেগ" পড়ে পাঠকমহলে ঝড় উঠবে এটা আমার অপ্রত্যাশিত নয়। বিষয়টাই বিতর্কমূলক কিন্তু বিতর্কেরও একটা নিয়ম আছে। যার সঙ্গে মতের অমিল তার সদিচ্ছায় সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। ব্যক্তিগত আক্রমণের তিক্ততা লক্ষ করে আমি দুঃখিত।

যেদেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা সেদেশে বিরোধ মাঝে মাঝে বাধবেই। তখন সংখ্যালঘুর দিক থেকে দুটি কথা বলা আমার পবিত্র কর্তব্য। যারা ভাষাগত সংখ্যালঘু তাদের পক্ষেও কি লিখিনি? আবার আসামের পার্বত্য উপজাতিদের পক্ষেও লিখেছি। লিখেছি খ্রীস্টানদের পক্ষেও, যখন গির্জা পোড়ানো হয়। আমার সংখ্যালঘু-প্রীতি যদি একটা অপরাধ হয় তবে আমি সে অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তোষণের অভিযোগ ওঠে কেন? আমি কি রাজনীতির লোক?

হিন্দু মুসলমান নিয়ে আমি ত্রিশ বছর বয়স থেকে পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত বয়স লিখে আসছি। অনেক সময় মুসলমানদের সমালোচনাও করেছি। তাদের যে দোষ নেই তা নয়। তারজন্যে মাঝে মাঝে কড়া কথাও বলেছি। তাদের দিক থেকেও গালাগালি শুনতে হয়েছে। আমি যে নিরপেক্ষ হতে পারি এটা হিন্দুরাও মানবে না, মুসলমানরাও কি মানবে?. কী জানি কী একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। এটা দু'পক্ষেরই ধারণা।

উদ্দেশ্য একটা আছে বইকি। না থাকলে আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাতে যেতুম না। ভারতের মুসলমান সুখে শান্তিতে বাস করলে পাকিস্তানের হিন্দুও সুখে শান্তিতে বাস করবে। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জীবন সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হলে দুই রাষ্ট্র এক না হোক একজোড়া হতে পারবে। কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স, কমন ফরেন পলিসি একদিন সম্ভব হবে। মাঝখানে তৃতীয় পক্ষ না থাকলে ইতিমধ্যেই সম্ভব হতো।

কিন্তু এখন যে দৃশ্য দেখছি তাতে আমার ও আমার মতো অনেকের পূর্বধারণা ধূলিসাৎ হতে বসেছে। এখন আর তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করা যায় না। দায়ী এমন একদল লোক যারা চারিদিকে প্লেগ ছড়িয়ে চলেছে। প্লেগ হলেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি নয়। আমি বেঁচে থাকতেই চোখে দেখতে চাই কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স প্রভৃতি। এ না হলে ভারত পাকিস্তান পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার শানিয়ে চলবে, যুদ্ধপ্রস্তুতির খরচ জোগাতে গিয়ে দুই রাষ্ট্রই হবে দেউলে, লোকে খেতে না পেয়ে চুরি ডাকাতী করবে, সকলের জীবন থেকে নিরাপত্তা চলে যাবে। এ আমাদের স্বখাত সলিল।

তা ছাড়া আমি দেখতে পাচ্ছি যে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকমুখে আরো অনেক ভয়ানক কথা শুনেছি। কিন্তু প্রকাশ করিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল গোড়ার কারণগুলো উদ্ধার করে দেখানো, যাতে আমরা সেসব কারণ দূর করতে যত্নবান হই। গোরু নিয়ে ঝগড়া সাতশো বছর ধরে চলে এসেছে, থামবে না যদি আমরা থামিয়ে না দিই। মসজিদের সামনে বাজনাও সাত শতাব্দীর ঝগড়ার বিষয়। আমার প্রবন্ধ পড়ে শ্রীঅমরপতি কুমার প্রমুখ কয়েকজন পত্রপ্রেরক লিখেছেন, "গোরু নিয়ে যাঁরা একটু গভীর চিন্তা করেন, তাঁরাই জানেন, স্বাস্থ্য আর অর্থনীতি ধর্ম আর শ্রদ্ধারোধ সকল দিক থেকেই ভারতে গোহত্যা অনুচিত, এ রায় সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চের এবং বেশ ক'টি মুস্লিম সংগঠনের ও অসংখ্য শিক্ষিত মুসলমানের।"

আমিও তো দেশেই থাকি ও আইনকানুনের ধার ধারি। সুপ্রীম কোর্ট তেমন কোনো রায় দিয়ে থাকলে আমার নজরে পড়ত। 'যুগান্তর' যখন লক্ষাধিক পাঠককে এই পত্র পড়ার সুযোগ দিয়েছেন তখন প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করার দায়িত্বও 'যুগান্তর' সম্পাদকের। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে গোহত্যার ভালো

মন্দ বিবেচনা করার জন্যে ভারত সরকার থেকে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট এখনো তৈরি হয়নি। কমিটি কী সুপারিশ করেন তা যথাকালে পাঠকরা জানতে পাবেন। আপাতত মনে রাখবেন যে ভারতের সব ক'টি রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়নি বলেই পুরীর শঙ্করাচার্য আন্দোলনে নামবার কথা বলছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেক'টি রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ সেক'টি রাজ্য হিন্দীভাষী বা হিন্দীপ্রেমী। যেমন গুজরাট ও মহারাষ্ট্র। ঠিক এই রাজ্যগুলিতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এণ্ডেমিক।

শিলং থেকে ফেরার সময় দেখি শত শত গোরু খেদিয়ে নিয়ে চলেছে কারা সব শিলং অভিমুখে। জিজ্ঞাসা করি অসমীয়া বন্ধুদের। উত্তর পাই, "যারা নিয়ে চলেছে তারা নেপালী। যাদের জন্যে তারা পাহাড়ী। খাবে।" এখন পাহাড়ীদের খোরাক থেকে তাদের বঞ্চিত করার সাধ্য কোন্ সরকারের আছে! নাগারাও গোরু খায়। নাগাল্যাণ্ডে গোহত্যা নিষেধ করতে গেলে তারা আরেক দফা বিদ্রোহ করবে। হিন্দুদের গোঘটিত সংস্কার যদি তারা আর সকলের উপর আইন করে চাপাতে যায় তবে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনবে। তা ছাড়া পাদুকাশিল্পটিও হারাবে। ভারতের কোথাও আর জুতো তৈরি হবে না, ভারত থেকে জুতো রপ্তানী হবে না। বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়বে।

শ্রীমান্ সমীর চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী এণ্ডেমিক শব্দটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি হয়তো কোনো পুরেনো অভিধান থেকে পাওয়া। কন্‌সাইজ অকসফোর্ড ডিকসনারীর অপেক্ষাকৃত নতুন সংস্করণে লিখেছে,

1. "Regularly found among (specified) people, in (specified) country."

2. "Endemic disease."

এই প্লেগ একটি এণ্ডেমিক ব্যাধি। এটি নিয়মিতভাবে পাওয়া

যায় ভারত-পাকিস্তান নামক নির্দিষ্ট একটি দেশে। হিন্দু-মুসলমান নামক নির্দিষ্ট একটি লোকসমষ্টিতে। দেশভাগ করে এর অবসান হয়নি। কারো কারো মতে লোকভাগ করলেই এর অবসান হতো। এই কথাটা আমাকে চিঠি লিখে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমার এক-জন পুরাতন আলাপী, রাজশাহী ছেড়ে মুর্শিদাবাদে শরণার্থী। তাঁর বক্তব্য, দেশভাগ যখন হলো তখন লোকবিনিময় হওয়া উচিত ছিল। তা হলে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধত না। তা যখন হয়নি তখন দাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী। হয় লোকবিনিময় ঘটাও, নয় দেশভাগ রদ কর। কিন্তু দেশভাগ রদ করলেও কি দাঙ্গা দূর হবে? দেশভাগের আগে কি দাঙ্গা বাধত না?

আর লোকবিনিময় কথাটার মানে তো এই যে, এক কোটি পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু ভারতে চলে আসবে ও ছয়কোটি ভারতীয় মুসলমান পাকিস্তানে চলে যাবে। মনে করা যাক তাই হলো। তখন দেখা যাবে ভারতের তিন কোটি মুসলমানকে বসানো হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে আর তিন কোটি মুসলমানকে পূর্ব পাকিস্তানে। এই যে তিন কোটি মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে বসতি করবে তাদের মধ্যে আধকোটি হবে বঙ্গভাষী মুসলমান। বাকী আড়াই কোটি উর্দুভাষী। ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে আধকোটির মতো উর্দুভাষী মুসলমান বসতি করেছে। পরিপূর্ণ লোকবিনিময়ের পর উর্দুভাষীদের সংখ্যা দাঁড়াবে তিনকোটি। পূর্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে তিনকোটি উর্দুভাষী মুসলমান যদি চাপে তা হলে সেখানকার বঙ্গভাষী মুসলমানদের দশা কী হবে? এমনিতেই পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠেছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। এর পরে হবে উপনিবেশেরও অধম।

তারপর যে এককোটি হিন্দু ভারতে চলে আসবে তাদের সবাই তো পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পাবে না। তাদের মধ্যে থেকে আধকোটিকে যেতে হবে দণ্ডকারণ্যে, মহারাষ্ট্রে, মধ্যপ্রদেশে, ওড়িশায়, আন্দামানে। আসামে তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না, পাছে অসমীয়ারা সংখ্যালঘু

হয়ে যায়। যেখানেই তারা যাবে সেখানেই তাদের থাকতে হবে সংখ্যালঘু হয়ে। ধীরে ধীরে তাদের ছেলেরা অবাঙালী বনে যাবে। আর নয়তো স্থানীয় লোকের বিরাগভাজন হবে। এক শতাব্দী বাদে তারা হবে আর একদল ইহুদী। ভাষাগত সংখ্যালঘু হয়ে তাদের এমন কী লাভ হবে কালকের ভারতে, যে ভারত প্রাদেশিকতায় জর্জর, যার সূচনা শিবসেনায়?

লোকবিনিময় হচ্ছে একপ্রকার বঙ্গালখেদা। পশ্চিবঙ্গের মুসলমানকে খেদানো মানে বঙ্গালখেদা। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুকে খেদানো মানেও বঙ্গালখেদা। পূর্ব পাকিস্তান আর বঙ্গালখেদা চায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনো কতক লোক আছে যাদের কাম্য বঙ্গালখেদা। সংখ্যালঘুকে এরা সহ্য করতে পারে না। সংখ্যালঘুকে চাকরিবাকরির ভাগ দিতে এদের আন্তরিক আপত্তি। হিন্দুর ছেলেরাও বেকার তা ঠিক, কিন্তু হিন্দুর ছেলেরাই সর্বঘটে। তাদের উপরেও অবিচার হয় তা ঠিক কিন্তু ধর্মের জন্যে বাছবিচার হয় মুসলমানের ছেলেদের বেলাতেই।

এ ছাড়া আরো একটা কথা আমাকে ভাবায়। শিক্ষিত মুসলমান যদি এখানে কাজকর্ম না পেয়ে ওখানে যান তবে মুসলমান সমাজে শিক্ষিত শ্রেণী বলে একটা জিনিস থাকবে কী করে? মুসলিম সমাজের সমালোচনার দায়, সংশোধনের দায়, সংস্কারের দায় তা হলে নেবে কে? এ কাজ কি হিন্দুর কাজ? হিন্দুর কথায় মুসলমান মেয়েরা পর্দা ছাড়বেন? মুসলমান পুরুষেরা বহুবিবাহ ছাড়বেন? ওঁদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার প্রসার হবে? মুসলমানদের নিয়ে সমাজসংস্কার পাকিস্তানে এই বাইশ বছরে বেশ কিছুটা হয়েছে, কিন্তু ভারতে হয়নি। তার কারণ কি এই নয় যে শিক্ষিত মুসলমান ওখানে অনেক, এখানে মুষ্টিমেয়?

আমরা যখন আশা করি যে মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে মিলে একই সিভিল কোডের দ্বারা শাসিত হবে তখন আমাদের বোঝা

উচিত যে এর জন্যে চাই শিক্ষিত মুসলমানদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা। কিন্তু কোথায় সেই শিক্ষিত মুসলমান যাঁকে বলব, "আসুন, সিভিল কোড একাকার করা যাক?" যে দু'চারজন আছেন তাঁরা তাঁদের সমাজের হয়ে কথা দিতে পারবেন না। মোল্লারা তাঁদের মাথা নেবে। একটি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেশভাগ হয়ে গেল আর তাঁদের অধিকাংশই পাকিস্তান বরণ করলেন। আবার গড়ে তোলা দরকার। এতে হিন্দুরও স্বার্থ আছে। কারণ মুসলমান সমাজ পিছিয়ে থাকলে হিন্দু সমাজও পিছিয়ে থাকবে। কবি বলে গেছেন, "যারে তুমি পিছে রাখ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" মুসলমানকে পেছনে রেখে হিন্দু যদি এগিয়ে যেতে চায় তো সেটা খুব বেশীদূর নয়।

কাল হঠাৎ এক মুসলিম অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ। আমি যা লিখেছি তা তিনি দেখেছেন। বললেন,"কেন আপনি এসব লিখেছেন? আপনি কি মুসলমানের সেভিয়ার?"

আমি চমকে উঠি। বলি, "না, আমি চাই হিন্দুদের সংযত করতে। নইলে ওরা একদিন ফাসিস্ট হয়ে উঠবে।"

তিনি বললেন, "তা হলে চুপি চুপি বলি, হিন্দুরা ফাসিস্ট হবে কী, ফাসিস্ট হয়েছে।"

ইতিমধ্যে জানতে পেয়েছি যে আহমদাবাদের এক জায়গায় গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্ররা হিন্দু গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিয়ে মুসলমান পুরুষের প্রাণ ও নারীর মান রক্ষা করেছে। একজন হিন্দু নারী আরো বড়ো সাহসের কাজ করেছেন। তলোয়ার ধরে একাই একদল হিন্দুর হাত থেকে একাধিক মুসলমানকে বাঁচিয়েছেন। তেমনি মুসলমানরা হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছে। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

'পূর্ব পাকিস্তান'

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার বা উত্তরাধিকার ঘটিত অব্যবস্থতার সুযোগ নিয়ে উত্তর পশ্চিমের বা উত্তরপূর্বের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রথমবার দেখা গেল উত্তর পশ্চিমের কয়েকটি প্রত্যন্ত প্রদেশ তথা উত্তর পূর্বের একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নতুন একটি কেন্দ্রীয় শাসন সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাসে বেনজীর এই সৃষ্টি আপনার নামকরণ করেছে পাকিস্তান। তার থেকে এসেছে একপ্রান্তের নাম পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব বাংলা বলতে যেমন বোঝায় পশ্চিম বাংলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তান বলতে তেমন নয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান পরস্পরের প্রতিবেশী নয়। তাদের মধ্যে প্রতিবেশিতা নেই। যা আছে তার নাম সহধর্মিতা। পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে সেই ভূখণ্ড যা পাকিস্তান নামক একটি দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকের দ্বীপ। সেই দ্বীপের অধিবাসীরা সমুদ্রপথে বা আকাশপথে পশ্চিমদিকের দ্বীপগুলিতে যাওয়া আসা করে। স্থলপথের অস্তিত্ব তাদের দিক থেকে অবান্তর।

কিংবা বলা যেতে পারে পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে বেলজিয়াম আর পশ্চিম পাকিস্তান হচ্ছে স্পেন। ক্যাথলিক ধর্ম যাদের একসঙ্গে গেঁথেছিল। ভারতের ইতিহাসে বেনজীর, কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে নজীর আছে। লোকের কাছে ধর্ম যতদিন একমাত্র বিবেচ্য ছিল ততদিন সে ব্যবস্থা বহাল ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে ভাষাও আর একটা বিবেচ্য। অর্থনীতিও অন্যতম বিবেচ্য। তা ছাড়া রাজনীতিও একদিন দাবী করতে পারে আলাদা একটা শাসনতন্ত্র। এ দৃশ্য দেখা গেছে আমেরিকার স্বাধীনতার বেলা।

তেমনি পররাষ্ট্রনীতিও কি অন্যরকম হতে পারে না? আর যুদ্ধবিগ্রহের নীতি? পশ্চিম পাকিস্থান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তানও বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়বে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তান যতদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে পূর্ব পাকিস্তান ততদিন নয়। পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধে হেরে গেলে পূর্ব পাকিস্তানও অগত্যা হেরে যাবে। এতে কি পূর্ব পাকিস্তানের লাভ হবে, না ক্ষতি হবে? পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিবেশী ইরান, ইরানের প্রতিবেশী তুরস্ক। ওরা জোটবন্দী হয়ে পরস্পরকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করবে কী করে? এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিবেশী হচ্ছে বর্মা, বর্মার প্রতিবেশী মালয়। কই, এদিকে তো জোটবন্দী হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না? তা হলে কি বিপদ কোনো দিন পূর্বদিক থেকে আসবে না। তা ছাড়া নেশন তো দশ বিশ বছরের জন্যে হয় না। হয় বহু শতাব্দীর জন্যে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান কি তেমনি এক নেশন?

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে যদি বহু শতাব্দীর জন্যে এক নেশন হয় তবে সেটা ধর্মের কল্যাণে নয়, সেটা এই উপমহাদেশের অবিভাজ্য উত্তরাধিকারের কল্যাণে। যা কিছু ভাগ করবার যোগ্য তা ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক কিছু রয়ে গেছে যার ভাগবাঁটোয়ারা অসম্ভব। তাজমহলকে ভাগ কববে কে? তক্ষশিলা কি ভাগ করা যায়? কবি গালিবকে ভাগ করতে যাওয়া মূর্খতা। তেমনি রবীন্দ্রনাথকে।

উত্তরাধিকারেব মধ্যে ইংরেজ আমলের সংযোজনও পড়ে। আইনকানুন আপিস আদালত এপারেও যেমন ওপারেও তেমনি। পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী যেমন এপারেও লোকের মনে বসে গেছে ওপারেও তেমনি তার জন্যে লোকের মন উন্মুখ। ভারতের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েই পাকিস্তান পথ চলবে। এই বাইশ বছরে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভারতর সঙ্গে পা মিলিয়ে না চললে পাকিস্তান

পথভ্রষ্ট হবে। মিলিটারি শাসন, মার্শাল ল, বেসিক ডেমোক্রাসী ইত্যাদি তার পক্ষে বিপথ। বিপথগামী হয়ে সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে যে সে ভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে, কিন্তু তার পথ ভিন্ন পথ নয়।

আখেরে সে ভারতের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে এবিষয়ে আমার মনে সংশয় 'নেই। কিন্তু তার আগে তাকে মনঃস্থির করতে হবে সে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ভিত্তিগত প্রশ্নগুলোর কী ভাবে মীমাংসা করবে। এক একজন মানুষের এক একটি ভোট মানবে কি? যদি মানে তা হলে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে অধিকতরসংখ্যক আসন দিতে হবে। ফলে মন্ত্রীমণ্ডলীতেও অধিকতর-সংখ্যক সদস্যপদ দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান এখন পর্যন্ত সংখ্যার গুরুত্ব স্বীকার করেনি। প্যারিটি দাবী করেছে। প্যারিটি সরকারী চাকরিবাকরিতে চলতে পারে, কিন্তু পার্লামেণ্টে বা ক্যাবিনেটে চলতে পারে না। দুনিয়ার কোথাও চলে না।

অগত্যা অটোনমির দাবী তুলতে হয়েছে। আগেকার দিনেও প্রাদেশিক অটোনমি ছিল, কিন্তু এখন অটোনমি বলতে বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশী। সেটা মঞ্জুর করলে পাকিস্তান হয়ে দাঁড়ায় একটা কনফেডারেশন। তাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঘোরতর আপত্তি। কনফেডারেশন কোথাও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তার চেয়ে সোজাসুজি দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র ভালো। পশ্চিম পাকিস্তানের দিক থেকে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর পেলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা কামনা করবে। তারপরে সে তার স্বকীয় সংবিধান রচনা করবে। সেটা হবে পার্লামেণ্টারি গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু তার দেরি দেখে লোকের মন যদি ভেঙে যায় তবে তারা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর বদলে পীপলস ডেমক্রাসী চাইবে। ভারতের অনুরূপ নয়, চীনের অনুরূপ। কতক লোক ইতিমধ্যেই সেদিকে ঝুঁকছে।

(শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত রচিত 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রসঙ্গে)

ওপার বাংলা

দেশ ভাগের একবছর আগে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে ব্রিটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে দশটির মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী পাকিস্তানের প্রশ্নে মুসলিম লীগকে জিতিয়ে দেয়। সুতরাং পাকিস্তানের উপব দশটি প্রদেশের মুসলমানের অধিকারী স্বত্ব আছে। বাকী একটিও পরে রেফারেণ্ডামে পাকিস্তানের অনুকূলে ভোট দেয়। সুতরাং পাকিস্তান হচ্ছে অখণ্ড ভারতের বেবাক মুসলমানের জন্যে পরিকল্পিত। তারা সেখানে যাক আর নাই যাক।

কার্যকালে পাকিস্তানের বাইরের মুসলমান সেখানে সমগ্রভাবে গেল না। কিন্তু যারা গেল তারা অধিকারীর মতোই গেল। অনধিকারীর মতো নয়। যেমন গেলেন ঝীণা, লিয়াকৎ আলী প্রমুখ রাজনীতিক। সামরিক ও অসামরিক বিভাগের অফিসার। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের বণিক। পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের শরণার্থী। এদের কেউ গেলেন পাকিস্তানের পশ্চিমভাগে, কেউ পূর্বভাগে। সেখানে গিয়ে এঁরা পেলেন এঁদের নতুন বাসভূমি। সে বাসভূমির উপর এঁদের অবিকল সেই অধিকার যে অধিকার একজন পূর্ববঙ্গবাসী বা সিন্ধুপ্রদেশবাসী মুসলমানের। অর্থাৎ এঁরা বহিরাগত বলে এঁদের অধিকার কারো চেয়ে কম নয়। পরে একদিন এঁদেরই উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ হয় পূর্ব পাকিস্তান। আর সিন্ধু প্রভৃতি হয় পশ্চিম পাকিস্তান।

পাকিস্তান হচ্ছে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের বিকল্প বাসভূমি। বিকল্প বাসভূমিতে যারা গেছে তারা আদি বাসভূমির মায়া কাটিয়ে গেছে। ঝীণা তাঁর মালাবার হিলের প্রাসাদ, লিয়াকৎ আলী তাঁর যুক্ত-

প্রদেশের জমিদারী হারিয়েছেন। এমনি অসংখ্য ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তাছাড়া অশ্রু ও রক্ত অজস্র বয়ে গেছে। যাদের রক্ত ও যাদের অশ্রু তারা বহিরাগত বলে কি তাদের অধিকার কিছুমাত্র কম? পাকিস্তান লড়কে নিল কারা?

পাকিস্তানে গিয়ে এঁরা উপলব্ধি করেন যে সেখানে এঁদের শিকড় নেই। সেইজন্যে এঁদের প্রাথমিক কাজ হলো শিকড় সৃষ্টি করা। একটি শিকড় তো ইসলামী রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে সব মুসলমানই সমান, যে যেখান থেকেই আসুক না কেন। তা বলে কি সত্যি সত্যি মরক্কো বা মালয় থেকে আসবে নাকি? না, না, ভারত থেকেই আসবে। সেইজন্যে আরেকটি শিকড় হলো উর্দূ। সব মুসলমানকেই উর্দূভাষী হতে হবে। উর্দূ হচ্ছে তামাম পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা, যেমন ইসলাম হচ্ছে জাতীয় ধর্ম। এক বাসভূমি, এক ভাষা, এক ধর্ম। পাকিস্তান, উর্দূ, ইসলাম।

ধর্মের প্রশ্নে হিন্দুদের আপত্তি ছিল। তাদের আশ্বাস দেওয়া হলো যে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে মুসলমানরাও আপত্তি করবে এটা স্বয়ং কায়দে আজমও কল্পনা করতে পারেন নি। উনিও যে বাহাত্তর বছর বয়সে উর্দূ শিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আপত্তি করে যারা তারা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমান। কী আপদ! বাংলা এমন কী একটা ভাষা যে তা ভুলতে পারা যাবে না? যারা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারল তারা বাংলা ভাষা ছেড়ে উর্দূ গ্রহণ করতে পারে না? পিতৃধর্মের চেয়ে মাতৃভাষাই প্রিয়তর হলো?

সত্যি এটা একটা বিস্ময়। বাঙালী মুসলমান কোনোকালেই মাতৃভাষা ত্যাগ করেনি। মাতৃভূমি ত্যাগ করে দূর দেশে যারা গেছে তারাও বাংলাভাষা বয়ে নিয়ে গেছে। বাংলাভাষা শোনবার জন্যে তারা হিন্দুর সভাসমিতিতে পূজাপার্বণে হাজির হয়েছে। লণ্ডনের বাঙালী হিন্দুদের অবাক করে দিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসে ওরা

পয়গম্বরের পরম অনুগত। কিন্তু ভাষার বেলা ওরা ওদের দেশের চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ। ধর্মের নামে ওরা রাষ্ট্র স্থাপন করতে রাজী। কিন্তু ভাষার নামে আত্মহত্যা করতে নারাজ। তার চেয়ে ওরা বরং গুলী খেয়ে মরবে। গুলী খেয়ে টলিয়ে দেবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর আসন। সেই নতুন কারবালা থেকে নতুন এক শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব। সেকালের শিয়া সুন্নী বিরোধের মতো একালেব বাঙালী অবাঙালী মুসলমানের বিরোধ। একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমানদের কাছে তেমনি স্মরণীয় একটি তারিখ যেমন স্মরণীয় চৌদ্দই আগস্ট।

একুশে ফেব্রুয়ারী এসেছিল এই কথাটি বলতে যে পূর্ব পাকিস্তান প্রধানত ও প্রথমত বাঙালীদের বাসভূমি। সেখানে যারা আসবে তারা বাস করতে চায় করতে পারে, কিন্তু বাঙালীর মুখের বুলি কেড়ে নিয়ে তাকে তোতাপাখীর মতো উর্দু কপচাতে বাধ্য করবে না। তাকে তার চিরন্তন সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেবে না। তারই ভোট সংখ্যা বেশী। ভোটের জোর তারই। গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে চললে সরকার গঠন করার অধিকার তারই সব চেয়ে জোরালো। এটা শুধু যে পূর্ব পাকিস্তানে তাই নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারেও। এর জন্যে সে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে হাত মেলাবে। যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকার করবে। কিন্তু যারা তার ছেলেদের গুলী করে মেরেছে তাদের কথা শুনবে না।

গণতন্ত্র বলতে পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীই বোঝায়। বেসিক ডেমক্রাসী নয়। পূর্ব পাকিস্তানীদের এতদিন ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল। এখন তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। তারা চায় পার্লামেন্টারি সংবিধান ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানীরাও তাই চায়। অথচ দুই প্রান্তের রাজনীতিকরা একমত হতে পারছেন না। পশ্চিমারা বলেন দুই প্রান্তের মধ্যে প্যারিটি মেনে নিতে হবে। পূরবীয়ারা বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা শতকরা চুয়ান্ন, সুতরাং

প্যারিটি মেনে নিলে অবিচার হয়। ওয়ান ম্যান, ওয়ান ভোট ; সর্বত্র এই হচ্ছে নিয়ম। পাকিস্তানের বেলা এর ব্যতিক্রম হবে কেন ?

যতই দিন যাচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমারা পূরবীয়াদের সংখ্যাবলকে ভয় করে। যেমন পূরবীয়ারা ভয় করে পশ্চিমাদের সামরিক বলকে। প্যারিটি ইস্যুতে পূরবীয়ারা যদি আপস না করে তবে সর্বস্বীকৃত সংবিধান রচনা করা যাবে না। মিলিটারি শাসন বছরের পর বছর চলবে। মিলিটারিকে দোষ দিতেও পারা যাবে না। তাঁরা না চালালে কারা চালাবেন ? মিলিটারিতে পশ্চিমাদের একাধিপত্য। সুতরাং পশ্চিমারাই ছলে বলে কৌশলে দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা হবে চিরকাল।

এর থেকে পরিত্রাণের জন্যে পূব পাকিস্তানের জন্যে অটোনমি দাবী করা হচ্ছে। সে সবতোভাবে স্বাধীন না হলেও অধিকাংশ বিষয়ে স্বাধীন হবে। সামরিক শক্তি কেন্দ্রের হাতেই থাকবে। পররাষ্ট্র-নীতিও কেন্দ্রের হাতে। আর সব প্রদেশের হাতে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কি পূর্ব পাকিস্তানীরা আশা করবে না যে কেন্দ্রের সেই দুটি বিষয়ে তাদের সংখ্যাধিক্য স্বীকার করে নেওয়া হবে ? আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা কি তাতে বাদ সাধবে না ? সেক্ষেত্রেও কি প্যারিটির প্রশ্ন উঠবে না ? সুতরাং সর্বস্বীকৃত সংবিধানের সম্ভাবনা কোথায় ?

পাকিস্তান আজপর্যন্ত সবস্বীকৃত সংবিধান রচনা করতে পারেনি : একবার ১৯৫৬ সালে যেটা পেরেছিল সেটাতে প্যারিটি মেনে নেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি উঠিয়ে দেওয়া হবে। পশ্চিমের মুসলিম লীগ নেতারা সশস্ত্র বিদ্রোহের হুমকি দেন। তার জন্যে প্রস্তুতিও আরম্ভ হয়। ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খান্ যদি সামরিক আইন জারি না করতেন তা হলে বিদ্রোহ দমন করার জন্যে সৈন্য ব্যবহার করতে হতো। মুসলমানের রক্তে পাকিস্তানের মাটি লাল হয়ে যেত। সে সংবিধান এতদিনে ফৌত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আয়ুব যেটা চাপিয়ে দেন সেটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রচনা নয় :

এবারেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ডিঙিয়ে ইয়াহিয়া খান্ একটা সংবিধান চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সে ভাবে পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসী হবে না।

বাংলাদেশের মুসলিম সুলতান ও নবাবরা সাড়ে পাঁচশোবছর হাতে পেয়েও বাংলার মুসলমানদের জন্যে উর্দূ প্রবর্তন করেননি। অথবা সৃষ্টি করেননি নতুন একটি ভাষা যার লিপি আরবী, বিশেষ্য বিশেষণ আরবী ফারসী তুর্কি, ক্রিয়াপদ বাংলা।

সুলতানী ও নবাবী আমলে যা হলো না, ইংরেজ আমলের দু'শো বছরেও যার জন্যে মানুষের মন তৈরি হলো না, হঠাৎ পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর তারই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তোমার ধর্ম যখন ইসলাম তখন তোমার ভাষাও হবে আরবী ফারসীর মতো উর্দূ, নয়তো উর্দূর ছাঁচে ঢালাই বাংলা, যার কোনো ইতিহাস বা ভূগোল নেই। ইসলাম যেমন ইতিহাস ভূগোলের উর্ধ্বে মুসলমানও তেমনি ইতিহাস ভূগোল নিরপেক্ষ। তার সংস্কৃতি? সেটা তো মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত একছাঁচে ঢালা। স্বকীয়তার দাবী ওঠে কেন? পূর্ব পাকিস্তান যখন মুসলমানদের দেশ তখন তার সংস্কৃতিও সার্বভৌম ইসলামী সংস্কৃতি।

কৌতুকের কথা হচ্ছে এসব যুক্তি মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগের গোড়ায় দিকে শোনা যায়নি। শোনা যাচ্ছে স্বাধীনতার উত্তর যুগে। যে যুগে তুরস্ক ইরান প্রভৃতি বিশুদ্ধ মুসলিম দেশগুলিও সার্বভৌম ইসলামী সংস্কৃতির আওতার বাইরে গিয়ে যে-যার জাতীয় সংস্কৃতির প্রাক-ইসলামী উৎসের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে যত্নবান। চার হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা ইরানের। কেন যে সে ইসলামের খাতিরে কেবল সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে তার সংস্কৃতির রেখা টানবে, তার পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছরকে বাতিল করবে এর কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। তেমনি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা মিশরের। সেই বা সংস্কৃতির সাড়ে তিন হাজার বছরকে বিসর্জন

দিয়ে তেরশো বছরকেই সম্বল করবে কেন? সীরিয়া সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।

পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে এখন দু'মত। ইসলামের পূর্বে থেকে যা আছে তাকে যাঁরা আমল দিতে চান না তাঁরা একদিকে। তেমনি অন্য দিকে যাঁরা সমগ্র ইতিহাসকে তথা ভূগোলকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন করতে চান। ইউরোপেও এর নজীর মেলে। পাঁচশো বছর আগে প্রাক্-খ্রীস্টান সম্বন্ধেও অনুরূপ দ্বিমত দেখা দেয়। একদল খ্রীস্টের পূর্ববর্তী গ্রীক ও রোমক উত্তরাধিকারকে আপনার বলে স্বীকার করবেন না। আরেকদল তাকেও আপনার বলে মহামূল্য মনে করবেন। খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যকে পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার পুনর্মূল্যায়ন করবেন। এই দ্বিতীয় দলটিই জিতেছেন। কিন্তু একদিনে জেতেননি। পাকিস্তানের যাঁরা প্রবর্তক তাঁরা প্রাগ্ ঐসলামিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিধর্মীর সংস্কৃতি বলে বিজাতীয় জ্ঞান করেছিলেন। তাঁদের কাছে আরবজাতির প্রাগ্ ঐসলামিক হলেও তাই বরঞ্চ স্বজাতীয়। সেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় সংস্কৃতিকেও হিন্দু সংস্কৃতি বলে অনাত্মীয় মনে করেছিল। গালিব, হালী, ইকবালের মতো কবিরাই ছিলেন আপনার। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পর।

ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির মোহ যদিও কারো কারো মন জুড়ে রয়েছে তবু তার সেই একচ্ছত্র দাপট আর নেই। দেশভিত্তিক ভাষাভিত্তিক লোকভিত্তিক সংস্কৃতির দিকেও সাধারণের দৃষ্টি পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পালার নাম 'রূপটান'। রেকর্ডে ও ফিল্মে ওর সমকক্ষ নেই। অথচ ওর কথাবস্তু আরব পারস্য থেকে আসেনি, আসেনি উর্দূ থেকে। ওটা মুঘল দরবারেরও কিস্‌সা নয়। আমাদেরই চিরপরিচিত 'মালঞ্চমালা'। শুনলুম 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সব ক'টা কাহিনীই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। রেডিও

পাকিস্তানেও আমরা এন্তার লোকগীতি শুনতে পাই। সবই পূর্ব বাংলার মাটির ফসল।

পূর্ব পাকিস্তানে এই যে ব্যাপারটা চলেছে এটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। এর থেকেই আসবে একপ্রকার রেফরমেশন। ইসলামের তথা ইসলামী শাস্ত্রাদির পুনর্মূল্যায়ন। ওই স্টেজটা এখনো আসেনি, তবে ওর ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছে কোরান শরিফের তর্জমা দিয়ে। যেমন জার্মানীতে হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ দিয়ে। পবিত্র ভাষা আববী সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয়েছে। বাংলার উপর টান এখন তার চেয়েও বেশী। লোকে বাংলার জন্যে জান দিতে পেরেছে ও পারে। আরবীর জন্যে একটি মানুষও মৃত্যু বরণ করবে না।

ওদিকে বিজ্ঞানের প্রেস্টিজ বেড়ে যাওয়ায় ইংরেজীর প্রেস্টিজও কমতে চায় না। বাংলা ও ইংরেজী এই দুই ভাষার চাপে আরবী ফারসী আর উর্দু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যে ওখানকার শিক্ষিতদের এখন এখানকার শিক্ষিতদের মতোই চেহারা। মনের ভিতরটা একই রকম। সেখানে যে বাস করছে সে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালী। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী।

কিন্তু পাকিস্তান কি একটি মুসলিম দেশ ? পূর্ব পাকিস্তান বলে যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তার পূর্ব পরিচয় পূর্ব বাংলা। অখণ্ড বাংলাদেশের সেটি একটি অংশ। একটি একক নয়। অখণ্ড বাংলাদেশের লোকগণনায় মুসলমানের সংখ্যা একশো বছর আগেও হিন্দুর চেয়ে কম ছিল। আরো আগে আরো কম ছিল। নবাবী আমলে অখণ্ড বাংলা ছিল হিন্দুপ্রধান। সুলতানী আমলে হিন্দু দিয়ে ভরা। লোকগণনায় এক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেলেই সেটা তাদের একার দেশ হয়ে যায় না।

এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলি যাঁদের রচনা তাঁরা কারো চেয়ে কম মুসলমান নন, কম পাকিস্তানী নন। অথচ শাশ্বত বঙ্গের মিশ্র সংস্কৃতির ধারাবাহী। যেমন এপারের কাজী আবদুল ওদুদ বা কাজী

নজরুল ইসলাম তেমনি ওপারের মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বা কাজী মোতাহার হোসেন। ন্যাশনালিটির নিরিখে ওদুদ একজন ভারতীয়, মোতাহার হোসেন একজন পাকিস্তানী। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে উভয়েরই স্থান পাশাপাশি। দু'জনেই 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতা। সেইসূত্রে এই সঙ্কলনের প্রবন্ধকারদের পূর্বসুরী। শহীদুল্লাহ্ বাদে।

বুদ্ধির মুক্তি এতদিনে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এটা সুলক্ষণ। কিন্তু পশ্চাৎমুখী চিন্তার এখনো অবসান হয়নি। সে চিন্তা এখনো মধ্যযুগের ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মূল অন্বেষণ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহল এখনো দ্বিধাবিভক্ত। আমরা এ গ্রন্থে একভাগের বক্তব্যই শুনতে পাচ্ছি। অবিমিশ্র ইসলামী গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত বলে কিছু কম সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট এখনো কাটেনি। দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে না বলে কেউ যেন সিদ্ধান্ত না করেন যে রাষ্ট্র কিংবা জনগণ সেকুলার হয়ে গেছে। বদরুদ্দীন উমরের বই ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে ও তার সংস্কৃতিকে যাঁরা চেনেন ও ভালোবাসেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ও মানেন যে পদ্মার তীরের জেলাগুলিই বাংলার হার্টল্যাণ্ড বা হৃদ্‌ভূমি। একটি দুটি বাদে সব ক'টিই পড়ে গেছে সীমান্তের ওপারে। হৃদ্‌ভূমির হৃৎস্পন্দন আজকাল শুনতে পাওয়া যায় না। পথঘাট বন্ধ, যোগাযোগ ছিন্ন সেইজন্যে ওপার বাংলার চিন্তাশীল লেখকদের রচনা এপার বাংলায় পুনঃপ্রকাশ করা একটি অত্যাবশ্যক সৎকাজ। এর জন্যে মৈত্রেয়ী দেবীকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে হয়।

নজরুল

ছেলেবেলায় যখন 'প্রবাসী'র গ্রাহক হই প্রথম সংখ্যাতেই দেখি একটি দু'লাইনের কবিতা। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো কবির নাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। বাড়িতে হাসাহাসি পড়ে যায়।

হাবিলদার সাহেবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কারো তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না। কিন্তু আরো কয়েক বছর যেতে না যেতে দেখি 'বিদ্রোহী' বলে বিরাট এক কবিতা। আসল কবিতাটি আরো বিরাট, 'প্রবাসী' ওকে সংক্ষেপিত আকারে পুনর্মুদ্রণ করে। তখন থেকে নজরুল হন আমাদের হীরো। মুখে মুখে ঘোরে "বল বীর চির উন্নত মম শির।"

আরো অনেক কবিতা এখানে ওখানে পড়ি। তারপর কিনি 'অগ্নিবীণা'। নজরুল ইসলাম রাতারাতি দেশবিখ্যাত হয়ে যান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে বই উৎসর্গ করেন। আমরা দূর থেকে তাঁকে বন্দনা করি।

একবার কলেজের ছুটিতে কলকাতায় এসে শুনি নজরুল ইসলাম আলবার্ট হলে গান গেয়ে শোনাবেন। ওটা ছিল তখনকার দিনে অখ্যাত কৃষক শ্রমিক দরদীদের সভা। কবি তাঁর স্বরচিত দুটি গান গেয়ে শোনালেন। হারমোনিয়মও বাজালেন তিনি। "হে ভাই চাষী, ধর কষে লাঙল।" আর "হে ভাই মজুর, ধর কষে শাবল।" মুগ্ধ হবার মতো কিছু নয়। নজরুলকে দেখতে পেলুম এই যা আনন্দ।

অনেকদিন পরে একবার ওঁর পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গ আলাপের সৌভাগ্য হয়। ততদিনে আমিও একজন সাহিত্যিক বলে পরিচিত

হয়েছি। অচিন্ত্য আমার বন্ধু, আমাকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বিয়েতে। আমি বরানুগমন করিনি, কিন্তু বরের বাড়িতে হাজিরা দিয়েছি। নজরুলও তাই। সেদিন তাঁর গৈরিক বেশবাস। অথচ রস উপচে পড়ছে। যা রসিকতা করলেন তা সব মনে আছে, কিন্তু লিখলে অচিন্ত্যই বলবেন অশ্লীল। গোপালদাস মজুমদার বললেন, কাজীর লেখা মুসলমানরাই বেশী কেনে। কবি বললেন, না হিন্দুরাই। এই এক নতুন কবীর যাঁকে নিয়ে হিন্দু মুসলমানে কাড়াকাড়ি। হিন্দুদের মধ্যে পরবর্তীকালে যে কাজীভক্তি দেখেছি তা মুসলমানদের উপর টেক্কা দেয়। নজরুলই একমাত্র জীবিত বাঙালী।

জীবনদার্শনিক ওদুদ

গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই জীবনশিল্পীর পরম অনুরক্ত জীবন-ভাষ্যকার কাজী আবদুল ওদুদ নিজেও ছিলেন একজন জীবনশিল্পী। কিন্তু আমার এই বিশ্বাস আমি সর্বসমক্ষে প্রমাণ করতে পারব না। সেইজন্য তাঁর পরিচায়ক বিশেষণটিকে বদলে দিচ্ছি। এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই যে তিনি ছিলেন একজন জীবনদার্শনিক। তাঁর নিজস্ব একটা জীবনদর্শন ছিল। সেই জীবনদর্শনে তিনি বলিষ্ঠভাবে সুপ্রতিষ্ঠ ও গভীরভাবে তন্ময় ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনের কোনো দুর্বল মুহূর্তেই যিনি তার থেকে বিচ্যুত হননি।

বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী বলতে যা বোঝায় আমার জীবনে এমন ব্যক্তি ক'জনই বা এসেছেন? তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম, বাঙালীদের মধ্যে একতম। সেইজন্যে তাঁর প্রয়াণের বার্তা আমাকে অমন মুহ্যমান করে রাখে। আকস্মিক হলেও সে ঘটনা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বছরখানেক আগেও একবার তাঁর অন্তিম অবস্থা উপনীত বলে ভ্রম হয়েছিল। আমাকে দেখতে চান। দেরিতে খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই। ততক্ষণে তিনি সঙ্কটমুক্ত হয়েছেন। সেইদিনই ভোরবেলা তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়।

এবার বার্তা পাই বার্তাবহের মুখে নয়, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে। স্তম্ভিত হয়ে কিছুকাল কাটে। অপ্রত্যাশিত নয়, অথচ বিশ্বাস করতে মন যায় না। তিন চার সপ্তাহ আগেই যে একদিন মনোজ বসুতে আর আমাতে মিলে তাঁকে একটি সুসমাচার জানিয়ে এসেছিলুম। সেইদিনই তিনি শিশিরকুমার পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছেন। সেদিন তাঁকে দেখে মনে হলো বছর-খানেক আগের তুলনায় ভালো। তিনি নিজেই বললেন একটু

একটু উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পারছেন। আগের বার বলেছিলেন যে তাঁর জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো কৃত্য সারা হয়ে গেছে। আর বেঁচে থেকে কী হবে! আমরা বলি, ভালো আছেন যখন তখন এবার জীবনস্মৃতি লিখুন। তিনি রাজী হয়ে যান। একটা পরিচ্ছেদ নাকি ইতিমধ্যে শ্রুতিলিখিত হয়েওছিল।

পুরস্কারের দিন তাঁর সশরীরে উপস্থিতি অবশ্য অসম্ভব ছিল। তাঁর হয়ে তাঁর প্রতিনিধি ওটি গ্রহণ করেন। পুরস্কার দেখে তিনি সুখীও হন। ও টাকা দিয়ে একটা লাইব্রেরী আরম্ভ করার কথাও নাকি বলেন। কিন্তু ন'দিন যেতে না যেতেই তাঁর প্রয়াণ। ভাগ্যিস দেশের লোক শেষমুহূর্তে তাঁব গুণের আদর করেছিল। যথেষ্ট নয়, তবু শূন্যের চেয়ে তো বেশী। বাংলার একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিককে 'রবীন্দ্রপুরস্কার' দেওয়া হয়নি, এটা তাঁর নয়, দেশের লোকেরই দুর্ভাগ্য। কিন্তু কথাটা উঠেছিল।

কাজী সাহবের মৃত্যুভয় ছিল না। বরঞ্চ আগ্রহের সঙ্গে তিনি পরলোকের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর জীবনসঙ্গিনী সেখানে তাঁর পুরোবর্তিনী। তা ছাড়া মানুষ বাঁচে তার জীবনের কাজের জন্যে। তার ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্যে। কাজী সাহেবের বেলা সত্যিকার কাজ সত্যি সত্যি বাকী ছিল না। তাঁর যৌবনের সংকল্প তিনি গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও হজরৎ মহম্মদের জীবন কথা লিখবেন। তাঁর সে সংকল্প পূরণ করতে দীর্ঘজীবনের প্রয়োজন ছিল। বিধাতা তাঁকে কেবল দীর্ঘ পরমায়ু নয়, অটুট স্বাস্থ্যও দিয়েছিলেন। শেষের দিকে দেখা গেল শরীর ভেঙে পড়েছে। তার আগেই তিনি তাঁর হজরৎ মহম্মদ জীবন কথা শেষ করতে পেরেছিলেন। উপরন্তু দিয়ে যান পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ। সংকল্পের অতিরিক্ত। জীবনে এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয় যে যাই সংকল্প করবে তাই পূরণ করতে পারবে? জীবন কি আলাদীনের প্রদীপ? কাজী সাহেবের বেলা কিন্তু সেই রকমই হয়েছিল। গ্যেটের উপর দশখানা বই পড়ে একখানা

লেখা আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু 'কবিগুরু গ্যেটে' যাঁরা পড়ছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একটি নূতন রস আস্বাদন করেছেন। সেটা একজন প্রাচ্য সুধীর স্বকীয় উপলব্ধির জীবনরস। ও বই পণ্ডিতের সন্দর্ভ নয়। কাজী চলে গেছেন মরমে। তিনিও একজন মরমী সাধক। যাঁরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গ্যেটের জীবনী পাঠ করতে চান তাঁরা জার্মান ভাষায় গ্যেটেচরিত পড়বেন, নয়তো ইংরেজী ভাষায় বা ভাষান্তরে। যাঁদের অত ক্ষমতা নেই তাঁরা যদি কাজী সাহেবের বই পড়েন তো গ্যেটের অন্তঃসারে বঞ্চিত হবেন না। অন্তত পাবেন গোটের কয়েকটি কবিতার আশ্চর্য রসাল ভাবানুবাদ। চমৎকার বাংলায় রূপান্তর।

গ্যেটে কাজী সাহেবের যৌবনকে নিবিষ্ট রেখেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনকে। তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে 'প্রবাসী'তে তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠ' প্রকাশিত হলে চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে যায়। আমার তখন বিশ বছর বয়স। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই তাঁর সৌন্দর্য সচেতন রসমগ্ন সুফীভাবের গভীরতায়। অজিতকুমার চক্রবর্তীর পরে আর কেউ তাঁর মতো অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য-লোকে বিহার করে থাকলে বাংলা ভাষায় তার নিদর্শন রাখেন নি। আমি সেইসময় থেকেই কাজী সাহেবকে সাহিত্যবিচারক হিসাবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করি। তখন আমার ধারণা ছিল তিনি নিশ্চয়ই প্রৌঢ় ও পরিণত ও আমার দ্বিগুণ বয়সী স্থূলেখক। আর আমি তো সাহিত্যক্ষেত্রে অচেনা-অজানা এক আগন্তুক।

এর আট ন'বছর পরে আমি যখন ঢাকায় বদলী হই তখন আমারও পরিচয় দেবার মতো কিছু হয়েছে। কাজী তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক। সদালাপী আনন্দময় প্রিয়দর্শন যুবা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো এক কাজী। কাজী মোতাহের হোসেন। সাহিত্যিক হিসাবে তখনো ইনি আত্মপ্রকাশ করেননি। করে থাকলে আমার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু আমার একখানি বই

পড়ে ইনি এমন একটি সমালোচনাপূর্ণ পত্র লেখেন যা দুর্লভ সাহিত্যিক সূক্ষ্মবিচারের ফল। পরে ইনিও লেখক হিসাবে যশস্বী হয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নয়, পূর্ব পাকিস্তানে।

ঢাকায় থাকতে দুই কাজীর সম্বন্ধেই শুনতে পাই এঁরা আর এঁদের বন্ধুরা মিলে সমাজে ও সাহিত্যে একটি অপূর্ব আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তার নাম 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে এর মতো আন্দোলন এর আগে কখনো হয়নি, ইসলামের ইতিহাসেও বোধহয় অভূতপূর্ব। এঁরা শাস্ত্রের অভ্রান্ত বচনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করতেন। উক্তির চেয়ে যুক্তিই এঁদের কাছে অধিকতর মূল্যবান। যে কোনো সমাজে এটা একটা দুঃসাহসিক অভিযান। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজে ও উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজে এর জন্যে বহু অগ্রণীকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম সমাজে কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহের হোসেন অল্পবিস্তর বাধা পেয়েছেন রক্ষণশীলদেব তৎকালীন দুর্গ ঢাকা নগরীতে। যেখানকার নবাব পরিবারের আশ্রয়ে একদা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিপক্ষের দুর্গের ভিতরে বসে অসিচালনা করা বিপজ্জনক কাজ। কাজী আবদুল ওদুদকে শাসানো হয়েছিল, কিন্তু মার দেওয়া হয়েছিল কি না ঠিক বলতে পারব না। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজের পায়েই দাঁড়িয়েছিলেন। হিন্দু বা ইউরোপীয় সহযোগিতা চাননি। জনমতকে প্রভাবিত করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে পক্ষপাতীর অভাব ছিল না। তাঁদেরি একজন তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্য হন ও পরবর্তীকালে তাঁর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গত শতাব্দীর 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মতো উপযুক্ত সময়ের অনেক পূর্বে এসেছিল। মুসলিম সমাজে সেইজন্যে তখন তেমন ছাপ রেখে যেতে পারেনি। কিন্তু লক্ষণ দেখে

মনে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছে। কাজী সাহেব অন্তত এক পুরুষ পুরোগামী।

সেই যে 'বুদ্ধির মুক্তি' তারই ফলশ্রুতি তাঁর 'হযরৎ মোহাম্মদ' তথা 'পবিত্র কোরআন'। একটি না ঘটলে আর একটি ঘটত না। মুক্ত-বুদ্ধি মুসলমানকে নতুন আলোয় ইসলামের দিকে তাকাতে হবে, তার মূল্যায়ন করতে হবে। উটপাখীর মতো আরবদেশের মাটিতে মুখ গুঁজে থাকলে চলবে না। আধুনিক যুগে বাঁচতে হলে আধুনিক মানুষের মতোই বাঁচতে হবে। যেখানে যুক্তিতর্কের স্বাধীনতা নেই সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিলবেই বা কী করে! যদি মেলে তবে জোরদার হবে কী করে! পাকিস্তান যে গণতন্ত্র হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে এটা তার যুক্তিতর্কের মূল্য না মানার পরিণাম।

ঢাকায় আমি বেশীদিন ছিলুম না, তাই ওদুদ সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। পরে চিঠিপত্রে আলাপটা জমে ওঠে। অনেক সময় আমরা একমত হতে পারিনি। ক্রমাগত তর্কবিতর্ক করেছি। যতদূর মনে পড়ে যুদ্ধের কয়েক বছর আমাদের কাজ ছিল চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া। সেইভাবে আমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হই। কাজী একজন যোদ্ধা। তিনি বিনা যুদ্ধে মত পরিবর্তন করবেন না। তবে তাঁর মনে বিদ্বেষ বা অহঙ্কার একফোঁটা ছিল না। অন্তরে ছিল অকৃপণ প্রেম ও সহানুভূতি। ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল যে আমরা একই পালকের পাখী। আমাদের মতভেদের চেয়ে মতের মিল বেশী। মনের মিল তো তার চেয়েও বেশী। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের উভয়েরই প্রিয়। তাই সব বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যায় মানবিকবাদের মধ্যস্থতায়।

কাজী সাহেব যদি কনফরমিস্ট মুসলমান হতেন তা হলে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে পদোন্নতি ইত্যাদি গুছিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু চিরকাল লেকচারার থাকার পর তিনি কলকাতা আসেন পাঠ্যপুস্তক কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে। বছরটা

আমার ঠিক মনে নেই। কলকাতায় একদিন তাঁর বাসায় গেছি শুনি তর্ক উঠেছে পাকিস্তান প্রসঙ্গে। তখনো সাধারণ নির্বাচন হয়নি। ক্যাবিনেট মিশন আসেনি। আবুল মনস্থর আহমদ উত্তেজিত হয়ে বলেন, "পাকিস্তান না গোরস্থান! জিন্না না জ্বিন্!" কাজী সাহেব পাকিস্তানবিরোধী। তিনি তো আস্ত একটা প্রবন্ধই লিখে বসেন যে, পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার গাঁটছড়া বেঁধে পাকিস্তান প্রবর্তন করলে বাংলার মুসলমানদেরই সর্বনাশ করা হবে। কে শোনে কার কথা। শেষে যখন সত্যি সত্যি পাকিস্তান হলো তখন কাজী সাহেবও পাকিস্তানে চলে যেতে পারতেন, সেইখানেই তো তাঁর পৈত্রিক ভদ্রাসন, ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামের বিখ্যাত কাজী-বংশের লাখেরাজ জমি। অতি সহজেই পদোন্নতি হতো। হিন্দুদের সঙ্গে আর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকত না। ঢাকা শহরে বিরাট অট্টালিকার মালিক হয়ে বসতেন।

কিন্তু সেই যে তিনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন সেটা ছিল তাঁর কাছে সত্যিকার সীরিয়াস ব্যাপার। নবপ্রবর্তিত দুই নেশন থিওরি তাঁর বিবেকবিরুদ্ধ। তা ছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যেও তাঁকে সেকুলার স্টেটে থাকতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র তাঁকে স্বাধীনভাবে লিখতেই দিত না। এমন কি মহম্মদ সম্বন্ধেও না। কোরানের অনুবাদও কি তিনি স্বাধীনভাবে করতে পারতেন? না, তাঁর জীবনের কাজ অসমাপ্ত রয়ে যেত পাকিস্তানে গেলে।

সেখানকার মানসিক আবহাওয়ায় 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ'ও কি লিখতে পারা যেত? তাঁর দ্বিতীয় মহৎ কীর্তিও পাকিস্তানে প্রতিকূলতা পেতো। আর তাঁর প্রথম মহৎ কীর্তি 'কবিগুরু গ্যেটে' যদি অবিভক্ত বঙ্গে লেখা না হতো তা হলে পাকিস্তানে বসে সেখানিও লেখা দুষ্কর হতো। আর কারও পক্ষে না হোক তাঁর মতো মানুষের পক্ষে পাকিস্তান হতো গোরস্থান। সেইজন্যে পাকিস্তানের বিবিধ প্রলোভন তিনি সবলে উপেক্ষা করেছেন। ফলে তিনি তাঁর লেখার

সংকল্প পূর্ণ করতে পেরেছেন। লেখার পূর্তিতেই লেখকের মুক্তি। কাজী সাহেব মৃত্যুর পূর্বে মুক্তি পেয়েছেন।

এ যেমন হলো একদিকের কথা তেমনি আরেক দিকের কথা হলো, লেখক যদি পাঠকের মনের উপর প্রভাব ফেলতে চায় তবে তাকে স্বস্থানেই দাঁড়াতে হবে, স্বস্থানে দাঁড়িয়েই আঘাত বরণ করতে হবে। স্বস্থানে নিধনং শ্রেয়ঃ। জার্মান শান্তিবাদী অসিয়েটস্কি যখন হিটলারশাসিত জার্মানীতে থেকে যাওয়াই স্থির করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তিনি বাইরে চলে যাওয়ার নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে মরণের ঝুঁকি আমন্ত্রণ করলেন। অসিয়েটস্কি উত্তর দেন, "বাইরে থেকে আমার কণ্ঠস্বর ফাঁপা শোনাত।"

ওদুদ সাহেবের কণ্ঠস্বরও লীগশাসিত পূর্ব পাকিস্তানে ফাঁপা শোনায়। ওখানকার লেখক ও পাঠক সমাজ থেকে তাঁর নাম কাটা যায়। তিনি এর জবাব দেন 'শাশ্বত বঙ্গ' লিখে। যার কাছেই তাঁর প্রথম আনুগত্য। যে তাঁর প্রকৃত স্বস্থান। পাকিস্তান তাঁর পক্ষে পরস্থান। তবে পূর্ব বাংলার মাটির উপর মানুষের উপর টান শেষদিনটি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ভাষার উপর টান সাহিত্যের উপর টান তো স্বতঃসিদ্ধ। কাজী সাহেবের কণ্ঠস্বর যে পূর্ব পাকিস্তানের কানে পৌঁছল না এটা অতি মর্মান্তিক সত্য। তার চেয়েও মর্মান্তিক তাঁর অন্তিম মুহূর্তে তাঁর কন্যা এসে পৌঁছতে পারলেন না। ঢাকা থেকে কলকাতা আসার পথে সহস্র বাধা। আর পঁচিশ মিনিট আগে পৌঁছলে তাকে জীবিত দেখতে পেতেন। কারা সব কালীপূজার চাঁদা চেয়ে তাঁর গতি রোধ করে। এমনি আমাদের সেকুলার স্টেটের চেহারা যে অকালে কালীপূজা হয় ও তার চাঁদার কড়ি যোগাতে হয় অন্য ধর্মের লোককে।

মুসলমানের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ খুব নিরাপদ স্থান নয়। বার বার দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখে কাজী সাহেবও মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আপনার জন্যে নয়, আপনার সম্প্রদায়ের দুর্বলতর মানুষদের জন্যে।

যতদূর জানি ১৯৬৪ সালের বিভীষিকা তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। এর পরেই শুরু হয় তাঁর ডান হাতের কাঁপুনি। আরো পরে দুই হাতের কাঁপুনি। 'যার নাম পারকিনসনের রোগ। ক্রমে ক্রমে অথর্ব হয়ে পড়েন।

অথচ এই অসুখের কিছুকাল পূর্বে এই কাজী সাহেবই আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমি সব সময় ভালো থাকি। আমার স্বাস্থ্য সব সময়ই ভালো।" বাস্তবিক তাঁর মতো স্বাস্থ্যবান পুরুষ বিরল। আমার মনে হয় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার গভীরতর কারণ পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া। আর দুই বাংলার মাঝখানকার যোগাযোগ ভেঙে পড়া। এটা তো তিনি কল্পনা করতে পারেনি যে ঢাকা হবে লণ্ডনের চেয়েও দূরে। বঙ্গ হবে কঙ্গোর চেয়েও দুর্গম।

অবশেষে সেই সর্বনাশা দিনটি এল যেদিন পাকিস্তানে ভারতে সত্যিকার যুদ্ধ বেধে গেল। সেদিন এপারের বহু নিরীহ মুসলমানকে শুধুমাত্র তাঁদের ধর্মের জন্যে আটকবন্দী করা হয়। সরকার যাঁদের আটক করেন না লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করে। আমার বন্ধুস্থানীয় বিখ্যাত লেখককেও গুপ্তচর বলে অপবাদ দেওয়া হয়। দেশকে ভালোবাসার দরুন এই শাস্তি। সেদিন কাজী সাহেবের জন্যেও আমার ভাবনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মান্ধরা তাঁকে বিশ্বাস করে না। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মান্ধরাও যদি তাকে অবিশ্বাস করে তবে তিনি দাঁড়াবেন কোথায়?

ধর্মান্ধতা যেমন মানুষকে মারে ধর্ম তেমনি মানুষকে বাঁচায়। যদি তা যথার্থই ধর্ম হয়ে থাকে। কাজী সাহেব ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম ইসলাম, কিন্তু অন্যান্য ধর্মেও তাঁর আগ্রহ ছিল। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তাঁকে পীড়িত করলেও তিনি উভয় ধর্মের মূল্য বুঝতেন। যারা ঝগড়া করতে পারে তারা মিটমাট করতেও পারে। মিটমাট যাতে হয় সেইটেই লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক

অনর্থ দূর করবার জন্যে কেউ কারো ধর্মকে অস্বীকার করবে এটা কাম্য নয়। এ ধরনের সমাধান তিনি পেশ করেননি। ধর্ম নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন নয়। বরঞ্চ ধর্মকে তার সত্যরূপে অবলম্বন করেই জীবন।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পড়ে তাঁর ওখানে যাই। দেখি শোকপ্রকাশ করতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অর্ধেক মুসলমান, অর্ধেক হিন্দু। সমান শোককাতর। কাজী ছিলেন আমাদের আপনার লোক। ভাবতেই পারা যায় না যে তিনি আমাদের পর। নানা কারণে শবযাত্রা চব্বিশ ঘণ্টার উপর বিলম্বিত হয়। নইলে শেষযাত্রাতেও যোগ দিতুম।

দুই সমাজকেই পাশাপাশি বাস করতে হবে, পরস্পরকে আপনার ভাবতে ও আপনার করতে হবে। সুখে সুখী ও দুখে দুখী হতে হবে। এই হচ্ছে আদর্শ। এ আদর্শ অতীতে মানা হয়েছে, ভবিষ্যতেও মানা হবে। কাজী সাহেবের জীবনই তাঁর বাণী।

শাশ্বত বঙ্গ হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন মেলা। ওদুদ সাহেবের জীবন তার প্রতীক। তাঁর এ স্বপ্নও অপূর্ণ থাকবে না। কিন্তু কে জানে কতকাল পরে।

তাঁর ত্রিবিধ সঙ্কল্পের কথা বলেছি। গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও মহম্মদ সম্বন্ধে তাঁর জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসার উত্তরদান। এ ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকটি জিজ্ঞাসা ছিল। যাকে বাংলাদেশের রেনেসাঁস বলা হয় তার স্বরূপটা কী? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির কার কী ভূমিকা? বাংলার রেনেসাঁস কী বহতা নদী, না মরা গাঙ? যদি মজে গিয়ে থাকে তবে কার দোষে?

এইসব জিজ্ঞাসার জবাব 'বাংলার নবজাগরণ'। বিষয়টা বিতর্কযোগ্য। আমিও আমাদের রেনেসাঁস সম্বন্ধে ভেবেছি ও ভাবছি। এর মীমাংসা যদিও সহজ নয় তবু মোটামুটি বোঝা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সে জলতরঙ্গ রেনেসাঁস থেকে রিভাইভালে মোড়

নেয়। ইংরেজী শব্দদুটি একই রকম। কিন্তু তাদের অর্থ এক নয় রেনেসাঁসের দৃষ্টি ভবিষ্যতের উপরে, যে ভবিষ্যৎ ভিন্নতর। রিভাইভালের দৃষ্টি অতীতের উপরে, যে অতীত বারবার ঘুরে ফিরে আসবে, যেমন একটি ধ্রুবপদ।

তারপর রেনেসাঁস মোটের উপর ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত বলে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খ্রীস্টান সকলেই তার ঘাটে নেমেছিলেন ও তার জলে সাঁতার কেটেছিলেন। কিন্তু রিভাইভালে মুসলমানের অংশ ছিল না, খ্রীস্টানেরও না। ব্রাহ্ম যদি অংশ নিয়ে থাকেন তো ব্রাহ্মণ হয়ে। সেইজন্যে মুসলমানদের নিজেদের আলাদা একটা রিভাইভালের প্রয়োজন ছিল। আমাদের রেনেসাঁস যেমন একটাই, রিভাইভাল তেমন নয়। রিভাইভাল হচ্ছে দুটো। সেই দুই বীজ থেকে গাছও হলো দুটো। দুই বাংলা ও দুই ভারত। রিভাইভালের মানসিকতা এখনো কাজ করে যাচ্ছে। দুই দেশেই।

কাজী সাহেব গ্যেটের শিষ্য ছিলেন। মানবাত্মার অপরিসীম বিকাশসম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। তার বিকাশ তেরশো বছর আগে আরবভূমিতে পূর্ণতা লাভ করেছে এমন ধারণা তাঁর ছিল না। এমন ধারণার বিরুদ্ধেই তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সে কাজ রামমোহনের কাজের সঙ্গেই তুলনীয়। মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজের মতো রেফরমেশন আবশ্যক। কিন্তু মুসলমানরা এতকাল এটা এড়িয়ে এসেছেন এই বলে যে তাঁদের ধর্ম সব ধর্মের শেষ কথা। তাঁদের নবী সব নবীর শেষ নবী। তাঁদের শাস্ত্র স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার বাণী। সুতরাং খ্রীস্টীয় জগতে রেফরমেশন সম্ভব হতে পারে, হিন্দু জগতেও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মুসলিম জগতে অসম্ভব। তবু একদিন মুসলমানদের মধ্যেও রেফরমেশন হবে, সেদিন তার আদিপুরুষদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদের নামও থাকবে।

বছরখানেক আগে তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরে ওঠেন। তাঁর সেবাশুশ্রূষার দরকার, অথচ কেউ কাছে নেই। না তাঁর ছুই ছেলে, না তাঁর একমাত্র মেয়ে। সে সময় আমি তাঁর কন্যাকে পরামর্শ দিই তাঁকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কিছুদিন কাছে রাখতে। মানুষের একটা চেঞ্জও তো চাই। কাজী সাহেব কিন্তু গেলেন না। তাঁর কন্যার ভিসা ফুরিয়ে যায়, কন্যাও সময়মতো ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। যা হবার তা হবেই, এই যেন কাজী সাহেবের নিয়তি।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জানতে পেরেছি আরো একটা নিগূঢ় কারণ ছিল। মানুষ নিজেই তার নিয়তিকে ডেকে আনে।

ওত্নদ ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও দিলীপকুমারের সতীর্থ। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় থেকে তিন বন্ধুর সংকল্প চাকরি করবেন না, দেশের কাজ করবেন। সেই অনুসারে ওত্নদের চাকরি করার কথা নয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকে তাঁর মাতুলকন্যা জমিলাকে তিনি ভালোবাসতেন। মুসলমান সমাজে এ রকম বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। তাই অল্পবয়সে ছু'জনের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর অসুস্থ পত্নীর মুখ চেয়ে চাকরি নিতে হলো ওত্নদকে। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপনার জন্যে লেকচারার পদে নিযুক্ত হয়ে কাজী বললেন তাঁর স্ত্রীকে, "তোমার শরীর একটু ভালো দেখলেই চাকরিতে ইস্তফা দেব।"

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য চাকরি নেওয়া। স্বাস্থ্য কোনোদিন ভালো হলো না। চাকরিও কোনোদিন ছাড়া হলো না। যথাকালে পেনসন নিয়ে কাজী সাহেব কলকাতায় বসবাস করলেন। প্রোভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় বাড়ীটাকে বাড়ালেন। কিন্তু যার জন্যে এসব করা তিনি একদিন দেহত্যাগ করলেন। তারপর থেকে কাজী সাহেব ও বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না, গেলেও বেশীদিন থাকবেন না। অন্য ঘরে শোবেন না, অন্য খাটে শোবেন না। জানিনে মনে

মনে বলতেন কি না, “এই খাটেতেই মৃত্যু ওঁর এই খাটেতেই মরি।”

কাজী সাহেব চিরকালই স্বাধীনচেতা। চাকরি তাঁকে এতটুকুও নোয়াতে পারেনি। নোয়াবে কী করে? তাঁর পার্থিব চাহিদা যখন স্বল্প। পরিমিত উপার্জন বা পেনসন থেকে একটা মোটা অংশ যেত দান খয়রাতে। আশ্রিতদের জন্যে তিনি বেশ ভাবনায় পড়েছিলেন। শেষের দিকে তাঁর হাত খালি হয়ে এসেছিল। পুরস্কারের সুসমাচারটা জানিয়ে যেদিন চলে আসছি সেদিন তাঁর প্রতিবেশী বা অনুচরকে একজন বলেন, “টাকাটা খুব কাজে লাগবে। অর্থকষ্টে পড়েছেন। অনেকগুলি গরীবদুঃখীকে মাসোহারা দিতে হয়।”

চিন্তানায়ক ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদ যে অর্থনীতি ও রাজনীতির এম. এ. ছিলেন এ তথ্য আমার জানা ছিল না। তাঁর প্রয়াণের পরেই জানতে পাই।

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে অর্থনীতি ও রাজনীতি পড়ুয়াদের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এত কঠিন ছিল না। ওদুদ সাহেব অল্পায়াসেই আরো অর্থকরী পদ যোগাড় করতে পারতেন। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন সাহিত্যচর্চাকে। কিন্তু একে তো তাঁর চাকরি করতেই অভিরুচি ছিল না, দ্বিতীয়ত তিনি চাকরি নিলেও ছেড়ে দেবার কথাই ভেবেছিলেন। সাহিত্যকেই অর্পণ করতে চেয়েছিলেন তাঁর অখণ্ড মনোযোগ।

পারিবারিক কারণে তা যখন সম্ভব হলো না তখন সাহিত্য অধ্যাপনাকেই করতে হলো জীবনোপায়। তার সঙ্গেই সবচেয়ে খাপ খায় সাহিত্যচর্চা। সংসার প্রবেশের পূর্বেই লেখা হয়েছিল 'নদীবক্ষে' ও 'মীর পরিবার' বলে দু'খানি বই। বই দু'খানি পড়ে গুণগ্রাহী দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁর সুপারিশে ওদুদ সাহেবকে দেওয়া হয় ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা অধ্যাপকের নতুন পদ।

ঢাকার মতো একটি শিক্ষাকেন্দ্রে ঘরোয়া পড়াশুনার ও মেলামেশার প্রভূত পরিসর ছিল। সেখানকার ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের অবকাশও ছিল প্রচুর। হিন্দু মুসলমানের ভেদ মানতেন না বলে সর্বত্র ছিল তাঁর জন্যে মুক্ত দ্বার। সকলের জন্যে তাঁরও মুক্ত দ্বার। মুক্তির মধ্যে মানুষ হওয়ায় অনায়াসেই তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয় যে 'বুদ্ধির মুক্তি' না হলে মুসলিম সমাজের প্রগতি হবে না। আর মুসলিম সমাজের প্রগতি না হলে হিন্দু সমাজের প্রগতি যেন

এক পায়ে চলার চেষ্টা। বাঙালী কখনো এক পায়ে চলে বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

বাংলার আর বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ও সার্বিক প্রগতিই ছিল কাজী আবদুল ওদুদের ধ্যান। যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের। 'যারে তুমি পিছে রাখ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' মুসলিম সমাজ তখন শিক্ষাদীক্ষায় পেছিয়ে রয়েছে। অথচ শিক্ষাদীক্ষায় কী করে অগ্রসর হওয়া যায় এ প্রশ্ন উঠলেই একদল বলে আরো মাদ্রাসা ও আরো মক্তব চাই, আরো আরবী ও আরো ফারসী চাই, স্বতন্ত্র একটা ইসলামী শিক্ষাবিভাগ চাই, স্বতন্ত্র একটা আরবী বিশ্ববিদ্যালয় চাই। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় আরো কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে যাবার জেদ ধরে।

অর্থাৎ ওরা ইংরেজী সংস্কৃতিও চায় না, বাংলা সংস্কৃতিও চায় না। এককথায় প্রগতিই চায় না। অথচ ওদের হাতে ভোট। মুসলিম মন্ত্রীকে ওদের ভোটের উপরেই নির্ভর করতে হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির এই হলো লজিক যে মুসলমান আরো পশ্চাৎপদ হতে চাইলে হতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে কাজী সাহেবের মতো চিন্তানায়কদের বিশেষ একটা দায়িত্ব ছিল। মুসলিম সমাজ যাতে হিন্দু সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে পারে ও উভয়ের মিলিত পদক্ষেপ যাতে বাইরের জগতের সঙ্গে তাল রাখে। তার মানে এক চোখ রাখতে হয় হিন্দুর উপরে, আরেক চোখ পশ্চিমের উপরে। ও ছাড়া আর কোন উপায়েই মুসলিম সমাজের প্রগতি হতো না। ইংরেজীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে তো নয়ই, বাংলার উপর বিমুখ হয়েও নয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের চিরাচরিত রীতির বিপরীত পন্থা নির্দেশ করে ওদুদ সাহেব অপ্রিয় হন। তবে তাঁর সহকর্মী ও সহভাবুকের অভাব হয় না। ঢাকা থেকে বদলী হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। এবার পাঠ্য পুস্তক কমিটির সেক্রেটারি। গোটাকতক পাঠ্যপুস্তক লিখে মঞ্জুর করিয়ে নিতে পারলেই তিনি বড়লোক হয়ে যেতেন।

কিন্তু তা না লিখে যা তিনি লিখলেন তা মুসলমানদের পক্ষে অপ্রিয় সত্য। হিন্দুর পক্ষেও। হিন্দুকেও তিনি রেয়াৎ করেননি। বহুকাল ইংরেজের মুৎসুদ্দিগিরি করে হিন্দুরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, এখন সাজছে জাতীয়তাবাদী। মুসলমানের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা অর্জন করা অত সহজ নয়। সে সময় আমার এসব ভালো লাগেনি, কিন্তু দেখা গেল মুসলমানরা সত্যি সত্যি পাকিস্তানের জন্যে ভোট দিল। স্বয়ং কাজী সাহেবের পক্ষেও এটা একটা বজ্রাঘাত। তিনিও তো ব্যর্থ হলেন। তাঁর চিন্তানায়কত্বও তো পরিত্যক্ত হলো। মুসলিম সমাজে তিনি অবজ্ঞাত।

স্বেচ্ছায় তিনি ভারতীয় ইউনিয়নকেই বেছে নেন। চাকরিতে উন্নতি হলো না। কত লোক রিটায়ার করেও নানা ছলে চাকরিতে বহাল থাকে। ওদুদ তার জন্যে কোন চেষ্টাই করলেন না। সাহিত্য-চর্চায় পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। ইতিমধ্যেই 'কবিগুরু গ্যেটে' সমাপ্ত হয়েছিল। এবার লিখলেন 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ'। তার চেয়েও বৃহৎ গ্রন্থ। এরপর যখন 'হযরৎ মোহম্মদ' লিখতে যাবেন তখন আমি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলি, "কেন মিছিমিছি ধর্মান্ধদের হাতে প্রাণ হারাবেন? আপনি মরতে ডরান না, তা জানি। কিন্তু আমরা তো আপনার জন্যে ডরাই।"

কাজী ছিলেন অকুতোভয়। 'হযরৎ মোহম্মদ' তো লিখে শেষ করলেনই, উপরন্তু তর্জমা করলেন পবিত্র কোরানের। এটিও মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ কাজ। কোরান যারা পড়তে চায় তারা আরবীতে পড়বে। আরবীতেই আল্লার বাণী শ্রুত হয়েছিল। বাংলা হলো হিন্দুদের ভাষা। সে ভাষায় কোরানের তর্জমা করলে তার গুণ নষ্ট হবে। পরে আর কেউ আরবী পড়বে কেন? মৌলবীদের মানবে কেন?

মুসলিম সমাজকে কাজী সাহেব মুক্তির দিশা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। মৌলবীদের হাত থেকে মুক্তি। শাস্ত্রীদের হাত থেকে

মুক্তি। ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা বাংলার জন্যে জান দিয়েছে, সেখানে এখন বাংলার জয়জয়কার। ইংরেজী উঠিয়ে দেবার জন্যে কতক লোক উঠে পড়ে লাগলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রগতিশীল ভূমিকা শিক্ষিত মহলে স্বীকৃত। এক চোখ বাংলার উপরে, আরেক চোখ ইংরেজীর উপরে। আরবী ফারসী হটে যাচ্ছে। ওরা যখন বাংলা লেখে তখন আরবী ফারসী ও ইংরেজী তিনটেই সযত্নে বাদ দেয়।

কাজী আবদুল ওদুদ যে পন্থা নির্দেশ করেছিলেন সেই পন্থাই অবশেষে গৃহীত হয়েছে। যদিও তিনি স্বয়ং গৃহীত হননি। ভাবীকাল তাঁকে তাঁর প্রকৃত মূল্য দেবে।

এই গেল তাঁর জীবনের একটা দিক। অন্য একটি দিকের কথা বলি। আমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আমাকে তিনি বলেছিলেন, "Go deep into the country." তার মানে কেবল শান্তি-নিকেতনে গিয়ে সাহিত্যচর্চা নয়, বাংলার জনজীবনের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ। তাঁর সে বাণী আমি মনে প্রাণে মান্য করেছিলুম। কিন্তু পল্লীগ্রামে গিয়ে বসবাস করার অভিপ্রায় এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে। ঘটনাচক্র আবার আমাকে কলকাতায় টেনে এনেছে। কাজী সাহেবও কি ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে ফিরতে পারলেন? সেটাও তাঁর জীবনে স্বপ্ন রয়ে গেল।

হিন্দু মুসলিম সমস্যা যেমন তাঁকে তেমনি আমাকে সারাজীবন ভাবিয়েছে। তিনি ও আমি উভয়েই বিশ্বাস করতুম যে বাংলাদেশ অবিভাজ্য, হিন্দু মুসলমান অবিচ্ছেদ্য, মীমাংসা একদিন হবেই, স্বরাজের পূর্বে না হয় পরে। দেশভাগের পরে আমি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হই জেলার শাসনভার নিতে। সেখান থেকে ফিরে কাজী সাহেবকে বলি, "হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ যেমন ছিল তেমনি রয়েছে, দেশ ভাগ হয়েছে বলে সম্পর্ক কেটে যায়নি।" তিনি গম্ভীর মুখে

বলেন, "আপনি জানেন না, সাম্প্রদায়িক বিষ এখন গ্রামের মধ্যেও ঢুকেছে।"

এর প্রমাণ পাওয়া গেল বছর দুই বাদে ১৯৫০ সালে। এপার দাঙ্গা ওপার দাঙ্গা। শরণার্থীদের দৌড়। শুধু কি ওপার থেকে? এপার থেকে নয়? দ্বিজাতিতত্ত্ব দৃশ্যত সত্য হলো। তখন আমার 'প্রত্যয়' নামক একখানি বই কাজী সাহেবকে উৎসর্গ করি। উৎসর্গ-পত্রে বলি, "সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণসত্ত্বেও অমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অবিভাজ্য।"

আপাতত আমাদের কয়েকজনকে দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে যে আমরা এক ও অবিভাজ্য। ওদুদ সাহেবের জীবন এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চিকের আড়াল

চিকের ওপাশে তিনি। চিকের এপাশে আমি। একদা এক মহারানীর সঙ্গে আমার এইভাবে মোলাকাৎ হয়েছিল।

সে আজ চৌত্রিশ বছর আগেকার কথা। সে জমিদারও নেই, সে কালেকটারও নেই। সে জমানা হাওয়ার সঙ্গে চলে গেছে। একালে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে সেকালে অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে এই ছিল এদেশের রেওয়াজ।

আশ্চর্যের ব্যাপার এ রেওয়াজ এখন অন্য রূপ নিয়েছে। ভারত আর পাকিস্তান এ দুইয়ের মাঝখানেও এক চিকের আড়াল। বলতে প্রলোভন হয় লৌহ যবনিকা। কিন্তু সেটা জুৎসই নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন বা পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে আমাদের কারো তুলনা চলে না। ততখানি বৈপরীত্য এক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়।

আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাইনে, কিন্তু দূর থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। বইপত্র যাওয়া আসা করে না, কিন্তু চিঠিপত্র চলাচল করে। খবরের জন্যে বিলিতী পত্রিকার দিকে তাকাই, কিংবা আন্তর্জাতিক এজেন্সীর দিকে। মাল পাচার, মানুষ পাচার সমানে সক্রিয়। সেইসূত্রে কেতাবও দু'একখানা আনাগোনা করে।

মহারানীকে কি আমি দেখেছি? না, চাক্ষুষ করিনি। মহারানী কি তবে আমার অচেনা? না, তাই বা কেমন করে বলি? তেমনি পাকিস্তানও আমাদের অচেনা নয়। সেখানকার সাহিত্যকরাও আমাদের অচেনা নন। কিন্তু মাঝখানে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। চিকের আড়াল।

এই যখন অবস্থা তখন পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংস্কৃতির বা

সাহিত্যের একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। তেইশ বছর অপেক্ষা করেও সে কাজে ব্রতী হতে পারলুম না। যখনি উদ্যোগী হই তখনি একটা না একটা ঘটনা ঘটে আর চিকের আড়াল আরো দুর্লঙ্ঘ্য হয়। আগেকার দিনে যে দু'চারজন আসতেন ইদানীং তাঁরাও আর আসেন না। আর আমাদের যাওয়া তো অকারণে সন্দেহভাজন হতে চাওয়া।

দেশভাগের পাঁচবছর পরে শান্তিনিকেতনে আমরা একটি সাহিত্যমেলা করি। উদ্দেশ্য চিকের আড়াল ভেদ করে পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশা ও তেমনি করে বিগত পাঁচবছরের বাংলাসাহিত্যের দুই ধারার যোগাযোগ ঘটানো। দেশ দু'ভাগ হলেও সংস্কৃতি তো দু'ভাগ হয়নি। রবীন্দ্র নজরুলকে তো আর দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। র‍্যাটক্লিফ তো এমন কোনো রোয়েদাদ দেননি যে এপারের ভাষা আর ওপারের ভাষা পরস্পরের কাছে বিদেশী ভাষায় পরিণত হবে। যেমন স্পেনের ভাষা পর্তুগালের ভাষা।

পূর্ববঙ্গে কিন্তু সেই চেষ্টাই চলেছিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছা পূর্ব পশ্চিম উভয় প্রান্তের সাধারণ ভাষা হয় উর্দু। বাংলাকে তাঁরা অবশ্য বিলুপ্ত করবেন না, তবে সমান আসনও দেবেন না। বাংলা হবে একটি আঞ্চলিক ভাষা আর উর্দু হবে সার্বভৌম ভাষা। যেমন ইসলাম হচ্ছে সর্বভৌম ধর্ম। ইসলাম ও উর্দু যেন একবৃন্তে দুটি ফুল। একটিকে স্বীকার করলে অপরটিকেও স্বীকার করতে হয়। যে উর্দুকে স্বীকার করবে না সে ইসলামেরও শত্রু। উর্দুকে স্বীকার করতে গিয়ে যদি বাংলা তলিয়ে যায়, নিম্নস্তরের ভাষা হয় তবে আর উপায় কী! পাকিস্তান যখন কবুল করেছ তখন উর্দুকেও কবুল করতে হবে। যে উর্দু শিখবে না তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বরং বাংলা না শিখলেও চলবে। ওটা তো কাফেরদের ভাষা! ওর আবার সাহিত্য! সমস্তটাই কাফেরদের সংস্কৃতির বাহন! বাংলা

যদি নিতান্তই রাখতে চাও ওর সঙ্গে আরবী ফারসী মিশিয়ে দিয়ে ঘোঁট পাকাও। লেখো আরবী হরফে। হোক ওটা উর্দূতর। ওর হাজার বছরের ইতিহাস বাতিল করে নতুন ইতিহাস শুরু করো। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্ববর্তীরা তোমাদের কেউ নন। রাখতে পারো শুধু নজরুল আর তাঁর পূর্বগামী মুসলিম সাহিত্যিকদের। ওঁরাই তোমাদের আপন। কিন্তু ওঁদের চাইতেও আপন ইকবাল, হালী, গালিব।

বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর উর্দূভাষী মুসলমানদের অবজ্ঞা পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হয়েছিল। সেইজন্যে অমন একটা অপচেষ্টা সম্ভব হলো। কর্তারা ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁরা যখন পাকিস্তান হাসিল করে দিয়েছেন তখন তাঁরা যা আদেশ করবেন তাই পালন করা হবে। কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর জুলুম পূর্ববঙ্গের মুসলমান যুবকরা সহ্য করল না। পুলিশের গুলীতে জান দিল। সেই যে ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারি তার ফলশ্রুতি এই হলো যে বাংলাকেও উর্দূর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে একাসনে অভিষিক্ত করতে হলো। পাকিস্তানের অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা না হয়ে হলো উর্দূর সমকক্ষ রাষ্ট্রভাষা। কেউ কারো চেয়ে বড়োও নয়, ছোটও নয়। অবিকল সমান। সংস্কৃতির দিক থেকে পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রয়ে গেল। রাজনীতির দিক থেকে যাই হোক। এটা অবশ্য পশ্চিমারা এখনো প্রাণ থেকে মেনে নেয়নি। সেইজন্যে এখনো রকমারি ফরমাস করে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে বাংলা লিখতে হবে রোমান হরফে। আর উর্দূ? সাবেক হরফে।

সেই যে ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারি তার বছর খানেক বাদেই আমাদের সাহিত্যমেলা। পূর্ববঙ্গের থেকে আমরা পাঁচজন সাহিত্যসেবীকে নিমন্ত্রণ করি। তাঁদের মধ্যে তিনজন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা হলেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও শামসুর রাহমান।

'হারামণি' সংকলন করে মনস্থুর উদ্দীন যশস্বী হয়েছেন। তাঁর খ্যাতি এখন আন্তর্জাতিক। একদা তাঁর সংগ্রহকার্যে আমারও কিঞ্চিৎ সহযোগিতা ছিল। পুরোনো আলাপী তিনি, তাঁকে পেয়ে আমি আনন্দে অধীর। তেমনি কাজী সাহেবকে। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার কোনো এক গ্রন্থের তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘরোয়া সমালোচনা করেছিলেন, তাতে ছিল তাঁরই অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন।

এইখানে একটা কৌতুকের কথা বলি। সকলেই জানেন যে মোতাহার হোসেন আছেন কি ছিলেন তিনজন। কাজী মোতাহার হোসেন, স্থফী মোতাহার হোসেন ও মোতাহের হোসেন চৌধুরী। আমরা চেয়েছিলুম কাজীকে। তিনিই সকলের চেয়ে বর্ষীয়ান। আর কাজী আবতুল ওত্নদ সাহেবের মতো তিনিও একদা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হঠাৎ দেখি আমার নামে এক চিঠি। "আপনাদের নিমন্ত্রণের জন্যে বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো আসতে পারব না। আমি যে বর্বর হয়ে গেছি।"

আমি তো অবাক! বলেন কী কাজী সাহেব! তিনি বর্বর হয়ে গেছেন! যাক, আরো কয়েক লাইন পড়ে বোঝা গেল লেখক নতুন বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয়বায় বর হলে মানুষ বর-বর হয়ে যায়।

কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা যিনি লিখেছেন তিনি কাজী সাহেবই নন। তিনি চৌধুরী সাহেব। উদোর চিঠি কেমন করে বুধোর ঘাড়ে চেপেছে। ধরুন, তিনি যদি চিঠির উত্তরে সশরীরে এসে হাজির হতেন তা হলে কী মুশকিলেই না পড়া যেত! আমরা তো সত্যি তাঁকে চাইনি। এই মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গেও একবার কুমিল্লায় আলাপ হয়েছিল। চমৎকার রসজ্ঞ, সাহিত্য সমজদার। আমার লেখা নিয়েই ঘরোয়া সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তখনো তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি কাজী সাহেবের অনুরূপ হয়নি। তিনি সিনিয়র নন, জুনিয়র।

কিন্তু আমাদের সাহিত্যমেলায় ভুলক্রমে তিনিই যদি এসে হাজির হতেন তা হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। কারণ তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন তা কেবল পূর্ববঙ্গে নয়, বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয়। সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অকালমৃত্যু ঘটে ১৯৫৬ সালে। পঞ্চাশোর্ধে মাত্র তিনটি বছর তিনি দাম্পত্য সুখ পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পত্নী ছিলেন পাগল। যতদিন সেই পত্নী জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি পাগলের সেবা করেছিলেন। অধ্যাপনা আর সাহিত্যসেবা ছিল তাঁর পেশা আর নেশা। পরে তিনি যুদ্ধের মরসুমে স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে মিলিটারি কন্‌ট্রাক্‌টর হন। এমনি করে সাহিত্যের ভরাডুবি ঘটে। জীবিত অবস্থায় তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে বেরোয়নি। মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুরা মিলে তাঁর রচনার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। 'সংস্কৃতি-কথা" নামক সেই পুস্তকটি আমাকে পাঠিয়ে দেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ওই একখানি বই লিখে অমর হয়ে গেলেন। প্রগতিশীল চিন্তা ও সরস কথ্য ভাষার জন্যে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সেই যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন তার সঙ্গে মোতাহের হোসেন চৌধুরীও জড়িত ছিলেন। কিন্তু থাকতেন তিনি কুমিল্লায়। আর কুমিল্লায় তাঁর তেমন কোনো গোষ্ঠী ছিল না। ঢাকায় বা কলকাতায় থাকলে ও কোনো একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করলে তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু পাওয়া যেত। বেশ বোঝা যায় যে তাঁর চোখের সামনে ছিল প্রথম চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র মডেল। মুসলিম লেখকদের আর কারো বেলা এরকমটি ঘটেনি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর একখানি বড়ো চিঠি রংপুরের একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। সেখানে বার বার প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথা বলেছেন। প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র প্রভাবে এসে শুধু যে তাঁর ভাষা হয়ে দাঁড়ায় প্রমথ চৌধুরীর বাংলা তাই নয়, তাঁর জীবনদর্শনও হয়ে ওঠে 'সবুজ-পত্রে'র জীবনদর্শন। তাঁকে মুসলিম লেখক না বলে বাঙালী লেখক

বললেই ঠিক বলা হয়। আধুনিক বাঙালী লেখক। পূর্ব পাকিস্তানে তরুণ লেখকরা এখন আধুনিক বাঙালী লেখক রূপেই পরিচয় দিতে চান। তাঁদের সকলেরই মডেল এখন প্রমথ চৌধুরীর বাংলা। জীবনদর্শনও অনেকটা 'সবুজপত্রে'র মতোই যুক্তিবাদী। ধর্ম নয়, সংস্কৃতিই এখন তাঁদের মানস সিংহাসন জুড়েছে। সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গেছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী—

"ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা—সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোক ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা। ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্যে ধর্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের উপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা তাতে তাদের সূক্ষ্মচেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্মচেতনার অপর নাম আত্মা।"

পাকিস্তান হওয়ার পূর্বেই বাংলার মুসলিম মহলে রেনেসাঁস কথাটা প্রায়ই শোনা যেত। কিন্তু রেনেসাঁস বলতে তাঁরা বুঝতেন ইসলামের রেনেসাঁস। ভারতের বা বঙ্গের রেনেসাঁস নয়। ধর্মের কোথাও রেনেসাঁস ঘটেছে বলে ইতিহাসে লেখে না। ধর্মের যেটা ঘটে সেটা রিভাইভাল। সেইজন্যে এই গোলমেলে বিষয়টার একটা নিষ্পত্তির প্রয়োজন ছিল। মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখেছেন—

"রিনেসাঁস কথাটার শব্দগত অর্থ পুনর্জন্ম, অর্থাৎ পুরাতনে ফিরে যাওয়া, অথবা পুরাতনকে ফিরে পাওয়া, কিন্তু ভাবগত অর্থ নবজন্ম, মানে মানবমহিমা তথা বুদ্ধি ও কল্পনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রিনেসাঁসের ইতিহাস তাই জীবনসূর্যের পুনরুদয়ের ইতিহাস—বুদ্ধি ও কল্পনার

জয়যাত্রার ইতিহাস। য়ুরোপের ইতিহাস থেকে কথাটি নেওয়া হয়েছে। অতএব একবার সেদিকে তাকানো দরকার! য়ুরোপের মধ্যযুগ শাস্ত্রশাসনের যুগ—পোপের সর্বময় প্রভুত্বের যুগ। বুদ্ধিবিচার, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের প্রতি এযুগ আস্থাহীন। জগৎ ও জীবনের প্রতি এযুগের বিস্ময়দৃষ্টি নেই, বরং এসবকে পতনের ফাঁদ বলেই গণ্য করে। সৌন্দর্য ও প্রেম, এসব তো শয়তানের কারসাজি, সুতরাং এসবকে জব্দ করা আর শয়তানকে জব্দ করা এক কথা। তাই চলল আত্মবিকাশের পরিবর্তে নিদারুণ আত্মনির্যাতনের পালা। আর এই নির্যাতনে নির্যাতনে ক্ষীয়মাণ মানবাত্মা পরিণামে বিদ্রোহী হয়ে প্রশ্ন করলেঃ এ কি সত্যি? এই জগৎ ও জীবন, এই প্রেম ও সৌন্দর্য, এসব কি সত্যই মিথ্যা? এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাকে নিয়ে গেল সত্যের সোনার সিংহদুয়ারে। সে বুঝতে পারলে জীবনচর্চাই জীবনের উদ্দেশ্য, আর প্রেম সৌন্দর্য্য কল্পনা ও বিচার-বুদ্ধির অনুশীলনই জীবনের অনুশীলন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক যুগের সুপ্রভাত। মানবমহিমা মেঘমুক্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়ে উজ্জ্বল প্রভাতের সৃষ্টি করলে।”

এর পরে আর ইসলামী রেনেসাঁসের প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু সবাই তো মোতাহের হোসেন চৌধুরীপন্থী নন। ইসলামী রেনেসাঁস বা রিভাইভাল এখনো বহু লোকের মন জুড়ে রয়েছে। তাঁরা চান ইসলামের আদি ও সমুন্নত যুগ। তার আজকের অবস্থায় তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁদের চিন্তা অনিবার্যরূপেই তাঁদের সম্প্রদায়িক করেছে। তাঁদের সঙ্গে মতভেদ অনিবার্যরূপেই তরণ তুর্কদের বিদ্রোহের প্রেরণা দিয়েছে। এমনি এক বিদ্রোহী লেখক হলেন বদরুদ্দিন উমর। স্বদেশী যুগের স্বনামধন্য নেতা আবুল কাশেমের বংশধর।

পাকিস্তানের জলে বাস করে সাম্প্রদায়িকতার কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কি সহজ কথা? বদরুদ্দীনকে অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিতে হয়েছে। তাঁর বই দু'খানিও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই সৎসাহসী

যুবক এখন চিন্তাশীল লেখকহিসাবে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী। যখন লেখেন তখন কারো মুখ চেয়ে লেখেন না। সেটা তাঁর রচনার থেকেই প্রমাণ। তিনি লিখেছেন—

"বাঙালীত্ব ও মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট। উনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হলো. মুসলমানরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানরা ততই সরে আসার চেষ্টা করল বাংলাব সংস্কৃতি থেকে। তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হলো বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক কাজেই তারা বাঙালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কখনও খুব তীব্র আকার ধারণ করত না। হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিজেদেরকে সমভাবে বাঙালী মনে করলে ধর্মীয় বিরোধের গুরুত্ব অনেকখানি কমে আসত। কিন্তু সেটা না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করল এবং তার ফলে মুসলমানরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে শুধু দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়, অনেকক্ষেত্রে ঘৃণাও বোধ করল। কারণ তাদের মতে বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা তাদের মুসলমানত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা।"

এই মুল্যবান প্রবন্ধটির নাম "বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট।" মুসলিম সংস্কৃতির নয়। বিস্তর আলোচনার পর উমর সাহেবের সিদ্ধান্ত হলো এই। "এজন্যেই সাম্প্রদায়িকতা যেপর্যন্ত আমাদের মানসলোকে রাজত্ব করবে সেপর্যন্ত আমরা এই সাংস্কৃতিক সঙ্কটের হাত থেকে রেহাই পাব না। এ সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বস্তরে এবং সর্বভাবে খর্ব করা এবং উত্তীর্ণ হওয়া। এ প্রচেষ্টায় সফলকাম হলে 'আমরা বাঙালী না মুসলমান, না

পাকিস্তানী' এ ধরণের অদ্‌ভুত প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানরা আর কোনদিন নিজেদের কাছ উত্থাপন করবে না। এবং তখনই তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হবে নিজেদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়।"

সকলেই জানেন সেদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে অতিযত্নে লালন করা হয়েছে, কদাচ তাড়না করা হয়নি। বদরুদ্দীন সাহেবের তাড়নায় সুফল ফলবে আশা করি। লক্ষণ দেখে মনে হয় সাম্প্রদায়িকতার যুগ আর বেশীদিন নয়।

সাহিত্যমেলার পর আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয়বার সাহিত্যমেলা বসেনি। পূর্ব পাকিস্তান থেকেও কেউ যোগ দিতে আসেননি। বাংলাসাহিত্যের গতি এপারে কতদূর হয়েছে আমরা তা জানি। ওপারে কতদূর হয়েছে তা জানিনে। চিকের আড়াল ঘুচে না গেলে জানতে পাবও না। আপাতত যখন যা কুড়িয়ে পাচ্ছি তারই উপর নির্ভর করতে হচ্ছে! সেদিন এক বন্ধু আমাকে আবুল ফজল সাহেবের "রেখাচিত্র" পড়তে দেন। এখানি একখানি অসামান্য আত্মজীবনী। লেখক শুধু নিজের জীবনের কথা নয়, আস্ত একটা যুগের ছবি এঁকেছেন। তাতে অসংখ্য লোকের উল্লেখ আছে। তাঁদের অনেকেই হিন্দু। হিন্দু মুসলমানের প্রীতির সম্পর্ক এমন মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে ভাবীকাল আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে, "তবে ওরা ঠাঁই ঠাঁই হলো কেন?"

চট্টগ্রামে আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আর তাঁর শ্বশুর মাহবুব উল আলম সাহেবের সঙ্গে। বলতে গেলে এঁরাই ছিলেন সেখানে আমার সাহিত্যিক স্বজন। আবুল ফজলের ভাষা ও শৈলী পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো কথা সাহিত্যিকের সঙ্গে তুলনীয়। যাদের সম্বন্ধে গল্প তাঁরা মুসলমান, তা না হলে আর সবই নির্বিশেষে বাংলা। আমিই তাঁকে চট্টগ্রামের স্থানীয় উপভাষায় লিখতে প্রবুদ্ধ করি। লিখেওছিলেন, হয়েওছিল খাসা। কিন্তু পড়বে কে? তেমনি

ঢাকার উপভাষায়ও কেউ পড়তে চান না। গোটা পূর্ব বাংলাই এখন পশ্চিম বাংলার চলতি ভাষাকেই আপনার করে নিয়েছে। এটা কি একপ্রকার বিপ্লব নয়! দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার বিষময় পরিণাম আমরা হাড়ে হাড়ে ভুগেছি ও ভুগছি। কিন্তু তার অমৃতময় পরিণাম হচ্ছে দুই প্রান্তের চলতি ভাষা এক হয়ে যাচ্ছে আর চলতি ভাষাই হচ্ছে সাহিত্যের ভাষা। ধর্ম আমাদের এক নয়, তাই আমরা দুই। কিন্তু ভাষা আমাদের আগের চেয়েও এক। তাই মনও আগের চেয়ে এক। এই যে মানসিক ঐক্য এর জন্যে ইতিহাসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। জগতে দৈহিক ঐক্যই কি একমাত্র কাম্য? মানসিক ঐক্য যেদিন আরো দৃঢ় হবে সেদিন চিকের আড়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে!

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'

সংস্কৃতি কথাটি নতুন, কিন্তু বিষয়টি পুরোনো। সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা আমরা সকলেই মোটামুটি বুঝি। তর্ক বাধে যখন তার সামনে একটা বিশেষণ বসিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা ভারতীয় সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা প্রাচ্য সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি বা দ্রাবিড় সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি, বা অসমীয়া সংস্কৃতি। এ ছাড়া শ্রেণীগত বিশেষণও দেখা যায়। বুর্জোয়া সংস্কৃতি বা প্রোলিটারিয়ান সংস্কৃতি।

এতক্ষণ আমি 'বা' অব্যয়টি ব্যবহার করেছি। অনেকে তার বদলে 'বনাম' ব্যবহার করবেন। যেন দুই বিপরীতের বিরোধ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 'ফরাসী বনাম জার্মান' সংস্কৃতির মামলা শোনা গেছে। তার দু'হাজার বছর আগের এথেন্স বনাম স্পার্টা জন্মান্তরিত হয়ে প্যারিস বনাম বার্লিন হয়েছে।

এথেন্স কেন এথেন্স, স্পার্টা কেন স্পার্টা এর কোনো অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা নেই। বৃথা চেষ্টা। কতকগুলি মূল্য আছে যার মূর্তপ্রকাশ এথেন্স। তেমনি আরো কতকগুলি মূল্য আছে যার স্পষ্ট প্রতীক স্পার্টা। একই ভাষা, একই ধর্ম, একই রক্ত—তবু কৌরব আর পাণ্ডব। কৌরব বনান পাণ্ডব। এগারো শ' বছর আগে ফরাসী ও জার্মান ভাই ভাই ছিল। এখনো তাদের অমিলের চেয়ে মিলই বেশী। তবু অমিলটাকেই ওরা বাড়িয়ে দেখে। কেন তার রাজনৈতিক কারণ যে কেউ বুঝতে পারে। গভীরতর কারণগুলো রাজনৈতিক নয়। কতক ধর্মগত। যেমন ক্যাথলিক বনাম প্রোটেস্টান্ট। কতক মর্মগত। যেমন বিপ্লবপ্রবণতা বনাম শৃঙ্খলা-পরায়ণতা। কতক আবার বংশগত। টিউটন বনাম লাটিন। কতক

এসেছে প্রাকৃতিক জলহাওয়া থেকে। শীত বনাম নাতিশীতোষ্ণ। এ ছাড়া রুচির প্রশ্নও আছে।

এমন অবস্থায় মানব সংস্কৃতির অখণ্ডত্বের স্বপ্ন দেখলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের খ্রীস্টান ও মুসলিম বন্ধুরাও যে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁদের শর্ত ছিল এইটুকু যে সবাইকে একটিবার কলমা পড়তে হবে বা পুণ্য সলিলে অবগাহন করতে হবে। অমনি মরক্কো থেকে বোর্নিও পর্যন্ত যেখানে যত মানবসন্তান সকলেই হবে অখণ্ড সংস্কৃতির অধিকারী। আর সুইডেনের শ্বেতাঙ্গ থেকে কঙ্গোর কৃষ্ণাঙ্গ পর্যন্ত সকলেরই সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন। তবে হিন্দুরা তেমন কোনো দাবী করে না।

ধর্ম যা পারেনি বিজ্ঞান কি তা পারবে? বলা যায় না। এখনো বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বিশ্বব্যাপী হয়নি। হিন্দু বিজ্ঞান, মুসলিম বিজ্ঞান, প্রাচ্যবিজ্ঞান, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ফরাসী বিজ্ঞান, রুশ বিজ্ঞান, বুর্জোয়া বিজ্ঞান, প্রোলিটারিয়ান বিজ্ঞান বলে ভেদাভেদ সম্ভব নয় বলে আশা করতে পারা যায় যে বিশ্ববিজ্ঞান একদিন সবাইকে এক সংস্কৃতির সূত্রে গাঁথবে। তেমনি হিউমানিটিজ বলে যেসব বিষয়কে সংযুক্ত করা হয় তাদের ভিতরেও ঐক্য না হোক সামঞ্জস্য সম্ভবপর। ভারতে প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষায় যাকে আর্টস বলা হতো সে জিনিস পুরোপুরি পাশ্চাত্য ছিল না, তাতেও বিশ্বের দান ছিল। আর পাশ্চাত্য হলেও গ্রীক লাটিন বিশ্বজনীন। ভবিষ্যতে যে শিক্ষাই প্রবর্তিত হোক না কেন গ্রীক সংস্কৃতি তার সামিল হবেই। সেই সঙ্গে রোমক সভ্যতা। গ্রীস রোমকে বাদ দিয়ে প্রতীচ্য নয়। প্রাচ্যকেও রোমের উত্তরাধিকার স্বীকার করতে হবে। তেমনি ইউরোপকে নিতে হবে প্রাচীন ভারতের অমর উপলব্ধি। উপনিষদ্ তথা বৌদ্ধ দর্শন। আরব পারসিকদের উপলব্ধিও অমর। সুতরাং অপরেরও স্বীকার্য।

আমার একজন ইন্দোনেশীয় বন্ধু ছিলেন। তিনি ধর্মে মুসলমান,

কিন্তু নামকরণের বেলা হিন্দু। তাঁর নিজের নাম সুচিপ্ত বীর্য-সুপার্থ। তাঁর পুত্রের নাম রাখেন আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন। ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ভারতের মাটিতে যতটুকু হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে। ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যা কখনো এমন উৎকট হতো না, যদি এদেশের মুসলমানদের নামকরণ হতো প্রাচীন ভারতীয় প্রথায়। যদি প্রাচীন ভারতীয় রামায়ণ মহাভারতের প্রতি মুসলমানদের আত্মীয়তাবোধ থাকত। সংস্কৃতিকে স্বীকার করলে ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় ইন্দোনেশিয়াকে দেখে তা মনে হয় না। ওদেশের লোক খাঁটি মুসলমান। অথচ এদেশে এমন একটা ধারণা চলে আসছে যে যদি কেউ খাঁটি মুসলমান হতে চান তাঁকে তার প্রাচীন ভারতীয় উত্তরাধিকার সযত্নে পরিহার করতে হবে।

ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির এই অসামঞ্জস্য দূর না হলে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতির মিলন ভাসা ভাসা হবে। ভাষাগত ঐক্য থাকলেই কি মনের মিল হয়? তা হলে তো ইংরেজ মার্কিন পৃথক হতো না, মার্কিন দেশের উত্তরে দক্ষিণে গৃহযুদ্ধ বাধত না, শ্বেত মার্কিন কৃষ্ণ মার্কিন রাস্তায় ঘাটে লড়াই করত না। বাঙালী হিন্দু মুসলমান সবাই ডাল ভাত খায় এ যেমন সত্য তেমনি সত্য কেউ কারো সঙ্গে ডালভাত খায় না, এক পাড়ায় থাকতেও ভয় পায়। আর বিয়েসাদী তো দূরের কথা। মিল যদিও অজস্র তবু অমিলটাকে বড়ো করে দেখার ফলে দেশ দু'ভাগ নেশন দু'ভাগ হয়ে গেছে। পুনর্মিলন এখন একটা স্বপ্ন।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য অখণ্ড মানবসংস্কৃতিতে বিশ্বাসবান। কিন্তু ধর্মমূলক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন না। ধর্ম মেলায় না, পর করে দেয়, তা তো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছেন। ধর্মের উপরে নয়, ভাষার উপরেই তাঁর আস্থা। ভাষাই গোটা দেশকে জোড়া দিতে পারে। ভাষাগত সংস্কৃতিই বাঙালী

হিন্দু মুসলমানকে একনীড় করতে পারে, বর্তমান ব্যবধান মুছে ফেলতে পারে। এ রকম আশাবাদের কাছে মাথা আপনি নত হয়ে আসে। সংশয় তবু যায় না। ভাষা তো চিরকালই এক ছিল, তবে কেন সাতশ' বছরের যৌথনীড় একরাত্রে ধ্বসে পড়ল ?

ধ্বসে পড়ার অন্যান্য কারণ থাকলেও প্রধান কারণ তো এই যে ভারত নামক সত্যের প্রতি অধিকাংশ মুসলমানের আনুগত্য ছিল না। ভারত নাকি হিন্দুদের দেশ। তাই মুসলমানদের জন্যে আরো একটি দেশ চাই। যে দেশ ভারত নয়। ভারতের থেকে পৃথক। সেই জন্যে সৃষ্টি করতে হলো পাকিস্তান। আদমের শরীর থেকে হাড় নিয়ে যেমন হবা অর্থাৎ ইভ তেমনি ভারতের শরীর থেকে রক্ত মাংস নিয়ে পাকিস্তান। ভারত ও পাকিস্তান কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। তবে স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখবে। আবার জুড়ে যাওয়া নিকট ভবিষ্যতে সম্ভবপর নয়। সংস্কৃতি এক হলেও স্বাতন্ত্র্যবোধ সহজে যায় না। সেদিন পড়ছিলুম কে যেন অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে অস্ট্রিয়ানরাও জার্মান। তা পড়ে বহুলোক প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, অস্ট্রিয়ানদের ভাষা জার্মান হলে কী হবে তারা জাতে জার্মান নয়, ঐতিহ্যে জার্মান নয়, তারা পাঁচমিশালী। তারা চায় না অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্রে আত্মবিলোপ করতে। এক দেহে লীন হওয়া তাদের কাম্য নয়।

এবারকার একুশে ফেব্রুয়ারি

এবারকার একুশে ফেব্রুয়ারি এক হাতে সুখ ও আরেক হাতে দুঃখ নিয়ে আমাদের ঘরে এসেছে। প্রায় দশ লক্ষ বাঙালী একরাত্রেই নিশ্চিহ্ন হয়ে প্রলয়ঙ্কর ঘটনার ইতিহাসে রেকর্ড রেখে গেছে। তেমনি পার্লামেণ্টারি নির্বাচন জয়ের ইতিহাসে রেকর্ড রেখেছে আরো একদল বাঙালী। আমরা একচোখে কাঁদছি, একচোখে হাসছি। যত হাসি তত কান্না। যত কান্না তত হাসি।

ঘটনাগুলো পূর্ব বাংলায় ঘটেছে বলে সেইখানেই নিবদ্ধ নয়। ঘটেছে সমগ্র বাংলাদেশে। রাজনীতির বিচারে সমগ্র বাংলাদেশ বলে কিছু নেই। কিন্তু সেই বিচারই তো একমাত্র বিচার নয়। প্রকৃতির বিচারে সমগ্র বাংলাদেশ বলে একটা সত্তা চিবকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। তার সংস্কৃতিও অভিন্ন।

ইতিহাস আমাদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। এ বিভাগ আমরা মেনে নিয়েছি। এতেই দু'পক্ষের শান্তি। ইতিহাসকে উল্টে দেবার চেষ্টা না করে তার নিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি যতদিন না অন্তর্হিত হচ্ছে ততদিন রাজনৈতিক একীকরণ সুদূর পরাহত। প্রত্যেকটি পূজাপার্বণে আমরা যেভাবে মাতামাতি করি তা দেখে কে বিশ্বাস করবে যে আমরা রাজনৈতিক একীকরণের যোগ্য ?

আপাতত চিন্তা করা যাক কী করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ও পূর্ব-পশ্চিম বাংলার মধ্যে সেতুবন্ধন হবে। কেবলমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা সে জিনিস হবার নয়। যাতায়াতের পথ সুগম হওয়া চাই, মেলামেশার উপলক্ষ প্রশস্ত হওয়া চাই। সাংস্কৃতিক বিনিময় যত বেশী হয় তত মঙ্গল। প্রত্যেকটি স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

লাইব্রেরীতে উভয় প্রান্তের বইপত্র রাখা দরকার। পরস্পরের নাড়ীর খবর জানা দরকার। আমরা দুই হয়েও এক। এক হয়েও দুই। এই ভাবে দীর্ঘকাল কাটবে। এর জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করতে হবে।

এর নজীর আছে জার্মানীর ইতিহাসে। এদেশে সৃষ্টিছাড়া কিছু ঘটেনি। মন থেকে হিংসার ভাব মুছে ফেললে বাঙালীরা জার্মান ও অস্ট্রিয়ানদের মতো দুই হয়েও এক হবে। আপদে বিপদে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবে। নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার বিপর্যয়ে এপার থেকে আমরা হাত বাড়িয়ে দিতে পারলুম না, এ দুঃখ আমাদের যাবে না। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না আশা করি।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সেটা হবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানমাত্রেরই বাসভূমি। কেবল স্থানীয় মুসলমানদের একার বাসভূমি নয়। তাই যদি হতো তবে অন্যান্য প্রদেশেব মুসলমানরাও পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিত না।

পূর্ববঙ্গ যেহেতু বাঙালী অবাঙালী উভয়প্রকার মুসলমানের বাসভূমি সেইজন্যে তার নতুন নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। আর উর্দু যেহেতু সব রকম মুসলমানের বোধগম্য ভাষা সেহেতু তাকেই করতে চাওয়া হয় তামাম পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, মায় পূর্ব পাকিস্তানের।

ঠিক এমন সময় বাঙালী মুসলমানের চোখ ফোটে। সে বুঝতে পারে যে সে নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে চলেছে। সে আর বাঙালী মুসলমান নয়, সে পাকিস্তানী মুসলমান, অন্যান্য পাকিস্তানী মুসলমানদের মতো তারও মুখের ভাষা এখন থেকে হবে উর্দু। তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মাতৃভূমি তো পাকিস্তান হয়েছেই, মাতৃভাষাও কি মুছে যাবে? বাংলাদেশ তো অতীতের বস্তু হয়েছেই, বাংলাভাষাও কি অতীতের বস্তু হবে? না, কদাপি না। এই যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা এই প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে ঢাকায় তরুণরা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদ হয়।

সেইদিনটি বাংলাভাষার জয়- সূচনা করে। কিন্তু বাংলাদেশের নয়। তার জন্যে আবশ্যক ছিল আরো একটি দিনের। এই বছরের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। এবারেও রক্ত দিতে হয়েছে। বহুগুণ বেশী রক্ত।

পূর্ব পাকিস্তান যাদের স্বার্থে হয়েছিল তাদের স্বার্থে এখন গৌণ

হয়ে গেছে। নানা প্রদেশের মুসলমানের স্বার্থের চেয়ে বড়ো বাঙালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টানের স্বার্থ। সকলেই এরা বাংলাভাষী। সেইজন্যে অবাংলাভাষীদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো বাংলাভাষীদের স্বার্থ।

এই যে পটপরিবর্তন এটা অবাংলাভাষীরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। জানা উচিত ছিল যে বাধা তারা না দিয়ে ছাড়বে না। সেই অনুসারে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল। অনেকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় বাঙালীরা পড়েছে কামান থেকে গোলাবর্ষণের ও আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের মুখে। জাহাজ থেকেও শেল বর্ষণ করা হচ্ছে। এসব অস্ত্র বাঙালীর তূণে নেই। এসব অস্ত্র আর কেউ তাদের জোগাতেও পারছে না। তা সত্ত্বেও বাঙালীরা আত্মসমর্পণ করেনি। করবেও না। যেমন করে হোক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ও যাবে। এ লড়াই মাতৃভূমির জন্যে লড়াই।

ইংরেজদের হাতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ছিল। আমাদের হাতে ছিল না। তা বলে কি আমরা লড়িনি? কবে কার কাছে অস্ত্র পাব তার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছি? আমরা যে ভাবে লড়েছি ও স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেইভাবে লড়বার শক্তি কি বাংলাদেশের সাত কোটি লোকের নেই? আছে নিশ্চয়। তারাও সেকথা জানে। তাই শেখ সাহেব অহিংস অসহযোগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন আইন অমান্যের। শেষে সাধারণ ধর্মঘটের। এগুলিও অস্ত্র। এগুলির জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

কিন্তু এগুলির জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই। ডিসিপ্লিন মানা চাই। বাংলাদেশের জনগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ডিসিপ্লিন মেনে প্রতিরোধ চালায় তবে মারণাস্ত্রের অভাবে মুষড়ে পড়বে না। প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়াটাই আসল কথা। সশস্ত্র প্রতিরোধ না হয়ে নিরস্ত্র প্রতিরোধ হলেও তা প্রতিরোধ। এই সেদিনও যাঁরা অহিংস

অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাস করেছেন আজ সে নীতি তাঁরা বিসর্জন দিচ্ছেন কেন ?

দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে নিরস্ত্র সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধ বলতে বোঝায় অল্পসংখ্যকের যোগদান। যেদেশে সাতকোটি লোক যোগদানে সমর্থ ও ইচ্ছুক সেখানে অহিংস অসহযোগ নীতি বিসর্জন দিলে তাদের সবাইকে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় না। লাঠি সড়কি নিয়ে তারা হয়তো কিছুদূর এগিয়ে যাবে, কিন্তু গোলাগুলীর মুখে তিতু মীরের মতো অসহায় বোধ করবে।

সশস্ত্র যুদ্ধ যারা করতে চায় করুক, কিন্তু অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য খাজনা বন্ধ ইত্যাদির যে বিকল্প ধারাটি গান্ধীজীর দ্বারা পরিকল্পিত ও শেখ সাহেবের দ্বারা পরিচালিত সেটি যেন পরিত্যক্ত না হয়। এ যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল চলে ও সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে যায় তা হলে বিকল্প একটা উপায় থাকবে, যা দিয়ে আরো অনেকদিন প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারা যাবে।

আমার বিশ্বাস এ যুদ্ধ মাস ছয়েক চলবে, তার পরে উভয় পক্ষই শ্রান্ত হয়ে সন্ধির কথাবার্তা চালাবে। তখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে, অস্থায়ী সরকারও গঠন করা যাবে। কিন্তু এ বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস হয়ে থাকে তবে তার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। সেইজন্যে আমি বলব গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য ইত্যাদির জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তালিম করতে। আপাতত ওদের ম্যান পাওয়ার কোনো কাজে লাগছে না। ওরা ভিড় করছে ও গোলাগুলীর লক্ষ্য হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মরছে। এভাবে মূল্যবান প্রাণের অপচয় করে যশ যেটুকু হবে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী হবে গান্ধী প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করলে।

আমরা কেউ নীরব সাক্ষী নই। তা বলে আমরা কেউ ধনুর্ধরও নই। ওপার বাংলার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত কোটি। তার থেকে আধ কোটি বাদ যাবে, ওরা অবাঙালী। সাত কোটি মানুষের

একটি দেশ যা চায় তা ম্যান পাওয়ার নয়। তা সেই সাত কোটি মানুষের হাতে দেবার মতো অস্ত্র। তা ছাড়া ওষুধপত্র ইত্যাদি বিবিধ উপকরণ। দুঃখের বিষয় অস্ত্র ওদের জোগাতে পারা যাচ্ছে না, যাবেও না। তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি যেন কেউ না দেন। দিলে রক্ষা করতে পারবেন না। অমন করে প্রতারণা করলে ওরা কোনোদিন ক্ষমা করবে না। তার চেয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে যে অস্ত্র জোগানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা অক্ষম।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমাদের সরকারের নীতি নয়। সে নীতি যতদিন না বদলায় ততদিন তাকে মান্য করতে হবে। সব দিক বিবেচনা না করে নীতি বদলানো চলে না। নীতির ভার নেতাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা কে কী করতে পারি তাই ভেবে দেখি। কেউ যদি লড়াইতে যোগ দিতে চান নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওপারে গিয়ে লড়তে পারেন, কিন্তু মৃত্যু হলে ভারত তার দায়িত্ব নেবে না। এটাও পরিষ্কার হয়ে যাওয়া চাই।

এই যুদ্ধ

হিন্দু মুসলিম সমস্যার যখন আর কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না তখন আমরা দেশ ভাগাভাগি করে নিই। সেটাই যে আদর্শ সমাধান তা নয়। তবে সেটা বাস্তব সমাধান। অন্যান্য দেশেও তার অনুরূপ দেখা গেছে।

এখন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে আবার তেমনি এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সমস্যার আর কোনো সমাধান সম্ভবপর নয় মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ষোল আনা লোক দাবী করেছেন ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নতুন একটি সংবিধান। এ-দাবী মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক না হয়ে অত্যল্প হয়। অপরপক্ষে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা অত্যল্প না হয়ে অত্যধিক হয়। কোনো কেন্দ্রীয় সরকার এরকম একটা প্রস্তাব বিনা যুদ্ধে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকও এ প্রস্তাবের বিরোধী। তারাও বিনা যুদ্ধে মেনে নেবে না।

ছয় দফা কর্মসূচীকে আপসে মানিয়ে নিতে পারা যাবে না, এটা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের কতক নেতা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবেন ও সমবেত সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে ছয় দফা পাশ হয়ে যাবে। এতদিন বাদে অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকের মতো অতর্কিত আঘাত হেনেছে পশ্চিমা ফৌজ। কাউকে সাবধান হবার জন্যে এক-আধঘণ্টা সময়ও দেয়নি। বিশুদ্ধ হিটলারী কায়দায় হাজার হাজার নরনারী ও শিশুকে কোতল করা হয়েছে। সমগ্র সভ্যজগৎ স্তম্ভিত। পাছে

কেউ রিপোর্ট করে তা ভেবে বিদেশী রিপোর্টারদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই অতর্কিত আঘাতের উত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তাঁদের প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এখন থেকে সেটি একটি প্রদেশ নয়, একটি দেশ। আর সেই দেশের নাম বাংলাদেশ। তার নিজস্ব পতাকা পাকিস্তানী পতাকার স্থান নিয়েছে। বিনা যুদ্ধে কোথাও কি একটি প্রদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে, নিজের পতাকা ওড়াতে পেরেছে, নিজের সংবিধান রচনা করার অধিকার অর্জন করেছে? হতে পারত, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সময় মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিত। কেউ কেউ সে পরামর্শ দিয়েওছিলেন। কিন্তু না বাঙালী হিন্দু না বাঙালী মুসলমান কোনো পক্ষই সে পরামর্শ গ্রাহ্য করেনি। লগ্ন একবার পেরিয়ে গেলে আর ফেরে না। সেদিন যেটা বিনাযুদ্ধে সম্ভব ছিল আজ সেটার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

একদিক থেকে এটা দুই পাকিস্তানের যুদ্ধ। আরেক দিক থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীস্থানের যুদ্ধ। যেখানে এটা দুই পাকিস্তানের যুদ্ধ সেখানে আমাদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু যেখানে এটা পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীস্থানের যুদ্ধ সেখানে আমরাও বাঙালী হিসাবে বাঙালীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। আমরাও চাই বাঙালী বেঁচে থাকে, অকারণে মার খেয়ে না মরে। আমরাও চাই বাঙালী তার স্বাধিকার বুঝে নেয়, তার ঔপনিবেশিক মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে, স্বাধীন জাতির মর্যাদায় ভূষিত হয়।

পাকিস্তান বাঙালীকে কী দিতে পারে, কী দিতে পারে না, সেটা এই তেইশ বছরে প্রত্যেকটি বাঙালী হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে সমুদ্রপথে তিন হাজার মাইল দূরে বসে অন্য একটি ভাষাগোষ্ঠী। যেমন করত সাত হাজার মাইল দূরে বসে অন্য একটি বর্ণগোষ্ঠী। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব

পাকিস্তানের এক নেশন হওয়া দুরাশা। ওভাবে একটা সাম্রাজ্য হতে পারে, একটা নেশন হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে একটা সাম্রাজ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। তার মেরুদণ্ড হচ্ছে পশ্চিমা সৈন্যদল। সৈন্যদলে পাঞ্জাবী ও পাঠান একাধিপত্য যখন-তখন ডিকটেটরশিপ ডেকে আনবেই। সুতরাং নতুন সংবিধান এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে কোনোদিন আবার ওরা ডিকটেটর না হতে পারে। ছয় দফা মেনে নিলে সেটা নিবারিত হতো। তা যখন মেনে নেওয়া হলো না তখন স্বতন্ত্র বাঙালীস্থান দাবী না করে উপায় রইল না। এখন এই দাবীকে জোরদার করতে হবে লড়াই দিয়ে রক্ত দিয়ে।

যে সংগ্রাম উভয়পক্ষেই জীবনমরণ সংগ্রাম সে সংগ্রাম কখনো সাতদিনের মধ্যেই একপক্ষকে জয় ও অপরপক্ষকে পরাজয় এনে দেয় না। এমন কি সাত মাসের মধ্যেও নয়। এ ধরনের যুদ্ধ চলে বছরের পর বছর। কখনো জোর কদমে, কখনো ঢিমে তেতালায়। দীর্ঘকাল অচল অবস্থাও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে-পক্ষের খোরাকে টান পড়ে সে পক্ষ যুদ্ধে না মরলেও দুর্ভিক্ষে মরে ও সেই ভয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। খোরাকে টান না পড়লে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানরা আরো অনেকদিন লড়তে পারত, সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে জব্দ হতো না।

বর্তমান সংগ্রামে কেবল যে পশ্চিমা সৈন্যদের খোরাকে টান পড়তে পারে তাই নয়, বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারাও দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে পারে। কোন্ পক্ষ যে কোন্ পক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবে তা এখন থেকে জোর করে বলা যায় না। উৎসাহের বাষ্পই যুদ্ধের শকট চালনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 'যুদ্ধের বারো আনাই তেল নুন লকড়ির ব্যাপার। নেপোলিয়ন বলে গেছেন সৈন্যদল যাত্রা করে পেটের উপর ভর দিয়ে। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মরাঠারা জলতেষ্টায় মারা যায়। পানীয় জল আগে থেকে মজুত রাখা হয়নি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রত্যেকটি আইটেম রীতিমতো প্ল্যানে করতে

হবে। এর জন্যে অঢেল অর্থেরও প্রয়োজন। টাকা থাকলে রসদ কেনা যায়। না থাকলে ভিক্ষা করতে হয়, লুট করতে হয়। জবরদস্তি টাকা আদায় করতে গেলে মিত্ররাও শত্রু হয়ে যায়। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কী পরিমাণ ব্যয়সাপেক্ষ সে অভিজ্ঞতা আমার হয় মুর্শিদাবাদ চর অভিযান পরিচালনার ভার নিয়ে। শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিযোদ্ধাদেরও হবে।

না, সংগ্রাম একটা তামাশা নয়। যা দেখবার জন্যে হাজার হাজার লোক বিনাটিকিটে সীমান্তে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হবে বলে ধরে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তাঁদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সরকারীভাবে নয়। সরকার থেকে যদি সাহায্য করা হয় সরকারও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতকে কেবল যে পাকিস্তানের সঙ্গেই যুঝতে হবে তা নয়, চীনের সঙ্গেও। অথচ ভারতের মিত্র বলতে কেউ থাকবে না। আমরা তো আশঙ্কা করি যে বিশ্বের জনমত ভারতের বিরুদ্ধেই যাবে। যেমন কাশ্মীরের বেলা গেছে। কাশ্মীরের দরুন ভারত যে ইউরোপে আমেরিকায় কতদূর অপ্রিয় যাঁরাই বিদেশে গেছেন তাঁরাই জানেন। অপ্রিয়তা আর বাড়াতে যাওয়া ভুল।

সাহায্য মানেই বেসরকারী সাহায্য। তার মানে প্রধানত খাদ্য আর অর্থ। অস্ত্র বললুম না, কারণ অস্ত্র পড়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষের হাতে। অথবা চীনপন্থীদের হাতে। তাতে যুদ্ধজয়ের সুবিধা হবে না। তা ছাড়া অস্ত্র সাহায্য পাকিস্তান ক্ষমা করবে না।

আমরা যারা আর কিছু জোগাতে পারছিনে তারা মনের জোর জোগাব। সেটাও একান্ত আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ইংরেজদের, "স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন বহু-সংখ্যক ব্যাটালিয়নের সমমূল্য।" বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও হৃদয়ঙ্গম করবেন যে স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন বহুসংখ্যক ব্যাটালিয়নের মতো মূল্যবান।

ইচ্ছা করলে অহিংসভাবেও লড়তে পারা যায়। অহিংস সংগ্রাম আরো দীর্ঘকাল চালানো যায়। যতই দিন যাবে ততই পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত চঞ্চল হবে। ওরাও তো সামরিক শাসনের কবল থেকে মুক্তি চায়। ওরাও তো চায় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। কিছুদিন পরে দেখা যাবে ওরাই দাবী করছে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন ও সংবিধান সংরচন। ওরাই চাইছে অন্তবর্তীকালের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন। অন্ততপক্ষে প্রাদেশিক সরকার গঠন। অথচ এদের প্রত্যেকটির চাবী শেখ মুজিবর রহমানের পকেটে। সেখান থেকে বার করে নেবার সাধ্য ইয়াহিয়া খান কিংবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেই। বাধ্য হয়ে একদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে আবার কথাবার্তা শুরু করতে হবেই।

সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে শেখ মুজিব কথা কইবেন না। আর সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক অস্তিত্বই থাকবে না। অবশেষে এমন একটি দিন আসবে যেদিন ইয়াহিয়া খানকে অসুস্থতার অজুহাতে হয়তো গদী ছাড়তে হবে। তখন কেউ একজন উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তানের জন্যে একটা প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট গড়বেন ও শেখ মুজিবের কথামতো সামরিক আইন রদ করবেন। যদি না সেটা ইয়াহিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি উঠে যায়। প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট বাংলাদেশের কেউ যদি যোগ না দেন তবে তার সঙ্গে আরো একটা প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্ট যোগ করতে হবে। তেমনি জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের কেউ যদি যোগ না দেন তা হলে তার একভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে বসবে, আরেকভাগ পূর্ব পাকিস্তানে। সেইখানেই নতুন করে নাম গ্রহণ করা হবে বাংলাদেশ।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি জাতীয় পরিষদ দু'ভাগ হয়ে দুই স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করবেই। তেমনি প্রোভিজনাল গবর্নমেণ্টও

দু'ভাগ হয়ে দুই পাকিস্তান শাসন করবে। পূবেরটা নতুন নাম ধারণ করবে বাংলাদেশ।

তারপর দুই ভাগের মধ্যে সমান স্বাধীনভাবে কথাবার্তা চলবে। যাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রানীতি নিয়ে উভয়পক্ষে একটা সমঝোতা হয়। পররাষ্ট্রনীতি যদি এক হয় তবে পাকিস্তান একটা কনফেডারেশন হতে পারবে। যদি পরস্পরবিরোধী হয় তবে সে আশা দুরাশা। শেখ মুজিব যখন ভারতের সঙ্গে ঝগড়া করবেনই না তখন ভুট্টোকে ঝগড়া চালিয়ে যাবার জন্যে পৃথক রাষ্ট্র দিতে হবে। এই ইস্যুতেই পাকিস্তান ভেঙে দুই রাষ্ট্র হবে। সেটা এড়াতে হলে ভুট্টোকেও ভারতের সঙ্গে ঝগড়া ছাড়তে হবে।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই তত্ত্বের উপরে যে সব মুসলমান মিলে এক নেশন। সেই সুবাদে বহু পশ্চিমা মুসলমান পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঘরবাড়ী করেছে, সেটাই এখন তাদের হোমল্যাণ্ড। ধর্মভিত্তিক হোমল্যাণ্ড। কিন্তু ইতিমধ্যে কালের চাকা ঘুরে গেছে। পূর্ববঙ্গের পরিবর্তিত মনোভাব হচ্ছে সব বাঙালী মিলে এক নেশন। সেই তত্ত্বের উপর বাংলাদেশ বলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। পূর্ববঙ্গ এখন তার পশ্চিমা মুসলমানের ধর্মভিত্তিক হোমল্যাণ্ড নয়, বাঙালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টানের ভাষাভিত্তিক হোমল্যাণ্ড। এই যে ভাষাভিত্তিক হোমল্যাণ্ড এখানে পশ্চিমা মুসলমাদদের স্থিতি হবে কী করে? তারা কি তা হলে বাঙালী বনে যাবে?

শেখ মুজিবর রহমান বলছেন, বসবাসকারী পশ্চিমারাও বাঙালী। তা শুনে তারা একটুও খুশি নয়। তারা একদিন আর সবাইকে উর্দুভাষী করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আজ তারাই কিনা বাংলাভাষী হবে! তাদের পক্ষে এটা একপ্রকার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। তারা যদি জানত যে পূর্ববঙ্গ হবে বাঙালীদের বাসভূমি তা হলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে

জ্ঞান মান কবুল করত না, যে যেখানে ছিল সেইখানে থেকে যেত, হিন্দুদের সঙ্গে বনিয়ে নিত। এখন যে তাদের একূল ওকুল দুকূল যেতে বসেছে। হায়, হায়, তারা কি এখন ইহুদীদের মতো ঘুরে বেড়াবে!

সুতরাং এইসব গৃহহারাদের গৃহ না দিলে পাকিস্তান বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না। তাকে জন্মের সময় গলা টিপে মারবে। অপরপক্ষে পাকিস্তানের অস্তিত্বও বিপন্ন। পাকিস্তান যদি একটি কনফেডারেশন না হয়, তার পররাষ্ট্রনীতি যদি শেখ মুজিবর রহমানের ইচ্ছামতো চালিত না হয়ে ভুট্টো সাহেবের ইঙ্গিতে চালিত হয়, গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসনই যদি হয় তার ললাটলিখন তা হলে পাকিস্তান ভেঙে দু'চির হবেই।

পাকিস্তান যদি দ্বিখণ্ডিত হয় তা হলে পূর্ববঙ্গও দ্বিখণ্ডিত হবে। একটা অপরটার অপরিহার্য শর্ত। যেমন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে পাঞ্জাব বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়। এই লজিক কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। পশ্চিমা মুসলমানকেও পূর্ববঙ্গের একটি ভগ্নাংশ ছেড়ে দিতে হবে। সমস্তটাই বাঙালীরা পাবে না। বাঙালীরা যেমন নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে নারাজ পশ্চিমারাও তেমনি নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে নারাজ। বাঙালীরা নিজ ভাষাভিত্তিক বাসভূমে, পশ্চিমারা নিজ ধর্মভত্তিক বাসভূমে। একটি অদৃশ্য করাত পূর্ববঙ্গের অদৃষ্টকে চিরে দু'ভাগ করছে। এই যুদ্ধ সেই করাতের নির্দেশে চলেছে। বন্দর ও ক্যান্টনমেণ্টগুলি পশ্চিমাদের দখলে থেকে যাবে বলে আশঙ্কা হয়। আর সব বাঙালীরা জয় করে নেবে।

না, আমার বিশ্বাস হয় না 'যে ভুট্টো তাঁর ভারতবিদ্বেষ ত্যাগ করবেন বা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির উপর মুজিবর রহমানের কণ্ঠক্ষেপ সহ্য করবেন। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত দুই ভাগই হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলাও দুই ভাগ হবে। যেসব ক্যান্টনমেণ্ট ও বন্দর পাকিস্তানী আর্মি নেভি ও এয়ার ফোর্স সহজে

দখল করে রাখতে পারবে সেসব অঞ্চল তারা বাঙালী মুসলমানের ভাগ থেকে কেটে রাখবে। সেসব হবে অবাঙালী মুসলমানের পাওনা এক পাউণ্ড মাংস। সেখানে উড়বে পাকিস্তানী নিশান। সেখানকার মতবাদ হবে পাকিস্তানী মতবাদ। সেখানকার শাসন হবে ইসলামাবাদের কলোনিয়াল শাসন। সেখানকার রাজনীতি হবে ইসলামিক রাষ্ট্রনীতির সামিল। সেখানে অমুসলমান যদি থাকে তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে থাকবে। সেখানে বাঙালী মুসলমান যদি থাকে সেও হবে সন্দেহভাজন নাগরিক।

আর সব অঞ্চল বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেখানকার রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান সকলেই সেখানে বাঙালী ও সকলেই সেখানে প্রথম শ্রেণীভুক্ত। সেখানে উড়বে বাংলাদেশের নিশান। ইসলামাবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক, কায়রোর সঙ্গে সম্পর্ক। কেউ কারো আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারো পররাষ্ট্রনীতির কণ্ঠরোধ করবে না। ভুট্টো যদি ইচ্ছা করেন ভারতের সঙ্গে লড়তে পারেন। মুজিব যদি ইচ্ছা করেন ভারতের সঙ্গে বন্ধুতা করতে পারেন।

ধর্মভিত্তিকের সঙ্গে ভাষাভিত্তিকের একভাবে না একভাবে সন্ধি ঘটাতে হবেই। এইভাবে সন্ধি হলে যদি আপত্তি থাকে তো অপর একটি বিকল্প হচ্ছে পশ্চিমা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সনাতন গ্যারান্টি। ওরা থাকবে রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হয়ে। ওদের আইনকানুন শিক্ষাদীক্ষা ভাষা নিশান স্বতন্ত্র। ওরা হয়তো দাবী করবে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি। এরকম একটা দুষ্পাচ্য মাইনরিটিকে হজম করতে গিয়ে রাষ্ট্র নাজেহাল হবে। কোনো রাষ্ট্রই একদল নাগরিকের একস্ট্রা-টেরিটোরিয়াল রাইটস পছন্দ করে না। এ নিয়ে বিভিন্ন দেশে অনর্থ ঘটেছে, বাংলাদেশেও ঘটতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পূর্ববঙ্গ চান তাঁদের এ সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

যাঁরা মোকাবিলা করতে গিয়ে নাজেহাল হবেন তাঁরা বলবেন এর চেয়ে কয়েকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

কোনো ভাবেই যদি সমাধান না হয় তবে এ যুদ্ধ বছরের পর বছর চলবে। পরে একদিন দেখা যাবে বামপন্থীরা যুদ্ধে নেমে তাকে একটা বৈপ্লবিক মোড় দিয়েছে। তখন আর ধর্মভিত্তিক বনাম ভাষাভিত্তিক থাকবে না। শ্রেণীভিত্তিক বা মতবাদভিত্তিক এসে রাশ কেড়ে নেবে। বেশ কিছু জায়গা লাল হয়ে যাবে।

শেষে ভারতও না জড়িয়ে পড়ে। ভারত জড়িয়ে পড়লে অন্যান্য দেশও। যেমন করে হোক এ সংগ্রামকে স্থানকালে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

বন্দে ভ্রাতরম্

শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের বাঙালী হিন্দু মুসলমান যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তা ইতিহাসে অপূর্ব। কেবল বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতের ইতিহাসে। হয়তো মানুষের ইতিহাসে। তাঁদের হার হবে কি জিৎ হবে তা বিধাতাই জানেন। কিন্তু যেটাই হোক ইতিহাসে তাঁরা অমর।

কয়েকজন জ্ঞানবীরকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। জ্ঞানবীর যাঁরা তাঁরাই বা এ সংঘর্ষ এড়াবেন কী করে? শোকে বিহ্বল হতে পারছিনে। কারণ আমি তো জানি এঁরা কী ধাতুতে তৈরি ছিলেন। কুকুর বেড়ালের মতো বেঁচে থাকতেন না, সেলাম করতেন না, পালাতেন না এঁরা। অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এঁরা। প্রত্যেকেই আমি আজ বন্দনা করি। বন্দে ভ্রাতরম্। বন্দে ভ্রাতরম্।

বছর দুই আগে ঢাকার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক কলকাতা আসেন। দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়ে যান। তখনি তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমরা আপাতত অটোনমি দাবী করছি। কিন্তু আমাদের মনের কথা কী জানেন?"

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রই। অধ্যাপক বলেন, "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স।"

আমি তো চমকে উঠি। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স! বিশ্বাস হয় না। সতর্ক করে দিই তাঁকে।

এর পর অধ্যাপক এমন একটি কথা বলেন যা আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। বলেন, "আমাদের প্রধান অন্তরায় কী, জানেন?"

"কী!" আমি চিন্তা করি।

"ইসলাম।" অধ্যাপক গভীর প্রতীতির সঙ্গে উচ্চারণ করেন।

পাকিস্তান তার ইসলামী সম্মোহন অতিক্রম করবে, এ কি আমি সহজে বিশ্বাস করতে পারি? হয়তো ওই একজন বা দু'জন করেছেন।

এখন বোঝা যাচ্ছে ইসলামের পাণ্ডারা কেন সেকুলার ও লিবারল মতবাদের প্রতিনিধিদের প্রথম রাত্রেই মেরেছে। "সাদীর প্রথম রাতে মারিবে বেড়াল।"

কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এঁরাই দলে ভারী। আস্ত একটা প্রদেশের ছয় কোটি বাঙালী মুসলমান এখন ইসলামের সম্মোহন কাটিয়ে উঠেছে। এরা চায় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। তার মধ্যে পড়ে কালচারাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। যে দামটা এরা দিচ্ছে তা ইতিহাসে অপূর্ব। সেইজন্যে একে আমি গণহত্যা বলে কালো ব্যাজ পরব না। এটাও একপ্রকার সত্যাগ্রহ।

পাকিস্তান নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তার সংহতি বজায় রাখার জন্যে আপ্রাণ লড়াই করবে। তার জন্যে যতদূর বর্বর হতে হয় ততদূর বর্বর হবে। রাক্ষস হবে। দানব হবে। তেমনি বাংলাদেশ নামক একটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করবে। তার জন্যে যতদূর সম্ভব আত্মত্যাগ করবে। লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দেবে।

পাকিস্তানী নিশানের সঙ্গে বাংলাদেশের নিশানের যুদ্ধ। পাকিস্তানী মতবাদের সঙ্গে বাঙালী জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ। পাকিস্তানী ফৌজের সঙ্গে বাংলাদেশের জনতার যুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানী মূল ঘাঁটির সঙ্গে বাংলাদেশ নামক উপনিবেশের যুদ্ধ। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর সঙ্গে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যুদ্ধ। পাকিস্তানের ধনিকস্বার্থের সঙ্গে বাংলাদেশের অবিকশিত অর্থনীতির যুদ্ধ। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের পথঘাট

বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার বিরুদ্ধে পথঘাট খুলে দিয়ে লাভবান হবার যুদ্ধ। ভরতের সঙ্গে অনন্তকাল সংঘর্ষ চালিয়ে বাংলাদেশের উপর তার বিপুল ব্যয়ভার চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে সেই ব্যয়ভার থেকে উদ্ধার পাবার যুদ্ধ।

যেদিক থেকেই দেখি না কেন এ যুদ্ধ একটা এপিক যুদ্ধ। এত-গুলো ইস্যুতে এ লড়াই হচ্ছে যে একে একটা অতি জটিল স্বত্বের মামলার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এরকম মামলা আদালতে গেলে বছরের পর বছর গড়ায়, তবু তার মীমাংসা হয় না। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে এ মামলা পনের দিনের মধ্যেই মিটবে, অথবা পনের মাসের মধ্যে, তা হলে তিনি পরম আশাবাদী। আমি পরম আশাবাদীও নই, চরম নিরাশাবাদীও নই। আমি এ যুদ্ধের এমন ভাবে নিষ্পত্তি চাই যাতে আর কোনোদিন কেউ যুদ্ধের আশ্রয় নিতে না চায়।

সবচেয়ে ভালো কোনো এক তৃতীয় পক্ষের সালিশী। কিন্তু গোড়ায় গলদ দ্বিতীয়পক্ষ বলে একটি স্বীকৃত পক্ষ থাকলে তো তৃতীয় পক্ষ সালিশ হবে। পাকিস্তান বাংলাদেশ বলে একটি দ্বিতীয়পক্ষকে স্বীকারই করে না। আর কেউ স্বীকার করুক এটাও চায় না। পাকিস্তানের মতে বাংলাদেশ বলে অপর একটা পক্ষ নেই, আছে কতকগুলি দেশদ্রোহী নাগরিক। তারা তার ঘরের লোক। তাদের সঙ্গে ঘরোয়া ঝগড়ায় বাইরের লোক কেন সালিশী করবে?

একই কারণে পাকিস্তান চায় না যে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে কেউ হস্তক্ষেপ করে। ভারত যদি তা করতে যায় তাহলে ভারত পাকিস্তানে যুদ্ধ বেধে যাবে। তখন ভারসাম্যের খাতিরে চীন এসে পাকিস্তানের পক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। ভারতের পক্ষে কেউ হস্তক্ষেপ করুক এটা ভারতের নীতি নয়। নীতি পরিবর্তন করলে ভারত হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে গোষ্ঠিভুক্ত নেশন। ভারতের বৃহত্তর পররাষ্ট্রনীতি ক্ষুণ্ণ হবে।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে রাজী হবে না। যুদ্ধ এড়াতেই চাইবে। সেইজন্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারবে না। ভারত স্বীকৃতি না দিলে আর কেউ যে স্বীকৃতি দেবে তাও মনে হয় না। কেউ চায় না পরের জন্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে। তা সত্ত্বেও ইতিহাসে অমন দু'চারটে নজির আছে। গেরিলারা যদি ইংরেজের মাল জাহাজ আটক করে রাখে বা ডুবিয়ে দেয় তখন ইংরেজ দায়ী করবে পাকিস্তানকে, পাকিস্তান ক্ষতিপূরণ অস্বীকার করলে বা অক্ষম হলে তখন ইংরেজ বাংলাদেশের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে বাধ্য হবে। সেইভাবে বাংলাদেশ পাবে ইংরেজের স্বীকৃতি। সেইভাবে পেতে পারে ভারতের স্বীকৃতি। তার আগে বাংলাদেশের বা তার লস্করদের এতখানি সাহস সঞ্চার হওয়া চাই যে তারা পাকিস্তানকে অসহায় দর্শকে পরিণত করতে পারে, যেমন গ্রীস করেছিল তুরস্ককে। শক্তিহীনকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করার সময় আসতে দেরি আছে। অসময়ে স্বীকার করলে পরে পশতাতে হবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক অর্থে স্বীকৃতি না দিয়েও তার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা যায়। যেমন জার্মান ডেমক্রাটিক রেপাবলিককে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক অর্থে স্বীকৃতি না দিয়েও তার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা যাচ্ছে। সেদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি ভারতে আছেন। ভারতেরও বাণিজ্য প্রতিনিধি আছেন সেদেশে।

এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল ধরে চলে তা হলে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল চট্টগ্রামের ও চালনার বন্দর দিয়ে আমদানী রপ্তানী করতে পারবে না। পাকিস্তান তাকে ব্লকেড করবে। তখন যদি বাংলা-দেশের সরকার কলকাতার বন্দর দিয়ে আমদানী রপ্তানী করতে চায় তার সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। মানবিকতার

খাতিরে তাকে সমুদ্রপথ দিতে হবে। তা ছাড়া স্থলপথই বা নয় কেন? ভারতকে মাছ বিক্রী করে যদি সেদেশ ভারতের কাছ থেকে কয়লা কিনতে চায় তবে সেটাই বা নিষিদ্ধ হবে কেন? এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রশ্ন তুললে পাকিস্তান দুনিয়ার চোখে নির্দোষ হবে না, ভারতও দোষী হবে না। এই ইস্যুতে পাকিস্তান যদি একহাত লড়তে চায় তো লড়া যাবে।

কিন্তু স্বীকৃতি বলতে এইপর্যন্ত। এর বেশী এক ইঞ্চি এগোনো উচিত হবে না। অস্ত্র সরবরাহ করা মানেই যুদ্ধ ডেকে আনা। সৈনিক পাঠানো মানেও তাই। যদি কেউ স্পেনের গৃহযুদ্ধের মতো পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে যোগ দিতে যেতে চান তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ঝুঁকিতে সে কাজ করতে পারেন। পাকিস্তানীরা যদি তাঁকে গুলী করে মারে ভারত সরকার পাকিস্তানকে দায়ী করতে পারবেন না। যুদ্ধ একটা ছেলেখেলা নয়। পাকিস্তান লড়ছে তার প্রাণের দায়ে। হেরে গেলে তার অর্ধেক রাজ্য বেহাত হবে, অর্ধেক শক্তি কমে যাবে। সে কি বর্বরতার শেষ ধাপটি পর্যন্ত না গিয়ে ছাড়বে?

আমরা ইতিমধ্যেই ওপারের জন্যে ঔষধপত্র পাঠাতে আরম্ভ করেছি। ওপার থেকে আহত হয়ে কেউ এলে তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে শিবির খুলেছি। নিষ্ক্রিয় বসে থাকিনি। মানুষের উপর দয়ামায়া থাকলে তার প্রকাশের উপায় আছে। হৃদয়বানরা নিরুপায় নন। কিন্তু সেইখানেই যেন তাঁরা থামতে জানেন। অন্য রাষ্ট্রের ঘরোয়া ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিবিশেষের কর্তব্য হতে পারে, কিন্তু ভারত নামক রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়। তবে বাংলাদেশ যদি নিজের চেষ্টায় নিজের এলাকার মালিক হয়ে বসতে পাবে তা হলে তাকে মেনে নেওয়া দুনিয়ার বিচারে অন্যায় হবে না। পাকিস্তানের বিচারে অন্যায় হলে তখন দেখা যাবে। মোট কথা বাংলাদেশ যদি যুদ্ধে জেতার জন্যে আমাদের মুখাপেক্ষী হয় আমরা নাচার। যদি বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের সাহায্য চায় আমরা প্রতিবেশীর প্রতি

প্রতিবেশীর কর্তব্য করব। ওপারের শরণার্থী এপারে এলে স্বজাতির কর্তব্য তো করবই।

ছ'মাস সবুর করলে দেখা যাবে প্রকৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে। ছ'বছর সবুর করলে দেখা যাবে সময় বাঙালীদের দিকে। অসময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধ থামিয়ে না দিলে কিংবা প্রলোভনে পড়ে খানিকটে ক্ষমতার জন্যে বাকীটা বিকিয়ে না দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকায় কে? বাঙালী জিতবেই। সে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তার প্রধান শত্রু সে নিজে। সে চায় রাতারাতি সাফল্য। রাতারাতি সাফল্য এ যুদ্ধে নেই। যার সঙ্গে যুদ্ধ সে বহুগুণ বলবান।

তবে সেও সর্বশক্তিমান নয়। যে হারে তার শক্তি ক্ষয় হচ্ছে সে হারে হতে থাকলে সে ভারতের তুলনায় এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়বে যে শক্তি সংরক্ষণ করার জন্যে পণ্ডিতের মতো অর্ধেক ত্যাগ করবে। পাকিস্তান বর্বর হলেও নির্বোধ নয়। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে সে প্রচণ্ড এক আঘাত হেনে বাঙালীদের মাজা ভেঙে দেবে। যতই দিন যাবে ততই তার আক্কেল হবে। সে বুঝতে পারবে যে ব্লিৎসক্রিগ সফল হবে না। দীর্ঘকাল লড়তে হবে। তখন প্রলোভনের আশ্রয় নেবে। মুজিবের দলের একাংশকে হাত করার জন্যে চাল দেবে। মুজিবকে ভোলাতে পারবে না, কিন্তু এমন চাল চালবে যে তিনি তাঁর সহকর্মীদের সামলাতে পারবেন না। এইখানেই ভয়। এ যুদ্ধে সেই জিতবে যে ছ'বছর খাড়া থাকতে পারবে।

মাস দুয়েক পরে বর্ষা। বর্ষা ওদের দিকে। বর্ষার পরে দেখা যাবে সময়ও ওদের দিকে। নিপীড়নে ফল হলো না বুঝতে পেরে প্রলোভন দেখানো হবে। যারা নিপীড়নে দমল না তারা প্রলোভনে ভুলতে পারে। সেইখানেই বিপদ। শেখ মুজিবরের দলবল যদি নেতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তা হলে শেখ সাহেব সর্ব প্রলোভন তুচ্ছ করে শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত দখল করবার জন্যে লড়াই

চালিয়ে যাবেন। নয়তো বন্দরগুলো পশ্চিমীদের দখলে রয়ে যাবে। সমুদ্রপথ পশ্চিমীরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।

লড়াইমাত্রেই দমের খেলা। যার দম যত বেশী তার জয়ের সম্ভাবনা তত বেশী। আমার বিশ্বাস শেখ মুজিবর রহমান এমন একজন মানুষ যিনি উভয় অর্থেই অদম্য। তাঁকে দমনও করতে পারা যাবে না, তাঁর দমও ফুরিয়ে যাবে না। এ লড়াই যদি তিনি দু'বছর চালিয়ে যেতে পারেন তা হলে সন্ধি হবে তাঁর শর্তেই। ইয়াহিয়া খান কিংবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর শর্তে নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কমে তিনি রাজী হবেন না, তবে একপ্রকার শিথিল কনফেডারেশনে রাজী হতে পারেন।

এই যুদ্ধের শেষ পরিণতি যেটাই হোক না কেন সেটা বাঙালীর পক্ষে গৌরবজনকই হবে। আমরা জয়ের প্রার্থনাই করব।

স্বাধীন বাংলাদেশ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিতেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের আশঙ্কা জাগে যে তাঁরা চিরকালের মতো হিন্দুস্থানের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হবেন। অতএব তাঁদের জন্যে চাই পৃথক এক মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র।

একদিন সত্যি সত্যি তাঁরা পৃথক একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র পেলেন। কিন্তু সেই রাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে পূর্ব প্রান্তের ব্যবধান স্থলপথে দেড় হাজার মাইল, জলপথে তিন হাজার মাইল। এমন একটি রাষ্ট্রের একটিমাত্র কেন্দ্র থাকতে পারে না, থাকা উচিত এক একটি প্রান্তের জন্যে এক একটি কেন্দ্র। তা যদি হতো তা হলে পাকিস্তান হয়ে দাঁড়াত একটি দ্বিকেন্দ্রিক রাষ্ট্র। দু'তিনটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয়ে অনন্যনির্ভর।

এ রকম যে হলো না তার কারণ পাকিস্তানী নেতারা চেয়েছিলেন ভারতের নেতাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটিমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গড়তে। অথচ ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অচিরেই একটি সংবিধান প্রণয়ন করা কিছুতেই তাঁদের দ্বারা হলো না। তার কারণ ভারতের কোনো একটি প্রদেশই কেন্দ্রে শতকরা পঞ্চাশের উপর ভোটের অধিকারী নয়। অপর পক্ষে পূর্ব বাংলা একাই শতকরা পঞ্চাশের অধিক ভোটের অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যার গুরুত্ব যদি একবার মেনে নেওয়া হয় তো পূর্ব বাংলার লোক চিরকালই পাকিস্তানের উপর প্রভুত্ব করবে। যাঁরা হিন্দুপ্রাধান্যের ভয়ে পাকিস্তান চেয়ে পৃথক হয়ে গেলেন তারা কি বাঙালীপ্রাধান্য বিনা বাধায় স্বীকার করে নেবেন? নিক না বাঙালীরা মেনে উর্দু প্রাধান্য।

তখন থেকেই তাঁদের চেষ্টা হলো কেমন করে পূর্ব বাংলার সংখ্যা-

গুরুকে তার গুরুত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায়। কোনো দেশের সংবিধানে যা নেই সেই প্যারিটি বা সংখ্যাসাম্য চাপিয়ে দেওয়া হলো পূর্ব বাংলার কাঁধে। সেখানকার লোক যদি তখনি প্রতিরোধ করত তা হলে তখনি গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। তারা তা করেনি, কারণ আশা করেছিল যে প্যারিটি কেবল আইনসভার নির্বাচনে বা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে নয়, সিভিল সার্ভিসে আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সে, কেন্দ্রীয় আয়ব্যয়ে, ব্যবসাবাণিজ্যে ও অপরাপর ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাধারণ নীতি হবে। কিন্তু সেটা দুরাশা।

যাই হোক, প্যারিটির ভিত্তিতে যদি বা একটা সংবিধান খাড়া করা হলো অকস্মাৎ প্রধান সেনাপতি আয়ুব ক্ষমতা হস্তগত করে রাজনীতিকমাত্রেরই দফা রফা করলেন। সংবিধান গেল চুলোয়। পরে তিনি একাই একটা সংবিধান জারি করেন। সেখানেও প্যারিটি। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বদলে পরোক্ষ নির্বাচন তাঁকেই জিতিয়ে দিল। ভালোর মধ্যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের বদলে যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত হলো। ফলে হিন্দুরা মুসলমানদের, মুসলমানরা হিন্দুদের ভোট দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে শিখল। আয়ুব খানকে এর জন্যে আমি সাধুবাদ দিই।

আয়ুব খানের আসল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ক্ষমতা মুঠোর মধ্যে রাখা। সকল ক্ষমতার উৎস তিনিই। এর নাম নাকি প্রেসিডেন-শিয়াল সীস্টেম! একদিন লোকে ধরে ফেলল যে জিনিসটা গণতন্ত্রই নয়। তখন আয়ুবকে সরে যেতে হলো। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনিও প্রধান সেনাপতি। তিনি আশ্বাস দিলেন যে লোকে যেমনটি সংবিধান চায় তিনি তেমনিটি পেতে সাহায্য করবেন। তবে সংবিধান প্রণয়নের পর তিনি যদি দেখেন তা পাকিস্তানের সংহতিবিরুদ্ধ বা ইসলামী মূলনীতিবিরুদ্ধ তা হলে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন।

তেইশ বছর বাদে এই প্রথমবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো

প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে। সঙ্গে সঙ্গে যৌথনির্বাচনপদ্ধতিতেও। এক একটি মানুষের এক একটি ভোট প্রবর্তিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার সদস্য সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ অতিক্রম করল। ইচ্ছা করলে পূর্ব বাংলার সদস্যরা বহুদলে বিভক্ত হয়ে দলাদলি করবেন। অনেকেই চলে যাবেন অপোজিশনে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল সারা পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সে ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় সরকার গড়তেও পারে, সচল রাখতেও পারে, অচল করতেও পারে। তার সদস্যরা সাম্প্রদায়িক ভোটে নির্বাচিত হননি, হয়েছেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে। সুতরাং তাঁরা ইসলামের আঁচলে বাঁধা নন। তাঁরা প্রথমে বাঙালী, তার পরে মুসলমান বা অমুসলমান। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পার্টি যদি সংবিধান রচনা করে তা হলে ইয়াহিয়া খানের প্রথম আপত্তি হবে তাতে ইসলামী মূলনীতি সংরক্ষিত হয়নি।

তার পর আওয়ামী লীগ যে ছয় দফা দাবীর ম্যাণ্ডেট নিয়ে নির্বাচনে জেতে তার উপর ভিত্তি করে সংবিধান রচিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে তিনটিমাত্র বিষয়। সর্বপ্রকার ট্যাক্স তোলার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারদের। সৈন্যদের যখন যা দরকার কেন্দ্রীয় সরকার তা তুলতে পারবে না। বহির্বাণিজ্যও প্রাদেশিক সরকারদের হাতে। তা হলে পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের অসঙ্গতি ঘটা বিচিত্র নয়। সব চেয়ে ভয়ের কথা এক এক প্রদেশ এক এক বিদেশী রাষ্ট্রকে শুল্ক ব্যাপারে এক এক রকম সুযোগ সুবিধা দেবে। কেন্দ্রের কন্ট্রোল থাকবে না। অমনি করে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হবে। ইয়াহিয়া খানের এখানেও আপত্তি হবে।

অন্যান্য প্রদেশে ছয় দফা দাবীর সমর্থকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেননি। যাঁরা জিতেছেন তাঁরা শক্তিশালী কেন্দ্র চান। যার হাতে ট্যাক্স ধার্য করার অবাধ ক্ষমতা থাকবে, বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। সংবিধান রচনাকালে এঁরা বিষম বাধা দিতেন। কেবল যে জাতীয় পরিষদের সভায় তা নয়, হাটে বাজারে মাঠে ময়দানে। কেবল যে অহিংসভাবে তা নয়, সর্বতোভাবে। দুই পক্ষের মধ্যে আপোসের সম্ভাবনা ছিল না। এমন কোনো একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না যেটা উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যথাকালে হলেও তার পরিণাম একই হতো। গৃহযুদ্ধ। অধিবেশন একবার ডেকে তারপর অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রেখে ইয়াহিয়া খান সাহেব নিমিত্তের ভাগী হলেন। তিনিই তাঁর কর্মের দ্বারা আওয়ামী লীগ দলপতি শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে ঠেলে দিলেন অহিংস অসহযোগের দিকে। তারপরে ২৫শে মার্চ তারিখে তিনিই প্রথম হিংসাত্মক আক্রমণ করে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের উপর মেশিনগান চালিয়ে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলেন তার জবাব হলো ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। অহিংস অসহযোগ পরিণত হলো সর্বতোমুখ মুক্তি যুদ্ধে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

পাকিস্তান জোড়াতালি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল যখন, তখনি আমরা জানতুম যে ওটা একটা অনাসৃষ্টি। ওর জোড় একদিন খুলে যাবেই। যে কোনো দূরদর্শী পুরুষ তখনি বলতে পারতেন যে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল কখনো পশ্চিমাঞ্চলের তাঁবেদার হতে চাইবে না, সে চাইবে তার যথোপযুক্ত মর্যাদা, না পেলে বিদ্রোহ করবে। যে ঘটনা পনেরো বছর আগেই ঘটতে পারত তা ঘটছে পনেরো বছর দেরিতে। হচ্ছে এতদূর হিংস্রতার সঙ্গে যে পরিষ্কার বোঝা যায় এর কারণ উভয়পক্ষই মরীয়া হয়ে উঠেছে। উভয়পক্ষই চায় এস্পার কি ওস্পার। ইয়াহিয়া খান যদি জেতেন তবে পূর্ব বাংলা আর কোনো দিন মাথা তুলতে পারবে না, তাকে চিরদিন তাঁবেদার হয়েই

থাকতে হবে। গণতন্ত্র তার জন্যে নয়। সেটা একটা উপনিবেশ। আর শেখ মুজিবর রহমান যদি জেতেন তা হলে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নিষ্কণ্টক হবে। পাকিস্তানের বাকী স্থানও সামরিক শাসনমুক্ত হবে।

হয়তো ছ'মাস বাদে, হয়তো একবছর বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত উপলব্ধি করবে যে বাংলাদেশ বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যার আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর সত্তার মূলে রয়েছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা-বাদ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মতো বলবান। তাকে হারিয়ে দেওয়া যায় না, তার যথার্থতা স্বীকার করে নিতে হয়।

পাকিস্তানী ফৌজের চেয়ে বহুগুণ পরাক্রান্ত শক্তি ইসলামী জাতীয়তাবাদ। যে শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারত ভাগ হয়ে যায়, বাংলা ভাগ হয়ে যায়। সেই পরাক্রান্ত শক্তি পূর্ব বাংলার বিগত সাধারণ নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়েছে। বাঙালী মুসলমান এখন প্রথমে বাঙালী, তার পরে মুসলমান। এই পরিবর্তনটি আসতে তেইশ বছর লেগেছে, কিন্তু একবার যখন এসেছে তখন আর ফিরে যাচ্ছে না। পাকিস্তানী ফৌজ যার জোরে জোরদার সেই যখন হেরে গেছে তখন পাকিস্তানী ফৌজ এ যুদ্ধ জিতবে আর কিসের জোরে? শুধুমাত্র কামান বন্দুকের জোরেই কি যুদ্ধ জেতা যায়? পেছনে আরো বড়ো একটা শক্তি থাকা চাই। যেটা পশ্চিম পাকিস্তানে এখনো আছে, পূর্ব বাংলায় যদি থাকে তবে কেবল পশ্চিমা মুসলমানদের মধ্যেই আছে।

পশ্চিমা মুসলমানদের সহায়তায় পাকিস্তানী ফৌজ আরো কিছুকাল লড়তে পারে, কিন্তু তাদের "কুইট বাংলা" করতে হবেই। তখন দেখবে আকাশ পাড়ি দেবার জন্যে বিমান নেই, সাগর পাড়ি দেবার জন্যে জাহাজ নেই, স্থলপথ তো রুদ্ধ।

"যে পথ দিয়ে মোগল এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।"

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা মনে করেছেন তাঁরা সর্ব-শক্তিমান। কিন্তু নবজাগ্রত পূর্ব বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিজের ঘরে নিজের জোরে জোরদার। ইতিমধ্যেই সে তার নিজের জাতীয় নিশান ওড়াতে শুরু করেছে, তার নিজের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করেছে, তার আপনার একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করেছে। রাষ্ট্রপতি হয়েছেন শেখ মুজিবর রহমান সাহেব। শেখ মুজিব এখন ইয়াহিয়া খানের চেয়ে মাথায় উঁচু। দেশে বিদেশে সর্বত্র তাঁর সম্মান। গান্ধী নেহরু সুভাষচন্দ্রের পর এই একজন অসাধারণ নেতার দর্শন পাওয়া গেল যিনি সাধারণ রাজনৈতিক গণনার ঊর্ধ্বে। যিনি একটা নতুন নেশনের জন্মদাতা। এই নেশন কখনো মুজিবকে ছেড়ে ইয়াহিয়ার বশ্যতা স্বীকার করবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানের বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো ইংরেজের অনুসরণে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া। সন্ধি করে সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলেও পর হয়ে যাবে না। তার সঙ্গে মেলবন্ধনের বিবিধ সূত্র থাকবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের শাসনসূত্র ছিন্ন হলেও বাণিজ্যসূত্র রয়েছে, সংস্কৃতি-সূত্র রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্মসূত্রও থাকবে, অধিকাংশ লোক যখন মুসলমান।

গোড়াতে একাধিক মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রের কল্পনাই করা হয়েছিল। এখন আবার ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ফিরে গেলেই অবিলম্বে শান্তি হয়।

সেনাশক্তি বনাম লোকশক্তি

ইতিহাসে কদাচিৎ এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দেশের সৈন্যদল লড়ছে দেশের জনগণের সঙ্গে। জনগণই যাদের মালিক, যাদের অন্নদাতা, যাদের জন্যে এতদিন অসীম কষ্ট স্বীকার করে কর জুগিয়ে এসেছে তারাই আজ পাগলের মতো জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের প্রাণ নিচ্ছে, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের ঘরণীদের অসম্মান করছে, তাদের ক্ষেত পুড়িয়ে দিচ্ছে, ক্ষেতের উপর নাপাম বোমা ফেলছে, তাদের কলকারখানা ভেঙে চুরমার করছে, তাদের জ্ঞানীগুণীদেরও পালাবার পথ না দিয়ে হত্যা করছে। এমনতর অত্যাচার হিটলারও করেনি। ইয়াহিয়া খান যে নাদিরশাহের বংশধর!

এই উন্মত্ততা ধর্মঘটিত নয়। উভয়পক্ষই মুসলমান। মতবাদ-ঘটিতও নয়। কোনো পক্ষই কমিউনিস্ট নয়। এর মূলে রয়েছে দুই নিশানের প্রতি দুই আনুগত্য। একদিকে পাকিস্তানী নেশনের নিশান। একদিকে বাঙালী নেশনের নিশান। পাকিস্তানী নিশান চায় সর্বত্র অসপত্ন হতে। বাঙালী নিশানও নিজের এলাকায় অসপত্ন হতে চায়। এটা এমন একটা বিরোধ যার একমাত্র নিষ্পত্তি পাকিস্তানী এলাকা ও বাঙালী এলাকা ভাগ করে দেওয়া। পাকিস্তানী এলাকায় পাকিস্তানী নিশান উড়বে, বাঙালী এলাকায় বাঙালী নিশান। নয়তো এ যুদ্ধ ততকাল চলবে যতকাল একপক্ষ অপরপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত বা বিধ্বস্ত না করে।

আপাতত কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছে না, কিন্তু একপক্ষ অপর পক্ষকে বিধ্বস্ত করছে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ কি আত্মসমর্পণ? ফরাসীরা যেমন গত মহাযুদ্ধে জার্মানদের কাছে

আত্মসমর্পণ করেছিল ? তা না হলে প্যারিস আর আস্ত থাকত না। বাঙালীরা যদি তেমন কিছু করে তবে কেউ তাদের লজ্জা দেবে না। কিন্তু এই নয়া নাৎসীদের হাত থেকে আর কোনোদিনই তারা নিষ্কৃতি পাবে না। এদের হারিয়ে দেবার জন্যে ইংরেজ মার্কিন রুশ হাত মেলাবে না। এটা তো বিশ্বযুদ্ধ নয়, এটা গৃহযুদ্ধ।

যাতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না হয় সেইজন্যে ভারত এতকাল গোষ্ঠীনিরপেক্ষ রয়েছে। তার ফলে সে আখেরে লাভবান হবে, কিন্তু আপাতত তার একটিও মিত্র নেই। আক্রমণের মুখে সে একাকী। এমন যে ভারত সে কি আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করতে পারে ? মনে রাখতে হবে যে পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ করলেও তা আইন অনুসারে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। যেমন কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য। কাশ্মীর আক্রান্ত হলে যেমন ভারত আক্রান্ত হয় পূর্ববাংলা আক্রান্ত হলে তেমনি পাকিস্তান। যতদিন না বাংলাদেশ আইন অনুসারে স্বাধীন ও সর্বভৌম হচ্ছে ততদিন বাংলাদেশে সৈন্য প্রেরণ মানে পাকিস্তান আক্রমণ। পাকিস্তানে সৈন্য পাঠানোর অতি মহৎ হেতু থাকতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার আর দশটা দেশ মহত্ত্বের জন্যে মার্জনা করবে না। তাদের পাপ মন বলবে যে ভারত এই সুযোগে পার্টিশন রদ করতে চায় বা পাকিস্তানের উপর কনফেডারেশন চাপিয়ে দিতে চায়। পাকিস্তানের মিত্ররা তার পক্ষ নিয়ে লড়বে। ইউনাইটেড নেশনস যুদ্ধ থামিয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বেশীদিন চলতে পারে না, চললে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে।

এটা গৃহযুদ্ধ হিসাবে আরম্ভ হয়েছে, গৃহযুদ্ধ হিসাবেই শেষ হবে। এ যুদ্ধে ভারত জড়িয়ে পড়বে না, পড়লে চীনের সঙ্গেও লড়তে হবে। সামরিক হস্তক্ষেপ শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষেও লাভজনক হবে না। চীন যদি আসামে ঢোকে বাংলাদেশকে চীনের সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হবে। তাতে হয়তো মাওপন্থীদেরই মওকা।

বাংলাদেশে ম্যান পাওয়ারের অভাব নেই। দু'চার লাখ মারা

গেলেও, দশ বিশ লাখ পলাতক হলেও সাত কোটি লোক বাকী থাকে। তার থেকে যদি আধ কোটি উর্দুভাষী ও মুসলিম লীগপন্থীকে বাদ দেওয়া যায় তা হলেও সাড়ে ছ'কোটি একটা বিরাট জনসংখ্যা। সুসংগঠিত হলে এরা বিনা অস্ত্রে বা নামমাত্র অস্ত্রে সামরিক গোষ্ঠীকে জেরবার করে তুলতে পারে। বাংলাদেশের প্রধান অভাব অস্ত্রের নয়, সৈন্যের নয়, সংগঠনের। নেতারা রাজনৈতিক সংগঠনেই মন দিয়েছেন, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যে সংগঠনের চিন্তা করেননি। যুদ্ধ যখন বাধে তখন সেনাশক্তি প্রস্তুত, লোকশক্তি প্রস্তুত নয়। এখন তাকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। লোকশক্তির সত্যিকার ঘাঁটি হলো পূর্ব বাংলার সত্তর আশি হাজার গ্রাম। তাদের অধিকাংশই দুর্গম। বর্ষাকালে তো দুর্ভেদ্য। প্রকৃতি যেসব ঘাঁটি তৈরি করে রেখেছে সেইখানেই চলবে প্রস্তুতি। শহরে নয়। শহর থেকে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে নিশ্চয়ই এতদিনে শিক্ষা হয়েছে যে শহরের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করবার মতো অস্ত্রবল বা তালিম মুক্তি ফৌজের নেই। আর শহরের সংখ্যা তো পঞ্চাশটাও নয়। পাকিস্তানী ফৌজ কি পঞ্চাশটা শহর কবজা করতে পারে না? যখন তাদের হাতেই কামান বিমান প্রভৃতি ভারী অস্ত্র।

শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধে সেইপক্ষ জিতবে যার মনোবল দৃঢ়তর, যার মেরুদণ্ড আরো মজবুৎ। এর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র তত বেশী লাগে না যত বেশী লাগে নেতাদের প্রতি পার্টির একানুগত্য আর পার্টির প্রতি জনগণের একানুগত্য। আওয়ামী লীগের তবু তো কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে, কংগ্রেসের কীই বা ছিল? কংগ্রেসের ছিল গান্ধীজীর প্রতি একানুগত্য, জনগণের ছিল গান্ধীজীর প্রতি একানুগত্য। যেসব অঞ্চলে ছিল না সেসব অঞ্চল পরে ভারতের বাইরে চলে যায়। আওয়ামী লীগের কর্তব্য হবে পূর্ব বাংলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে জনগণের একানুগত্য লাভ করা। পাকিস্তানী ফৌজ যেখানে গেড়ে

বসেছে সেখানেও জনগণের প্রচ্ছন্ন আনুগত্য আওয়ামী লীগের প্রতি থাকবে।

যে সরকারের উপর লোকের আস্থা নেই তেমন কোনো সরকার নিছক গায়ের জোরে বেশীদিন শাসন করতে পারে না। তাকে একদিন ক্ষমতার হস্তান্তর করতেই হবে। দেশে যদি দুটিমাত্র সঙ্ঘ থাকে—পাকিস্তানী ফৌজ আর আওয়ামী লীগ পার্টি—তবে দিন আগত হলে পাকিস্তানী ফৌজ আওয়ামী লীগের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়। মাউণ্টব্যাটেন যেমন দিন ফেললেন ১৫ই অগাস্ট ১৯৪৭ ইয়াহিয়া খানও তেমনি দিন ফেলবেন অমুক সালের অমুক দিন। সেইদিনটিকে আমরা এপার থেকে ইচ্ছা করলেই এগিয়ে আনতে পারব না। আবার পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাপতি ধনপতি ও রাজনীতিকরাও ইচ্ছা করলেই পেছিয়ে দিতে পারবেন না। বাংলাদেশের নেতারা অনমনীয় হলে, পার্টি সুসংবদ্ধ হলে, জনমত সুসংগঠিত হলে, ত্যাগশক্তি অপরিসীম হলে, ধৈর্য অপরিমেয় হলে, নদী নালা বন জঙ্গল জলাভূমির ও বর্ষাকালের সুযোগ নিলে, তিন হাজার মাইল দূর থেকে সৈন্য ও রসদ আমদানী সাধ্যাতিরিক্ত হলে, পাকিস্তান সরকারের তহবিলে ও করদাতাদের পকেটে টান পড়লে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে চাপ দিতে শুরু করলে, সেখানকার গণতান্ত্রিক অধিকারবঞ্চিত জনগণ বিক্ষুব্ধ হলে, যুদ্ধ কিছুতেই শেষ করতে পারা যাচ্ছে না দেখে সৈন্যদলের ভিতরেও অশান্তি দেখা দিলে, বিশ্ব জনমতের প্রতিকূলতায় বৈদেশিক সাহায্য রহিত হলে, পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আমদানী রপ্তানী বন্ধ হলে, বাংলাদেশের অন্যান্য দলগুলিও সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলে পাকিস্তানী সামরিক কর্তারা এমন বিপাকে পড়বেন যে বাংলাদেশের লোকপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ব্যাকুল হবেন। কিন্তু একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়।

পাকিস্তানের একপ্রান্ত অপর প্রান্তের সঙ্গে মিলে মিশে এক নেশন হতে পারেনি, পারবেও না। কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে বাঙালীরা যদি একটি নেশন হয় তো সিন্ধীরাও একটি নেশন হতে চাইবে, পাখতুনরাও। অমন করলে সৈন্যদল ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। এই চিন্তাই ইয়াহিয়া খানকে মরীয়া করে তুলেছে। চার্চিল যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লিকুইডেশনে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন ইয়াহিয়া খানও তেমনি পাকিস্তানকে লিকুইডেশনে দিতে অনিচ্ছুক। চার্চিল যেমন ব্যর্থ হলেন ইয়াহিয়াও তেমনি ব্যর্থ হবেন, কারণ বাঙালীরা সত্যি একটি ভাষাভিত্তিক নেশন, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানে তারা খাপ খাচ্ছে না ও খাবে না। বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হলে পরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা একটি বহুভাষী রাষ্ট্র গড়তে পারে।

সমকক্ষতার স্বপ্ন

মুসলিম লীগপন্থী রাজনীতি যাঁরা মন দিয়ে অনুধাবন করেছেন তাঁরা জানেন যে তার একটি মূলনীতি ছিল সেপারেটিজম। আর একটি ওয়েটেজ।

সেপারেট ইলেকটোরেটের ছুঁচ হয়ে যা ঢোকে সেপারেট স্টেটের ফাল হয়ে তা বেরয়। সেপারেট ইলেকটোরেট যাঁরা মেনে নেন তাঁদের দূরদৃষ্টি থাকলে তাঁরা দেখতে পেতেন সেপারেট স্টেট তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

আর ওয়েটেজ? তার কথাই আজ বিশেষ করে বলব। ওয়েটেজ কথাটার অর্থ এই যে আইন সভায় বা চাকরি বাকরিতে যে সম্প্রদায়ের যে সংখ্যানুপাত তার চেয়ে তাকে কিছু বেশী দেওয়া দরকার, যদি সে মাইনরিটি হয়ে থাকে। নইলে তার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কোনো ওজন থাকবে না।

হিন্দুরাও কোনো কোনো প্রদেশে মাইনরিটি বলে কংগ্রেস নেতারা লীগ নেতাদের সঙ্গে ওয়েটেজের ভিত্তিতে ১৯১৬ সালে লখ্‌নৌ শহরে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর পরে আর বলা চলে না যে ওটাও সেপারেট ইলেকটোরেটের মতো ইংরেজের সঙ্গে লীগের কারসাজি। না, ওটা কংগ্রেসেরই অদূরদর্শিতা।

পরবর্তী কালে কংগ্রেসের অমতে র‍্যামজে ম্যাকডোনালড তাঁর রোয়েদাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়েটেজ বাড়িয়ে দেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওয়েটেজ কমিয়ে দেন। ফলে বাংলার হিন্দুরা তাঁদের পাওনার চেয়েও কম পান। সারা ভারতের হিন্দুদেরও সেই দশা।

"না গ্রহণ না বর্জন" নীতির দ্বারা কংগ্রেস ওটাকে প্রকারান্তরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ওইপর্যন্ত। ওর চেয়ে এক পা এগোয় না। মুসলিম লীগ নেতা ঝীণা সাহেব যখন কেন্দ্রীয় আইন

সভায় ইংরেজের দেওয়া শতকরা পঁচিশের জায়গায় কংগ্রেসের কাছ থেকে শতকরা চল্লিশ চান তখন কংগ্রেস নেতারা কর্ণপাত করতে রাজী হন না। শতকরা বাইশ যাদের জনসংখ্যা তাদের শতকরা চল্লিশ দিলে ও সেই হারে খ্রীস্টান শিখ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতিকে বাড়তি আসন দিলে হিন্দুরা তো তাদের পাওনা শতকরা পঁচাত্তরটি আসন পায়ই না, হয়ে যায় মাইনরিটি। তার থেকে তফশিলীদেরও সেই হারে ভাগ দিলে তথাকথিত বর্ণ হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়েও কম পেয়ে মাইনরিটির মাইনরিটিতে পরিণত হয়।

শতকরা চল্লিশ পেলে ঝীণা সাহেব অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভায় শতকরা পঞ্চাশের বেশী আসনের অধিকারী হতেন। তা হলে হয়তো অবিভক্ত ভারতে তাঁর আপত্তি থাকত না। সেটা যখন হবার নয় তখন তিনি পার্টিশনের ধুয়ো ধরেন।

সেপারেট ইলেকটোরেট থেকে যেমন সেপারেট স্টেট তেমনি ওয়েটেজ থেকে দুই রাষ্ট্রের সমকক্ষতা। শতকরা বাইশ যেমন চেয়েছিল শতকরা চল্লিশ হয়ে গুরুত্বের দিক থেকে প্রায় সমান সমান হতে, ছোট একটি রাষ্ট্র পাকিস্তান তেমনি চায় বড়ো একটি রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে প্রায় সমান বলশালী হতে।

এই যে সমকক্ষতার স্বপ্ন এর মূল এত গভীরে নিহিত যে বুদ্ধি দিয়ে এর তল পাওয়া যায় না। মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলতে পারা যায় এটা একটা কমপ্লেকস। পাকিস্তান যতকাল থাকবে ততকাল সে ভারতের সঙ্গে সমান বলশালী হবার সাধ পোষণ করবে। তার সাধনাও তাই। এইজন্যেই সে চিরকাল কাশ্মীর দাবী করবে। সেই ইস্যুতে লড়তে চাইবে।

কিন্তু ছোট একটি রাষ্ট্র বড়ো একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে পারবে কেন? সেইজন্যেই সে ভারতের বিরুদ্ধে দল পাকাবে, জোটবন্দী হবে। চীন হবে তার দোস্ত, মার্কিন হবে তার মিতা। তুর্কি ইরান হবে তার জোটভুক্ত। আরবরা তার দরদী।

এমন যে পাকিস্তান, এমন যার স্বপ্ন, এমন যার মূলনীতি তার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলা পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে সম্ভব হলো না। তাঁরা প্রথমে দাবী করলেন অটোনমি। ঘটনাচক্রে অটোনমির দাবী পরিণত হয়েছে স্বাধীনতা ঘোষণায়। তাই নিয়ে ঘোর সংগ্রাম চলেছে। সংগ্রামে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক মহলের পরাজয় ঘটে তবে তাঁদের সমকক্ষতার সাধ চিরকালের জন্যে মিটে যাবে।

পরাজয় কি কেউ ইচ্ছে করে মেনে নেয়? পশ্চিম পাকিস্তানীরাও মেনে নেবেন না। মেনে নিতে পারবেন না। এ সংগ্রাম তাঁদের পক্ষে জীবন মরণ সংগ্রাম। এতে পরাজিত হলে তাঁরা আর কাশ্মীরের ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে বলপরীক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। সমান বলশালী হওয়া তো অসম্ভব। এত বড়ো সৈন্যদলের খরচ জোগাবে কে?

আখেরে ভারতের কাছে হেরে যাবেন বলেই এখন থেকেই তাঁরা ভারতের সঙ্গেও একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার চান। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ যে কোনো দিন বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে সেটা যে বাধবেই এমন কথা বলা যায় না। পাকিস্তান এককভাবে ভারতের সঙ্গে লড়তে পারবে না, এটা সে জানে। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। মুসলিম লীগের খুঁটির জোর জোগাত ইংরেজ। তেমনি পাকিস্তানের পেছনে খুঁটির জোর জোগাবে চীন। শুধু কি চীন? না, একমাত্র চীন নয়। আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

আর একটা বিশ্বযুদ্ধের জন্যে যাঁরা প্রস্তুত নন, বিশেষ করে বাংলাদেশের ইস্যুতে, তাঁরা নিশ্চয়ই সময় থাকতে পাকিস্তানকে নিরস্ত করবেন। আমি আশাবাদী। আক্রান্ত হলে ভারত যুদ্ধে নামবে বইকি, কিন্তু প্রথম আক্রমণটা যেন ভারতের দিক থেকে না হয়।

গৃহযুদ্ধ

দেশের ঐক্য রক্ষা করার জন্যে আমেরিকানরা একদিন গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। হয়েছিল বলেই তো দেশের ঐক্য রক্ষা করতে পারল। পরে পৃথিবীর সব চেয়ে পরাক্রান্ত, সব চেয়ে ঐশ্বর্যশালী নেশন হতে পারল। নয়তো পাশাপাশি দুটো রাষ্ট্র থাকত। অনবরত কলহ করত। একটা অপরটার বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুর সঙ্গে জোটবন্দী হতো। তেমনি করে স্বাধীনতা বিকিয়ে দিত। কিংবা হতো বিদেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্র।

পার্টিশনের চেয়ে গৃহযুদ্ধ শ্রেয়, একদা এই ছিল আমার সিদ্ধান্ত। পরে কিন্তু আমি উপলব্ধি করি যে ভারতবর্ষ আমেরিকা নয়। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবার পর আমার এক মুসলমান সহযোগী আমাকে বলেন, "এ কি কখনো হতে পারে যে সব হিন্দুই সব মুসলমানের শত্রু, সব মুসলমানই সব হিন্দুর শত্রু?"

সেদিন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকেও হিন্দুরা অবিশ্বাস করেছে, হত্যা করেছে। আর যে হিন্দু আজন্ম উর্দুতে কথা বলে এসেছে, গালিব ইকবালকে ভক্তি করেছে, আচারে ব্যবহারে মুসলমানের মতো, মুসলমানদের ভালো বই মন্দ চায় না তাকেও মুসলমানরা অবিশ্বাস করেছে, তার অঙ্গ পরীক্ষা করে তাকেও জবাই করেছে।

আমার মতো যারা দু'পক্ষের সেতুবন্ধনে চিরদিন তৎপর, যারা কতক বিষয়ে হিন্দু ও কতক বিষয়ে মুসলিম ও কতক বিষয়ে ইউরোপীয়, তাদের দশাই সব চেয়ে শোচনীয়। আমরা যারই দিকে তাকাই সেই আমাদের অপর শিবিরের লোক বলে সন্দেহ করে। কেউ মানতেই চায় না যে আমরাই এই মহাদেশসদৃশ দেশের মানক

বিবর্তনের আধুনিকতম বিকাশ। আধুনিততম বিকাশ তবে কারা? যারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ইংরেজরা আপনাদের বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল, তাই মানে মানে সরে গেল। ঐক্য রক্ষার জন্যে তাদের মাথাব্যথা ছিল না, যাঁদের মাথা-ব্যথা তাঁরাও গৃহযুদ্ধে মরতে রাজী ছিলেন না। গৃহযুদ্ধে মরতে চাইলেই বা একতরফা জয়ের নিশ্চয়তা কোথায়? কিছুকাল লড়াই চালিয়ে দু'পক্ষই ক্লান্ত হয়ে শান্তির জন্যে হাত বাড়িয়ে দিত। কিন্তু মাঝখান যে রক্তপাতটা ঘটে যেত সেটা আর তাদের এক নেশন হতে দিত না। দুই শিবিরই দুই রাষ্ট্রে পর্যবসিত হতো। যার যে অঞ্চলে জোর বেশি সে সেই অঞ্চলের অধিপতি হতো।

পার্টিশন ইংরেজ থাকলেও হতো, না থাকলেও হতো। ও ছাড়া হিন্দু-মুসলিম রক্তারক্তির আর কোন মধ্যপন্থা ছিল না। তা বলে ওটা যে একটা সত্যিকার মীমাংসা তা নয়। সতিকার মীমাংসা এখনো সুদূর।

ঐক্যের যুগ তখনি আসবে যখন আমরা পরস্পরকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারব, যখন বলতে পারব যে "তোমাদের হাতে আমাদের ধন প্রাণ মান ইজ্জৎ নিরাপদ, তোমরা এদেশটাকে পরের কাছে বিকিয়ে দেবে না, পরকে ডেকে আনবে না এদেশে।" যখন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করব যে কার কী ধর্মমত সেটা তেমন বড়ো কথা নয়। কে কেমন মানুষ সেইটেই বড়ো কথা। কার উপর অধিকাংশ নাগরিকের আস্থা আছে সেইটেই বড়ো কথা। হিন্দু রাজ মুসলিম রাজ এগুলো দুই শতাব্দী আগে সত্য ছিল, এতদিনে তামাদি হয়ে গেছে। ব্রিটিশ রাজের পর হিন্দু রাজ মুসলিম রাজ আর মানায় না। যেটা মানায় সেটা হচ্ছে স্বরাজ বা ভারতীয় রাজ। সেই ভারতীয় রাজ যদি নানা কারণে দুই স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত হয় তা হলেও তার চারিত্র্য একই রকম হবে। দুই অংশেই হিন্দু থাকবে, মুসলমান থাকবে, শিখ থাকবে, খ্রীস্টান থাকবে, বৌদ্ধ থাকবে, পার্শী থাকবে।

থাকবে সমান অধিকার নিয়ে। দুই অংশেই গণতন্ত্রের স্বীকৃতি থাকবে। দুই অংশেই সাধারণ মানুষের মঙ্গলের দিকে, সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা করবে।

এই চব্বিশ বছর পরে আমরা দেখছি পাকিস্তান বলে যার পরিচয় সে রাষ্ট্র ভারতের থেকে স্বতন্ত্র হতে গিয়ে একবারে বিপরীত মেরু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত যদি হয় সেকুলার স্টেট পাকিস্তান হবে ইসলামিক স্টেট। ভারত যদি হয় হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকলেরই পাকিস্তান হবে কেবলমাত্র মুসলমানের। ভারত যদি হয় জোটনিরপেক্ষ পাকিস্তান হবে সেন্টো সীয়াটো জোটভুক্ত। উপরন্তু চীনের সঙ্গে ঘোঁট পাকাবে। ভারত যদি হয় গণতন্ত্রের পক্ষপাতী পাকিস্তান হবে ডিক্টেটরশিপের পক্ষপাতী। ভারত যদি হয় অসামরিক শাসনের পক্ষে তো পাকিস্তান হবে সামরিক শাসনের পক্ষে।

বিবর্তনসূত্রে এক অপরের থেকে এত দূরে সরে গেছে যে সেতুবন্ধন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত। আমরা তো হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলুম এমন সময় দেখা গেল পাকিস্তানের পূর্বাংশ অবিকল আমাদেরি ভাষায় কথা বলছে। সে চায় বাংলা ভাষা, সে চায় গণতন্ত্র, সে চায় সেকুলার স্টেট, সে চায় জোটনিরপক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। তা বলে যে সে ভারতভুক্ত হতে চায় তা নয়। সে তো বলেছিল সে পাকিস্তানেই থাকবে, যদি তার ছয় দফা দাবি মিটিয়ে দেওয়া হয়। তা না হয়ে যা হলো তা হিটলারের পর এ যুগের বৃহত্তম গণহত্যা। পূর্ব পাকিস্তান রাতারাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ নাম পরিগ্রহ করল। শুরু হয়ে গেল আরেক প্রকার গৃহযুদ্ধ। এবার আর হিন্দুতে মুসলমানে নয়, মুসলমানে মুসলমানে। ধর্মের ইস্যুতে নয়, সংস্কৃতির ইস্যুতে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন তিনি তাঁর স্বদেশের ঐক্য রক্ষা করবেনই করবেন, মরে মরুক অর্ধেক লোক। কিন্তু আমেরিকার

সঙ্গে অবিভক্ত ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একটা বিষয়ে একটা মস্ত বড় ফারাক। পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার ব্রত নিয়েছেন যিনি তাঁর পেছনে তাঁর অধিকাংশ দেশবাসীর সমর্থন নেই। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি নন। তাঁর পায়ের তলায় একটা সংবিধানও নেই, যেমন ছিল লিংকনের বেলা। আমেরিকার সংবিধান দক্ষিণের রাজ্যগুলিও মেনে নিয়েছিল! পাকিস্তানের সংবিধান কোথায় যে বাংলাদেশ মেনে নিতে ন্যায়ত ও ধর্মত বাধ্য হবে?

পাকিস্তানের সংবিধানই নেই। সংবিধান রচনার জন্যে যে জাতীয় পরিষদ আহূত হয়েছিল তার প্রতিনিধিদের প্রথম অধিবেশনই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হল। এখন তার সংবিধান রচনার ক্ষমতাটাই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই চাপিয়ে দিচ্ছেন নিজের খুশিমতো একটা সংবিধান, অথচ তিনি নিবাচিত রাষ্ট্রপতি নন, তিনি স্বয়ম্ভু। এসব কি আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয়? এই গৃহযুদ্ধ কি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অনুরূপ? কী মনে করে যে আমেরিকা পাকিস্তানকে গৃহযুদ্ধ জয়ের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র জোগাচ্ছে! ইয়াহিয়ার জয় তো জনমতের জয় নয়, অধিকাংশের জয় নয়, জনগণের প্রতিনিধিদের রচিত সংবিধানেরও জয় নয়। আমেরিকার ঐক্য রক্ষার সঙ্গে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার লেশমাত্র সাদৃশ্য নেই। এটা হচ্ছে মেজরিটির উপর মাইনরিটির ইচ্ছা জোর করে খাটানোর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক বিদ্রোহ। প্রাকৃতিক অধিকার বাংলাদেশের দিকে।

সত্যিকার গণতন্ত্র পেলে বাংলাদেশ বিদ্রোহ করত না। সত্যিকার গণতন্ত্র পেলে বাঙালীই হতেন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমা সেনাপতিরা থাকতেন তাঁদের স্বস্থানে। সত্যিকার গণতন্ত্র নেই বলেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তুলতে হয়েছে। পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে পৃথকভাবে সংবিধান রচনার দাবি সামনে রাখতে হয়েছে। যে দেশে গণতন্ত্র নেই সে দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের আর

কোনো উপায় আছে কি ? স্বাধীনতাও দেব না, গণতন্ত্রও দেব না, এই যদি হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির মনোভাব তবে তিনি কিছুতেই বলতে পারবেন না যে তিনি এ যুগের লিংকন। অতএব লিংকনের দেশের নৈতিক ও সামরিক সমর্থনের উপযুক্ত পাত্র। আমেরিকার জনমত এটা উপলব্ধি করেছে, সরকার যদিও করেন নি।

স্বাধীনতার ভিত্তিতে যদি মীমাংসা না হয় তবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই হোক। নতুবা এ গৃহযুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবে ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করে ছাড়বে। শেখ মুজিবর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তো ধ্বংস আরো ত্বরান্বিত হবে।

সামনাসামনি

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মাঝখানে যে চিকখানা খাটানো ছিল তার আড়াল থেকে ওপারের মুখ দেখতে পাওয়া যেত না। এপারের মুখ দেখতে পাওয়া যেত না ওপারে। সেইকথা মনে করেই একবছর আগে "চিকের আড়াল" লিখি। তখন তো আমি কল্পনাই করতে পারিনি যে হঠাৎ একরাতের ঝড়ে চিকখানা ছিন্নভিন্ন হয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে যাবে। এরকম ঘটনা ইতিহাসে কদাচিৎ এক আধবার ঘটে। মানুষ ঘটায় না, ঘটায় প্রকৃতি বা নিয়তি। আবার আমরা সামনাসামনি।

কাউকে কোনো ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ ঘটে গেল এক সাইক্লোন। অমনটি নাকি একশো বছরের মধ্যে ঘটেনি। সমুদ্রের জল এসে গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়, চরগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লাখ দশেক লোক একরাত্রেই নিকাশ। অথচ পাকিস্তান সরকারের ঘুম ভাঙে না। তাঁরা বেহোঁশ। সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ ছুটিয়ে এসে ইংরেজ নৌসেনার দল ইসলামধর্মীদের মৃতদেহ উদ্ধার করে, কবর দেয়। আর মুসলমানরা জলযানের অভাবে হাঁ করে দেখেন বা হাউ হাউ করে কাঁদেন। এত বড়ো অসহায় তাঁরা! কেন? কার দোষে?

তাঁদের বুকে সেই যে শেল বেঁধে তার দরুন তাঁরা বলতে গেলে একবাক্যে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের অনুকূলে ভোট দেন। এমন সাইক্লোনও কোনও দিন কেউ দেখেনি, এমন নির্বাচনও কেউ দেখেনি। ল্যাণ্ডস্লাইড ভিকটরি যাকে বলে। সারা পূর্ব পাকিস্তান একজনমাত্র নেতাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তিনিই তাদের গরব, তাদের আশা। একদিন একটি ছাত্র ঢাকা থেকে কয়েকখানি রেকর্ড সংগ্রহ করে এনে আমাকে শোনান। এপারে সেসব রেকর্ড শুনতে পাওয়া

যায় না। পাকিস্তান সরকার যে সেসব গান রেকর্ড করতে দিলেন এইটেই আশ্চর্য। গানগুলি শেখ মুজিবের জয়গান। বাঙালীর ও বাংলা ভাষার জয়গান। কোথাও পাকিস্তানের বা ইসলামেব নামগন্ধ নেই। উদ্দীপনায় ও উত্তেজনায় ভরা।

ওটাও আর একটা সাইক্লোনের পূর্বাভাষ। মার্চ মাসের গোড়ায় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জাতীয় পরিষদ্ বসার কথা ছিল তার অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হরতাল, অসহযোগ, অসামরিক প্রশাসনের উপর শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব। ঘটনা চলল ঘোড়ার মতো লাফাতে লাফাতে। আপনি আপনার মোমেন্টামে। হয়তো ক্লান্ত হয়ে আপনা থেকেই থেমে আসত। কিন্তু অতর্কিতে মিলিটারি আক্রমণ আরম্ভ করে তাকে এগিয়ে দেওয়া হলো। জনগণও প্রতিরোধ করে। ফল হয় গৃহযুদ্ধ। এবার স্বাধিকারের দাবী পর্যবসিত হয় স্বাধীনতা ঘোষণায়। পূর্ব পাকিস্তান রূপান্তরিত হয় বাংলাদেশে। যে কোনো একটি দেশের ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

দেশভাগের পাঁচ বছর বাদে শান্তিনিকেতনে আমরা একটি "সাহিত্যমেলা" করেছিলুম পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে। ওপার থেকে জনা পাঁচেক এসেছিলেন। তবু তো এসে-ছিলেন। আসতে পেরেছিলেন। পরে আর সেরকম মিলন সম্ভব হলো না। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে মাত্র একজনকেই পাওয়া যায়। তিনিও শেষ মুহূর্তে অনুমতি পান। চার বছর আগে কলকাতায় আর একটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে আমরা ওপারের বহু সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করি। কিন্তু সাড়া পাইনে। মাঝখান থেকে ঢাকার কোনো কোনো পত্রিকায় গালমন্দ খাই। যেন আমরা কী একটা চক্রান্তে লিপ্ত! ওপার থেকে বইপত্র আনিয়ে নেওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। পাচার করা ছাড়া উপায় ছিল না। হয়তো ছিল নেপাল দিয়ে বা বিলেত দিয়ে।

মাসকয়েক আগে একটি ছাত্র ঢাকা থেকে বহুকষ্টে কয়েকখানি বই এনে দেয় আমাকে। আরো আনছিল, পথে আটক বা বেহাত হয়। সাহিত্যের উপর এমন পাহারা কেউ কোথাও দেখেনি। অন্তত আধুনিককালে। কিন্তু এত কড়াকড়ির নীট ফলটা হলো কী? গৃহযুদ্ধ বেধে যাবার পর বিস্তর অধ্যাপক ও ছাত্র এপারে পালিয়ে আসেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে ছিল বইপত্র। সেসব বই ছড়িয়ে গেল এপারে। ঢাকার বইয়ের কলকাতা সংস্করণ বার হলো। লোকে আগ্রহের সঙ্গে লুফে নিল। গত তেইশ বছরে ওপারে কী কী ঘটনা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ পাওয়া গেল। ওঁদের ভাবনাচিন্তার ক্রমবিকাশেরও একটা ধারাবাহিক পরিচয় লাভ করা গেল। এমনি করে জুড়ে গেল দুটি বিচ্ছিন্ন স্রোত। বাঙালীর মন আবার এক হয়ে গেল।

ধর্মে মুসলমান হলে কি রাষ্ট্রে পাকিস্তানী হতে হয়? রাষ্ট্রে পাকিস্তানী হলে কি সংস্কৃতিতে আরবী ফারসী বা উর্দূভাষী হতে হয়? এই নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে রক্তপাত ঘটে যায়। বাংলাভাষার অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু তারপরেও কতক লোক জেদ ধরেন যে বাংলা হবে আরবী ফারসী উর্দূঘেঁষা, তার লিপি হবে কোরানের লিপি, বাংলাসাহিত্য নিবদ্ধ থাকবে জনাকয়েক মুসলিম সাহিত্যিকের রচনায়, রবীন্দ্রনাথ হবেন অপাঙ্‌ক্তেয়, হিন্দুর লেখা হবে হারাম। এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতে হলো। বাংলার ও বাঙালীর একটাই সংস্কৃতি, তাকে দু'ভাগ করা চলে না, কারো হুকুমেই না। জীবনানন্দের কাব্য পড়ানো হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। একান্ত প্রীতির সঙ্গে। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা তরুণ তরুণীদের হৃদয় জিনে নিল। শূন্যে মিলিয়ে গেল পাকিস্তানী সংস্কৃতি বলে কথিত আরবী ফারসী ও উর্দূভাষী সংস্কৃতি। লোকের কাছে প্রিয়তর হলো লোকগীতি, লোকগাথা, লোককাহিনী। তা সে হিন্দুরই হোক আর মুসলমানেরই হোক। হিন্দু বা

মুসলমান ধর্মগত পরিচয়। সংস্কৃতিগত পরিচয় বাঙালী বা বাংলাভাষী।

যারা ধর্মে মুসলমান ও সংস্কৃতিতে বাঙালী তারা আর সব পাকিস্তানীর সঙ্গে খাপ খাওয়া সম্ভব নয় দেখে স্বতন্ত্র একটি স্থান চায়। প্রথমে তাদের দাবী তারা খাটো করেছিল। অটোনমি পেলেই তারা খুশি হয়ে যেত। তাতেও বাদ সাধা হলো। তাদের দাবী এখন চরমে ঠেকেছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশই তাদের অম্বিষ্ট। এইপর্যন্ত আসতে তাদের কম কষ্ট পোহাতে হয়নি। প্রধানত মানসিক কষ্ট। শরীরের উপর সামরিক অত্যাচারই একমাত্র অত্যাচার নয়। দীর্ঘকাল ধরে মানসিক অত্যাচারও করা হয়েছে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপিসে আদালতে রেল স্টেশনে রাস্তাঘাটে। এক এক করে সর্বত্র তারা বাংলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। শহরের কোথাও ইংরেজী বা উর্দু সাইনবোর্ড থাকতে দেয়নি। মোটরের গায়ে বাংলা নম্বর। এর ফলে উর্দুভাষী প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছে। মনোমালিন্য থেকে মারামারি। শুনলুম রংপুর শহরের উর্দুভাষী দোকানদারের উর্দু সাইনবোর্ড ভেঙে দেওয়ায় তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে গুলী চালান ও দুটি ছেলে মারা যায়। তাদের একটি আবার হিন্দু। এর থেকে জনতার রুদ্র রোষ, মিলিটারির তাণ্ডব, কারমাইকেল কলেজ অগ্নিসাৎ করে মিলিটারির প্রতিশোধ।

ভাষা এই গৃহযুদ্ধের অন্যতম ইস্যু। বাঙালীরা যদি উর্দু সহ্য না করে, উর্দুভাষীরা যদি বাংলা সহ্য না করে তবে এ গৃহযুদ্ধ শুধু মিলিটারির সঙ্গে সিভিলের নয়, এক ভাষীর সঙ্গে অপর ভাষীর। এমনটি আর কোথাও হয়নি ভারত বা পাকিস্তানে। পরে হতে পারে। সুতরাং সকলেরই হুঁশিয়ার থাকা উচিত। কিছুদিন থেকে আমি লক্ষ করছি যে ওপারের বন্ধুরা ইংরেজীকেও সহ্য করবেন না। বাংলার উপর প্রেম অসপত্ন হতে গিয়ে ইংরেজীকেও বর্জন করতে চায়।

এতে আমি যেমন খুশি তেমনি দুঃখিত। কারণ ইংরেজী উঠে গেলে আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হবে। উর্দূ উঠে যাক এটাও যে আমি চাই তা নয়। কেবল এইটুকুই চাই যে উর্দূ যেন কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। তেমনি উর্দুভাষী দোকানদারেরও স্বাধীনতা থাকা উচিত তিনি কোন ভাষার সাইনবোর্ড দিয়ে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করবেন। দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী সাইনবোর্ডেই বা আপত্তি কিসের!

ওপার থেকে এপারে চলে আসা অধ্যাপক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি কোনখানে তাঁদের জ্বালা। প্রত্যেকেরই আর্থিক অবস্থা এখানকার তুলনায় উন্নত ছিল। অথচ একবস্ত্রে পালিয়ে আসতে হলো। ঘরবাড়ী পুঁথিপত্র চিরকালের সঞ্চয় সব রইল পেছনে পড়ে। তার মধ্যে মূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি যা হারিয়ে গেলে বা পুড়িয়ে দিলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। প্রাণ বেঁচেছে, মান বেঁচেছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পদ বর্বরের হাতে বিপন্ন। কোন জিনিসের কী মূল্য তা ওরা বোঝে না।

ষাঁড়ের কাছে যেমন লাল ন্যাকড়া ওদের কাছে তেমনি বাংলা। আর বাঙালী। আর হিন্দু। ওদের চোখে ওই তিনটেই এক। মুসলমান বলে যে কেউ ছাড় পাবে তা নয়, যদি বাংলায় কথা বলে ও বাঙালী বলে পরিচয় দেয়।

বুদ্ধিজীবীরা সকলেই একমত যে আর বাঙালীতে পাঞ্জাবীতে মিশ খাবে না। কেউ কাউকে বিশ্বাস করলে তো! একজন বললেন, "সামরিক আইন কি চিরকাল চলতে পারে? আয়ুব খান্ তিন বছর চালিয়ে দেখলেন, চলে না। ইয়াহিয়া খান্ও চালিয়ে দেখতে পারেন, চলবে না। সামরিক আইন উঠে গেলে তখন আমাদের রুখবে কে?"

কিন্তু সামরিক আইনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে এঁদের যে গণনা সেটা আশাবাদীর গণনা। এঁরা ভাবছেন আর কয়েক মাসের মধ্যেই

সামরিক শাসনের অবসান হবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু মানুষকে খারাপটার জন্যেও প্রস্তুত হতে হয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, যদি না বিশ্বজনমত সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের সমর্থন করে। করা অসম্ভব নয়। কিন্তু অবিলম্বে নয়। আপাতত শেখ সাহেবকে জীবিত রাখাটাই প্রথম কর্তব্য। বিশ্ব-জনমত এ বিষয়ে সক্রিয় হবে আশা করি।

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে যাই নিহিত থাকুক না কেন, বাঙালীর এই দুর্ভোগ ব্যর্থ হবে না, কারণ এর মূল নিহিত রয়েছে বাংলার মাটিতে আর বাঙালীর মানসে। আরবদেশের মাটিতে বা ইরান দেশের মানসে নয়। ধর্মের মধ্যে একটা সার্বভৌমিকতা আছে, সেইজন্যে ইসলাম অধিকাংশ বাঙালীর অন্তর জয় করেছে। কিন্তু আরবীয়তা বা পারসিকতা সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে কি? তাই যদি হতো তবে তুর্করা আরবীর মায়া কাটিয়ে উঠত না। আরবীর বদলে রোমান লিপি প্রবর্তন করত না। শরিয়তের বদলে সুইস সিভিল কোড গ্রহণ করত না।

অপর পক্ষে আরবরাও তুর্কি সাম্রাজ্যের বন্ধন কাটিয়েছে। এক ধর্ম এক রাষ্ট্র এক খলিফা বলে তুর্করা অনেককাল তাদের ভুলিয়ে রেখেছিল। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্বাধীন। মুসলিম আরব ও খ্রীস্টান আরব একদিকে, মুসলিম তুর্ক অপরদিকে। সব মুসলমান একদিকে নয়। তাই যদি হতো তবে তুর্কি সাম্রাজ্য তো অটুট থাকতই, ইরানও তার অন্তর্গত হতো। আফগানিস্থানও। ধর্মই মানবিক ব্যাপারে একমাত্র নিয়ামক নয়। ভাষা ও সংস্কৃতি, জাতি ও মাটি, বৈষয়িক স্বার্থ ও দেশরক্ষার প্রয়োজন তুর্ককে করে দেয় আরবের থেকে পর। তুর্করা তাকায় জার্মানীর মুখের দিকে। আরবরা তাকায় ইংরেজ ও ফরাসীর মুখের দিকে।

একই কারণে বাংলাদেশ তাকাচ্ছে ভারতের মুখের দিকে। আর পশ্চিম পাকিস্তান তাকাচ্ছে তুর্কি ইরান চীনের মুখের দিকে। এরাও

ঠিক করছে, ওরাও ঠিক করছে। বিপদের মুহূর্তে যে যাকে বাঁচাতে পারে সেই তো তার মিত্র। এক্ষেত্রে ধর্মের সার্বভৌমিকতা কার কোন কাজে লাগতে পারে? আরবদের মধ্যেই এখন তিন চারটে শিবির। কোনোটা ফরাসীঘেঁষা, কোনোটা মার্কিনঘেঁষা, কোনোটা রুশঘেঁষা। ইংরেজঘেঁষাও আছে। জর্ডান। সবাই তো মুসলমান। তা হলে একরাষ্ট্র গঠন করে না কেন? তেমনি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াও মুসলমানপ্রধান দেশ। ইচ্ছে করলেই তারাও একরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। তবে করে না কেন? করে না তার কারণ তারা ভুগোলের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন আর ইতিহাসের দিক থেকে পৃথক। ইতিহাসকে লঙ্ঘন করে, ভূগোলকে উপেক্ষা করে হয়তো একপ্রকার সাম্রাজ্য গড়া যায়। হয়তো একপ্রকার কনফেডারেশনও সম্ভব। কিন্তু নেশন স্টেট ওই একটিই দেখা গেল। পাকিস্তান। ওরও একত্বের দিন ফুরিয়ে এল।

একটা মিথ্যা আইডিয়ার জন্যে কী বিপুল পরিমাণ রক্তপাত ঘটেছে! এখনো বিরাম নেই। যা আখেরে ধোঁয়া হয়ে যাবে তুর্কি সাম্রাজ্যের মতো তা যে কোন যুক্তিবলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচারে অবিভাজ্য তা আমার দুর্বোধ্য। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে সকলেরই চোখ ফুটবে। যেটাকে যুক্তি মনে হচ্ছে সেটা কুযুক্তি। পাকিস্তানের গোড়ায় একটিমাত্র যুক্তি ছিল। ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থরক্ষা। ভারতীয় মুসলমান এখন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। যে ভাগটি ভারতে অবস্থান করছে তার স্বার্থ আর যে ভাগটি পাকিস্তান বেছে নিয়েছে তার স্বার্থ এখন আর অভিন্ন নয়। তেমনি যে ভাগটি পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করে আর যে ভাগটি পূর্ব বাংলায় বাস করে তাদের স্বার্থও ভিন্ন ভিন্ন। সব মুসলমানের স্বার্থ এক এটাও যেমন মিথ্যা, সব পাকিস্তানীর স্বার্থ এক এটাও তেমনি মিথ্যা। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরলে আরো রক্তপাত আছে কপালে। কিন্তু আমরাও এ নিয়ে ওকালতি করতে পারিনে।

করলে লোকে ভাববে আমাদের স্বার্থ পাকিস্তানকে বিপন্ন দেখে তার সুযোগ নেওয়া।

দেশভাগের অনেকদিন আগে থেকে আমি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। মুসলমানরা অবিভক্ত ভারতে সংখ্যালঘু ছিল, তাদের পক্ষে কোনটা ভালো সেকথা আমাকে অহরহ চিন্তিত করেছে। যেদিন শুনলুম ওদের অধিকাংশের বিশ্বাস দেশভাগ না করলে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা হবে না সেদিন তো আমি ভেবেই পাইনি ত্রিভঙ্গ হয়ে কেমন হয়ে ওরা খাড়া থাকতে পারে। কী করা যায়! তাদের অন্ধ জেদের কাছে নতি স্বীকার করতেই হলো। নয়তো ঘটত গৃহযুদ্ধ। অপরিমিত রক্তক্ষয় হতো। হিন্দু মুসলমান চিরদিনের মতো অহিনকুল হতো। গৃহযুদ্ধ ঘটতে দেব না বলে দেশভাগ মেনে নিতে হলো। তাতেও যে রক্তক্ষয় হলো না তা নয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল আর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল তাদের মধ্যেও জাতিবৈর কায়েম হলো। তবু গৃহযুদ্ধের তুলনায় কম।

এতদিন পরে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। পরে একদিন পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদেরও হবে। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় থাকব। আমাদের প্রার্থনা কেবল এই যে, অনাবশ্যক রক্তপাত যেন না হয়। রক্তপাতের দ্বারা মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না। মুসলমানরা একটা আলাদা নেশন নয়। কোনোদিন ছিল না। হতে গিয়ে নিজেরাই বিপদ ডেকে এনেছে। এর জন্যে ভারত দায়ী নয়। হিন্দুদেরও কোনো হাত নেই এতে। অন্তত বাঙালী মুসলমানরা আজ এটা বুঝতে পেরেছেন। বুঝবেন পাঞ্জাবী মুসলমানরাও পরে একদিন।

পাঞ্জাবী মুসলমানদের সঙ্গেও আমি কাজ করেছি। তাঁদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। যেমন যুদ্ধবিদ্যায় তেমনি প্রশাসনে তাঁরা সুদক্ষ। তাঁদের সবাই কিছু গোঁড়া মুসলমান বা কট্টর সাম্প্রদায়িকতা-

বাদী নন। তাই যদি হতো তবে সার সিকন্দর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রীমণ্ডলী হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে সকল পাঞ্জাবীর আস্থাভাজন হতো না। যেটা দেশভাগের কয়েক বছর আগেও সত্য ছিল সেটা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অসত্য হয়ে যেতে পারে না। পূর্ব বাংলার মতো পশ্চিম পাঞ্জাবেরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে একদিন। আরো আগে ঘটত, যদি না দেশভাগের সময় রক্তসিন্ধু বয়ে যেত। যদি না পরে আবার কাশ্মীর যুদ্ধের সময় ভ্রাতৃহত্যা ঘটত। সামনেব কাজ হচ্ছে আর একটা কুরুক্ষেত্র এড়ানো। আমার মনে হয় ভারত সরকার এই লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে চলেছেন। বিশ্ব যদি সেটা বোঝে তবে সব সমস্যা শান্তিতে মিটে যাবে।

কলিঙ্গের যুদ্ধের পর এদেশের মাটিতে যতগুলো যুদ্ধ ঘটেছে তার মধ্যে সব চেয়ে রক্তক্ষয়ী এই বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধ বা স্বাধীনতাযুদ্ধ। খুব কম করে ধরলেও আড়াই লক্ষ লোক প্রাণে মরেছে ও সত্তর লক্ষ লোক পলাতক হয়েছে। মাত্র চারমাসের মধ্যে। পৃথিবীতেও বোধহয় এটা একটা রেকর্ড। পাঞ্জাবীদের মধ্যে যাঁরা প্রাজ্ঞ জন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন এর তাৎপর্য। আপাতত তাঁরা নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক। কিন্তু অত সহজেই বা আমরা মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব কেন? পুত্তলিকা সরকার গঠনের উদ্যোগ চলেছে। পরে যদি দেখা যায় যে বাঙালীরা কেউ পুত্তলিকা হতে রাজী নন, যাঁরা রাজী তাঁরা লোকচক্ষে আরেকদল পাঞ্জাবী তখন কি সেই পুত্তলিকা সরকারকে দিয়ে নগ্ন বাহুবলের লজ্জা নিবারণ হবে? কালক্ষয় ও রক্তক্ষয়ই সার হবে। অবশেষে আসবে অন্তঃপরিবর্তন।

শরণার্থীদের জন্যে বেদনা বোধ করি। কিন্তু তাঁদের ভার দুর্বহ বলে রক্তপাতের সমর্থন করতে পারিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শরণার্থীদের চলে আসাও একপ্রকার অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ। এতে পূর্ববাংলার চাষবাস ব্যবসাবাণিজ্য কলকারখানা ও যানচলাচল বিপর্যস্ত হবে। রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি পড়বে। অর্থনীতির দিক

থেকে পূর্ব বাংলা হবে পশ্চিম পাকিস্তানের পিঠে দুর্বহ এক বোঝা। যেমন শরণার্থীরা হয়েছে ভারতের পিঠে দুর্বহ এক বোঝা। পাকিস্তানই একদিন তার নিজের বোঝা হালকা করার জন্যে ভারতের মুখের দিকে তাকাবে। তার আগে অবশ্য চীন মার্কিন আরব ইরানী তুর্কদের কাছে হাত পাতবে। তাদেরি বা এত সামর্থ্য কই যে সিন্ধুবাদের মতো বৃদ্ধটিকে কাঁধে চাপতে দেবে!

সুদিন আসবেই। আপাতত এই অনেক যে পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বহুদিনের মনোমালিন্য দূর হয়েছে। মাঝখানে যে চিকখানা ছিল সেটা হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। যার যখন খুশি সে তখন আসছে আর যাচ্ছে। পাশপোর্ট ভিসার বালাই নেই। কলকাতায় বাংলাদেশের মিশন অধিষ্ঠিত হয়েছে। ওপারের কতক অংশ যখন মুক্তাঞ্চল হবে তখন সেখানেও ভারতের বেসরকারী মিশন প্রেরিত হতে পারে। এটাও একপ্রকার স্বীকৃতি। এর চেয়ে বেশী-দূর এগোতে গেলে যুদ্ধ। অনাবশ্যক রক্তপাত।

পূর্ব বাংলার গত চব্বিশ বছরের সাহিত্য আমাদের এপারে সুপরিচিত হলে দেখা যাবে যে ওপারে একটা রেনেসাঁস ঘটে গেছে। সেই রেনেসাঁসের প্রভাব আমাদের উপরেও পড়বে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক ও অধ্যাপকরা আমাদের কিছু দিতে এসেছেন। শুধুমাত্র নিতে আসেননি। আমরা তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। তাঁরা আমাদের আপন জন

রূপান্তর

হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে মুসলমানরা চিরকাল সংখ্যলঘু হয়ে থাকবে, এটা যাঁদের ভালো লাগেনি তাঁরা জেদ ধরেন যে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে একসূত্রে গেঁথে স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র পত্তন করতে হবে। তার নাম হবে পাকিস্তান। সেই রাষ্ট্র যখন সৃষ্টি হলো তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সব মুসলমানের সমান অধিকার। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে গণতন্ত্রের বিধান অনুসারে যাদের মোট সংখ্যা বেশী তারাই রাষ্ট্রপরিচালনা করবে। পরে কিন্তু দেখা গেল যে সব মুসলমানের সমান অধিকারটা কাগজে কলমে। আসলে উর্দুভাষী মুসলমানরাই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। তারপর এটাও দেখা গেল যে মুড়ি মিছরির একদর। যাদের ভোটসংখ্যা বেশী তাদের যতগুলি আসন যাদের ভোটসংখ্যা কম তাদেরও ততগুলি আসন। বাঙালীদের কিছুতেই শাসনকার্যে সংখ্যাগুরু হতে দেওয়া হবে না। প্যারিটি নামক এই তত্ত্বটির কথা আগেভাগে জানলে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে বাঙালী মুসলমানরা উঠে পড়ে লাগত কি না সন্দেহ।

প্যারিটি মেনে নিয়েও যে শাসনকার্যে সমান অংশ পাওয়া গেল তা নয়। পাঞ্জাবীরা সৈন্যদলে শতকরা দশজনের বেশী বাঙালীকে ঠাঁই দিল না, সিভিল সার্ভিসে শতকরা পনেরো জনের বেশী। তাদেরি আস্থাভাজন এক সেনাপতি রাষ্ট্রপতি হয়ে গণতন্ত্রের বিকৃতি ঘটালেন। বাঙালীদের ১৯৪৭ সালের আশা আকাঙ্ক্ষা ধ্যান ধারণা একে একে ধূলিসাৎ হলো। তখন ওরাও জেদ ধরে যে বাঙালীপ্রধান অঞ্চলটিকে অধিকাংশ বিষয়ে স্বাধিকার দিতে হবে। ইচ্ছা করলে সিন্ধুপ্রদেশ, পাখতুনিস্থান, বেলুচিস্থান তথা পাঞ্জাবও অধিকাংশ বিষয়ে স্বাধিকার

চেয়ে নিতে পারে। পাকিস্তান বলে একটা রাষ্ট্র থাকবে, কিন্তু তার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় থাকবে মাত্র তিনটি বিষয়। বিগত সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল বাঙালীরা প্রায় সকলেই এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে প্রায় একচ্ছত্র ভাবে জিতিয়ে দেন। তখনো পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ওঠেনি। আপসের পথঘাট খোলা ছিল।

ঘটনাচক্রের আবর্তনে আপসের রাস্তা রুদ্ধ হয়। পশ্চিম পাকিস্তান প্রভাবিত পশ্চিমা সৈন্যদল অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে বাঙালী নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। দুইপক্ষেই লড়াই শুরু হয়ে যায়। এবারকার মন্ত্র লড়কে লেঙ্গে বাঙালীস্থান। বাঙালীরা আলাদা হয়ে গেলে পাকিস্তান খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান্ এখন উন্মাদ। তাঁর পূর্বপুরুষ নাদির শাহের মতোই তিনি নির্বিচারে নরহত্যা চালিয়ে যাচ্ছেন। বহু লক্ষ মরেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে। ভারত জড়িয়ে পড়ছে। যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। এখন দুনিয়া কী করে দেখা যাক।

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কেমন করে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রকে স্থান ছেড়ে দেয় তার বিবরণ আমরা ইউরোপের ইতিহাসে পড়েছি। এখন আমাদের চোখের সুমুখে দেখছি। পূর্ববঙ্গ যখন পূর্বপাকিস্তানে নামান্তরিত হয় তখন আমার অন্তরের ক্ষত আরো গভীর হয়। পার্টিশন যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে সে ক্ষতকে আমি তত অসহনীয় মনে করিনি, কারণ দেশ ভেঙে গেলেও 'বঙ্গ' নামটা তো খারিজ হয়নি বা বরাবরের মতো বিলুপ্ত হয়নি। 'বঙ্গ' ছিল বলে 'বাঙালী' ছিল, 'বাংলা' ভাষা ছিল। এককালে যাদের কলমা পড়িয়ে মুসলমান করা হয়েছে এখন কি উর্দু পড়িয়ে তাদের পাকিস্তানী করা হবে, তাদের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি ভুলিয়ে দেওয়া হবে? মনের যখন এই অবস্থা তখন ঘটে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষাবিপ্লব। সেই ভাষাবিপ্লব এতদিনে

ভাববিপ্লবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাঙালী জাতির জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা, সব একে একে এসেছে। স্বাধীনতা ঘোষণা হঠাৎ একদিন হলেও তার প্রস্তুতি একদিনে হয়নি।

অধ্যাপক আসফ-উজ-জামান সাহেবের পুস্তিকা একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার সুসমাচার বহন করে এনেছে। লেখক সংস্কৃতির দিক থেকে ধীরে ধীরে অর্থনীতির দিকে এগিয়েছেন। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের মূলসূত্রটি সাংস্কৃতিক। সংস্কৃতির বিরোধ দূর না হলে পূর্ব পশ্চিমের ঐক্য সুদূর পরাহত। বাঙালীরা কখনো তাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে ভুলবে না। আর সে সংস্কৃতি কেবল নজরুল ইসলাম প্রমুখ মুসলমানদের কীর্তি নয়, তাতে মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিরও অংশ আছে। এঁরা মুসলমান নন বলে কম বাঙালী নন।

জামান সাহেব সুলেখক, তাঁর লেখার শৈলী মনোহারী। আরবী ফারসী তথা ইংরেজীকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। খাঁটি বাংলাই তাঁর আদর্শ। খাঁটি বাংলা অবশ্য সংস্কৃতকে বাদ দিতে পারে না। খাঁটি বাংলার চর্চা এখন ওপার বাংলাতেই বেশী হচ্ছে।

সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল

সাত শতাব্দী ধরে যারা একসঙ্গে বাস করে এসেছে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই বহুবিধ অভিযোগ জমেছে। সেসব অভিযোগ একদিনে বা এক পুরুষে বা এক শতাব্দীতে দূর হতে পারে না। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টারও একটা অপরিহার্য শর্ত আছে। শর্তটা হচ্ছে এই যে হিন্দু মুসলমানকে একসঙ্গেই বাস করতে হবে। তারা যদি চিরকালের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে চোখের আড়াল হয়ে যায় তা হলে আর চেষ্টা করে কোনো ফল হবে না।

পাঞ্জাবের একপ্রান্তের সঙ্গে অপরপ্রান্তের লোকবিনিময় ঘটে যাবার পর থেকে আমি ইতিহাসবিধাতাব কাছে নিত্য প্রার্থনা করেছি যে বংলার হিন্দু মুসলমানের ভাগ্যে যেন অমন কিছু না ঘটে। সেইজন্যে প্রাণপণে প্রত্যেকবার দাঙ্গাহাঙ্গামার লোকবিনিময়ের প্রতিবাদ করেছি। প্রতিরোধও করেছি। কিন্তু চব্বিশ বছর বাদে কী দেখছি ? যাট লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই ওপার থেকে এপারে চলে এসেছে, তাদের অধিকাংশই হিন্দু। এই স্রোতে যদি ভাঁটা না পড়ে তবে হিন্দুরা প্রায় সবাই চলে আসবে, সঙ্গে কয়েক লক্ষ মুসলমানও।

এত বড়ো বিপদ আমাদের সাত শতাব্দীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। দেশ ভাগ হয়ে যাবার চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর লোক ভাগ হয়ে যাওয়া। আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনধারা সব কিছু হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত ও উভয়ের সহযোগিতায় বিবর্তিত। ইতিহাস ও ভূগোল, অর্থনীতি ও দেশরক্ষানীতি মিলনের উপরেই নির্ভর করে এসেছে। বিচ্ছেদের উপর নয়। মুঘল

বাদশাহ্‌রাও এ তত্ত্ব বুঝতেন। তাই মুসলিম স্বার্থকেই দেশের স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দেননি। আওরংজেবের বেলা এর ব্যতিক্রম না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্য অত সহজে ভেঙে পড়ত না।

আমাদের স্বাধীন ভারতে আমরা হিন্দু মুসলমানে বাছবিচার করব না, মিলনের ধারাটিকে অব্যাহত রাখব। ওপার থেকে হিন্দুরা চলে আসছে বলে যেন এপার থেকে মুসলমানরা চলে না যায়। হিন্দুশূন্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের মতোই ষোলআনা "পাক" হবে, কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি করবে যে তার তথাকথিত বান্ধবরা কেউ সত্যিকার বান্ধব নয়। মুসলিম স্বার্থের মুখোশ পরে পাঞ্জাবী স্বার্থই তার উপর প্রভুত্ব করবে। তারও পেছনে থাকবে রকমারি বিদেশী স্বার্থ। যা কোনোদিনই বাঙালীকে মাথা তুলতে দেবে না।

হয়তো এই পরীক্ষার দরকার ছিল। এই হিন্দুশূন্য পূর্ব বাংলার। এটা যদি কেবল পাঞ্জাবী সৈন্যদলের মাথা থেকে গজিয়ে থাকে তবে একদিন এই সন্ত্রাসের অন্ত হবে। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলি এর পেছনে সক্রিয়। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে দিগ্বিজয়ী করে দেয়। সেটা মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের পক্ষে প্রাণান্তকর। পাকা ঘুঁটি যাতে কেঁচে যায় সেই জোগাড়ে তারা আছে। সম্ভবত তাদেরি চক্রান্তে স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তিত হবে। হিন্দু মুসলমান আর একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে না। অবশ্য যদি হিন্দুরা আদৌ ফিরে যায়। সেটা এখনো একটা প্রশ্নচিহ্ন।

একমাত্র ভরসা বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, এ আমাদের জীবনের পরম সৌভাগ্য। একটু আগে চরম বিপদের কথা বলেছি, এখন পরম সৌভাগ্যের কথা বলছি। ঘোরতর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের লোক যেদিন স্বাধীনতার আলো বাতাস সর্বাঙ্গে উপলব্ধি করবে সেদিন হিন্দু

মুসলমানের জাতিবৈরের এই কলঙ্ককর অধ্যায়টা একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে।

বন্ধুবর মনোজ বসু দুই প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে একপ্রকার নাড়ীর টান অনুভব করেন। এ শুধু আজ নয়, আজীবন। তাঁর লেখার সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। এতদিন পরে তাঁর তপস্যা সিদ্ধির নিকটবর্তী হয়েছে। মনের আনন্দে তাই তিনি তাঁর প্রাসঙ্গিক রচনাগুলিকে একত্র করে একটি সংকলন প্রকাশ করছেন। নাম রেখেছেন "সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল"। তাঁর লেখনীর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। হিন্দু মুসলমানের আত্মঘাতী বিরোধ বিগত রাত্রের দুঃস্বপ্নে পরিণত হোক।

তবে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যে ওই তাসখানা কেবল পাকিস্তানের হাতে নয়, আরো কোনো কোনো দেশের হাতেও আছে। আর আমাদের এই দেশেও একই রকম বিষাক্ত মতবাদ হিন্দু মুসলমান উভয়ের মনেই শিকড় গেড়ে বসেছে। তার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে প্রতিদিন তৈরি থাকতে হবে।

দুই ঘর এক উঠন

দেশ যখন দু'ভাগ হয়ে যায় তখন সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে ঘর দু'ভাগ হলেও উঠন একটাই থাকবে। দুই প্রান্তের হিন্দু সমাজও এক। দুই প্রান্তের মুসলিম সমাজও এক। দুই প্রান্তের ভাষা ও সংস্কৃতিও এক। দুই প্রান্তের আইন আদালতও একই পদ্ধতির। দুই প্রান্তের ব্যবসা বাণিজ্যও অবিভাজ্য। যেমন অবিভাজ্য পদ্মা যমুনা বঙ্গোপসাগর।

এমনি কতদিক থেকে কতরকম ঐক্য যে ছিল তা হিসাব করলে দেখা যেত বিভেদের চেয়ে ঐক্যই বেশী। সেইজন্যে আমরা নিশ্চিত ছিলুম যে দুই প্রান্তে বাস করলেও লোকে পরস্পরের কাছ থেকে বিভিন্ন হয়ে যাবে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে ঐক্যের অনুপাত কমছে, বিভেদের অনুপাত বাড়ছে। পাকিস্তান শুধু মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র হয়ে ক্ষান্ত হলো না। হলো ইসলামী রাষ্ট্র। যেখানে হিন্দুর স্থান অধমের মতো। পরে পাশপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তিত হওয়ায় লোকচলাচল ব্যাহত হলো। ইতিমধ্যে মালপত্র চলাচলের উপর মাশুল বসানো শুরু হয়েছিল। শেষে এমন হলো যে এপারের মাল ওপারে যায় না, ওপারের মাল এপারে আসে না। তবে পাচার হয়। বাণিজ্যের স্রোত সরকারীভাবে রুদ্ধ হতে পারে, বেসরকারী-ভাবে মুক্ত না হয়ে পারে না।

এতে উভয়প্রান্তই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা চিরকাল অবাধে কেনাবেচা করেছে তাদের মধ্যে অলিখিতভাবে আদানপ্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পাঠান মোগল ইংরেজ কেউ সেটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে নি। করলে মূঢ়তা হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে সে সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন। পূর্ব বাংলার জন্যে কয়লা আসবে

চীন থেকে, অথচ কাছেই পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি, বিহারের কয়লার খনি। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের জন্যে মাছ আসবে নানা প্রদেশ থেকে, কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে নয়।

পূর্ববাংলায় এবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাচ্ছে! খাদ্য আসবে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে। চাইলেই ভারত জোগাতে পারত। চাওয়া হবে না। যারা খেতে পাবে না তারা বরং ভারতে আশ্রয় নেবে। সেইভাবেই ভারতের কাছ থেকে খাদ্য নেওয়া হবে। সরাসরি নিলে পাকিস্তান সরকারের মানহানি হবে। তার চেয়ে নাগরিকদের প্রাণহানি শ্রেয়।

দুই ঘর দুই ঘরই থাকুক। কিন্তু উঠনটা যেন এক হয়। লোক-চলাচল যেন অব্যাহত হয়। ব্যবসা বাণিজ্য যেন অনবরুদ্ধ হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি যেন অবিভক্ত হয়। নয় তো যা হবার তা হবেই। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গেই সম্পর্ক ছেদ করবে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তবে রাষ্ট্র হিসাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকবে।

স্বীকৃতির প্রশ্ন

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রহিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না কেন? যে মুহূর্তে সকলেই প্রত্যাশা করছিল স্বীকৃতির ঘোষণা সে মুহূর্তে ভারত সোভিয়েট চুক্তি ঘোষণা করে স্বীকৃতিকে দূরে ঠেলে দেওয়া হলো কেন? এইভাবে কালহরণ করে আর কতদিন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব?

এসব কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা দরকার। নয়তো আমরা ঘটনার দ্বারা চালিত হয়ে সহসা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসব। ঘটনাকে চালিত করতে অক্ষম হব। ঘটনাকে চালিত করতে পারাটাই বাহাদুরি। তার দ্বারা চালিত হওয়াটা নয়।

আশি লক্ষ শরণার্থী এসে ধর্না দিয়েছে বলেই ঘটনার দ্বারা চালিত হতে হবে এটা যুক্তি নয়, কুযুক্তি। এমনও হতে পারে যে শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। কারণ বাংলাদেশে এখন দুর্ভিক্ষ আসন্ন। মারের ভয়ে না হোক অনাহারের ভয়ে অনেকে চলে আসবে।

এরকম যে হতে পারে এটা মহাত্মা গান্ধী অনুমান করেছিলেন। তাই পার্টিশনের প্রাক্কালে বলেছিলেন, "বাঙালীরা কি বুঝতে পারছে না কী বিপদ তারা ডেকে আনছে? শরৎ কেন বাধা দিচ্ছেন না?" শরৎ বসু বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, সুহরাবর্দীও। ঐরাবতের মতো তাঁদের সে বাধা ভেসে যায়।

মহাত্মা গান্ধীর কয়েকটা মূলনীতি ছিল, তার থেকে তিনি কিছুতেই ভ্রষ্ট হতেন না। একটি নীতি হলো ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের চূড়ান্ত মীমাংসা। আর একটি হলো হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের

চূড়ান্ত মীমাংসা। এ দুটি মীমাংসার প্রথমটি ঘটবে আগে, দ্বিতীয়টি তার পরে। অবশ্য একই সময়ে ঘটতেও আপত্তি নেই।

কার্যত দেখা গেল ব্রিটেনের প্রতিনিধির সঙ্গে ভারতের দুই অগ্রগণ্য দলের কথাবার্তা প্রত্যক্ষভাবে হলো, কিন্তু একটি দলের সঙ্গে অপর দলটির কথাবার্তা হলো না। কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বলে উভয়ের গ্রহণযোগ্য কোনো মীমাংসায় উপনীত হলো না। মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা এক সঙ্গে বসে একটা মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সিদ্ধান্তে উভয়পক্ষই স্বাক্ষর করেন। সেটা যদি পার্টিশনের সিদ্ধান্তও হয় তবু তাও সই। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় যে পার্টিশন তার চেয়ে উভয়পক্ষের প্রত্যক্ষ কথাবার্তার ফলে যে পার্টিশন তা আদর্শ সমাধান না হলেও তাতে বিপদ কম।

কাজেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সমঝোতা হবার কথা ছিল সেটা পার্টিশনের দ্বারা হলো না। আমরা ধরে নিলুম যে পরে এক-সময় হবে। আপাতত ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সমঝোতা তো হলো। সেটাই বা কম কী? তার জন্যে আরো কতকাল সংগ্রাম করতে ও আরো কত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হতো!

পার্টিশনের সিদ্ধান্ত যেভাবে নেওয়া হলো সেটা কংগ্রেস লীগ মিলে মিশে বা হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে নয়। তাতে মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতির অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো না। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই যে যার নিজের আর্মি ও ফরেন অ্যাফেয়ার্স হাতে পেয়ে একভাবে না একভাবে সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলো। প্রথমেই বেধে গেল তিনটি দেশীয় রাজ্য নিয়ে ঠোকাঠুকি। জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ। তারপর কূটনীতি ক্ষেত্রে একপক্ষ যদি জঙ্গী জোট এড়িয়ে চলবার জন্যে জোটনিরপেক্ষ হয় অপর পক্ষ জঙ্গী জোটের সাহায্য পাবার আশায় বিশেষ একটি জোটে জোটবন্দী হয়। পরে আবার মার্কিন প্রভাব কাটাতে চেয়ে চীনের সঙ্গে বন্ধুতা পাতায়।

ইতিমধ্যে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তিক্ত হওয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক মধুর হয়।

এর পরে ভারত পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ আর এড়ানো যায় না। কাশ্মীরের ইস্যুতে বেধে যায় যুদ্ধ। কিন্তু মিতারা কেউ পাকিস্তানকে যুদ্ধ জিততে সাহায্য করেন না। তাস্খন্দ চুক্তি না হলে কী যে হতো বলা যায় না। তবে একটা জিনিস হতে পারত। সেটা উভয় পক্ষে সরাসরি কথাবার্তা ও তার ফলে একটা ট্রিটি। সেটা হয়নি বলেই তাস্খন্দ চুক্তিকে পাকিস্তান চূড়ান্ত বলে স্বীকার করেনি। দিল্লীতে মাউন্টব্যাটেনের যে ভূমিকা ছিল তাস্খন্দে কোসিগিনেরও সেই ভূমিকা। কোনো পক্ষ কোনো পক্ষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি। দুই পক্ষই আলাদা আলাদা ভাবে আলাপ করেছেন কোসিগিনের সঙ্গে আর তিনি এক পক্ষের কথা অপর পক্ষের কানে পৌঁছে দিয়েছেন। কাজটা নিশ্চয়ই ভালো কাজ, কিন্তু গান্ধী যেটা চেয়েছিলেন সেটা নয়। সরাসরি কথাবার্তা না হলে চূড়ান্ত মীমাংসা হবার নয়। বারবার ঠোকাঠুকি বাধবেই। যে কোনো উপলক্ষে।

এবার পাকিস্তানের দুই প্রান্তের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধেছে। ভারত এতে পক্ষভুক্ত হতে চায় না। পাকিস্তান কিন্তু চায় যে ভারতও পক্ষভুক্ত হোক। ভারতের সঙ্গেও এক হাত লড়াই হয়ে যাক। নিরাপত্তা পরিষদে মামলাটা যাক। তৃতীয় পক্ষ মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসুক। এদিকে ভারতেও বহুলোক আছেন যাঁরা ঘুঘু দেখছেন, ফাঁদ দেখছেন না। তাঁরাও চান ভারত পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যে যুদ্ধ নিরাপত্তা পরিষদ্ থামিয়ে দেবেই দেবে। অথচ ভারত-পাকিস্তানকে সরাসরি কথাবার্তা চালাতে বাধ্য করতে পারবে না। যেমন মিশর-ইসরায়েলকে সরাসরি কথাবার্তা বলতে বাধ্য করতে পারছে না। লড়াই থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

যুদ্ধে নামা মানেই ছুঁচো গেলা। যুদ্ধ আমরা আমাদের ইচ্ছামতো

শেষ করতে পারব না। নিরাপত্তা পরিষদ্ বিশ্বযুদ্ধের ভয়ে হস্তক্ষেপ করবেই। কোসিগিন যদি মধ্যস্থতা না করেন আর কেউ করবেন। হয়তো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ। দুটো দেশই কমনওয়েলথভুক্ত। সুতরাং ব্রিটেনের সঙ্গে আড়ি করা চলবে না। চীন যে সত্যি এগিয়ে আসবে তা আমার প্রত্যয় হয় না। তবু সেটাও একটা ভাবনার কথা। কারণ কমিউনিস্ট চীন তো নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় যে তার কোনো নিষেধ কানে তুলবে। এর প্রতিষেধ হিসাবে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে ভারতকে।

ভারত সোভিয়েট চুক্তি সামরিক চুক্তি নয়। সেণ্টো সিয়াটো নাটো বা ওয়ারস চুক্তির সঙ্গে এর তুলনা করা অনুচিত। এ চুক্তি তখনি কার্যকর হবে যখন দেখা যাবে যে নিরাপত্তা পরিষদ্ও পাকিস্তানকে সামলাতে পারছে না। চীনকে তো নয়ই। এরূপ অবস্থায় ভারত একক লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে কি? যদি পারে তবে সোভিয়েটের সঙ্গে পরামর্শের দরকার হবে না, নইলে দরকার হবে বইকি। বাস্তববাদীরা স্বীকার করবেন যে সঙ্কটকালে পাগলের মতো এর ওর দোরে সাহায্য ভিক্ষা করার চেয়ে একজন প্রতিশ্রুত বন্ধুকে স্মরণ করাই শ্রেয়।

বলা বাহুল্য বন্ধুও স্মরণ করবেন অনুরূপ সঙ্কটক্ষণে। তার কোনো নিকট সম্ভাবনা নেই যদিও। সুদূর সম্ভাবনার কথা ভেবে যদি ভারত পেছিয়ে যেত তাহলে যুদ্ধ হয়তো এর মধ্যেই এসে পড়ত। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান সাহেব তো সাবধান করে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ আসন্ন। অনুরূপ অবস্থায় অন্য কোনো দেশ হলে কী করত? সেণ্টো বা সিয়াটোর মতো জোটভুক্ত হয়ে আপদকে ঠেকাত। ভারত যখন তেমন কোনো জোটভুক্ত নয় তখন এ ছাড়া তার আর কী উপায় ছিল? আত্মনির্ভরতা? হাঁ, আত্মনির্ভরতাই এর যথাযোগ্য উত্তর। কিন্তু চীন মার্কিন পাকিস্তানের ত্র্যহস্পর্শ ঘটলে আত্মনির্ভরতাই যথেষ্ট নয়।

এই ত্র্যহস্পর্শ নিবারণের একমাত্র পন্থা ছিল আগেভাগে মার্কিনের সঙ্গে জোটবন্দী হওয়া। সেটা হলে কিন্তু কাশ্মীরের মায়া কাটাতে হতো। কারণ কাশ্মীর ইস্যুতে ওরা পাকিস্তানের পক্ষে। ব্রিটেনও তাই। একমাত্র রাশিয়াই ভারতের পক্ষে। কাশ্মীর এতদিনে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত, যদি না রাশিয়ার ভীটো ভারতের সহায়ক হতো। একই পলিসির অনুবৃত্তি এই ভারত সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তির একটা অলিখিত শর্ত এই যে পাকিস্তান বলে একটাই রাষ্ট্র থাকবে। তাকে দু'ভাগ করে দুই রাষ্ট্র করা চলবে না। দুই রাষ্ট্র হলে দুটো স্বতন্ত্র ট্রীটি করতে হয়। ভারতেরও মূলনীতি একটি-মাত্র ট্রীটি।

তাহলে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেউ কোনোদিন স্বীকার করবেই না? ভারত না করলে আর কে করবে? এখনি না করলে আর কবে করবে? সমস্ত সত্য, তবু এটাও সত্য যে পৃথিবীর লোক প্রথমে চায় পাকিস্তানের কাঠামোর ভিতরে থেকে কোনো একপ্রকার রাজনৈতিক সমাধান। সেরকম সমাধান যে অসম্ভব তা নয়। পাকি-স্তানের কর্তারা ইচ্ছে করলেই আওয়ামী লীগকে জাতীয় পরিষদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবার জন্যে আহ্বান করতে পারেন। অন্যান্য দল যদি তার সঙ্গে হাত মেলায় তা হলে মন্ত্রীমণ্ডলীতে একাধিক দল থাকবে। নয়তো একমাত্র আওয়ামী লীগ। কেন্দ্রীয় সরকারে তার প্রাপ্য ক্ষমতা পেলে আওয়ামী লীগ আপাতত সেই ভিত্তিতে মিটমাট করতে রাজী হতে পারে। পরে যদি বুঝতে পারে যে আর্মিকে হুকুম করলে আর্মি হুকুম মানছে না, সিভিল সার্ভিসকে হুকুম করলে সিভিল সার্ভিস হুকুম মানছে না, অন্যান্য দলগুলো ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে অমান্য করছে, বিদ্রোহ করছে, তখন স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তিতে স্থায়ী মীমাংসা চাইবে। তখন পৃথিবীও স্বীকার করবে যে ওছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। তখন আসবে স্বীকৃতির সময়। সবাই স্বীকৃতি দেবে।

অবশ্য পাকিস্তানের কর্তাদের মতিগতি দেখে মালুম হয় না যে আওয়ামী লীগকে তাঁরা সরকার গঠন করতে আহ্বান করবেন। তাঁরা তাকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টায় আছেন। তেমন সরকার গঠন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাক্ষা শক্ত। উপরে মিলিটারি না থাকলে ও মিলিটারির হাতে সামরিক আইন না থাকলে সে সরকারকে কেউ মানবে না। মুক্তিযোদ্ধারা তো আরো বেপরোয়া হবে। বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হবেই। কথাবার্তা সফল্ল হলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্যে আপাতত একটা ইণ্টারিম গবর্নমেণ্ট তৈরি হবে। তাতে আওয়ামী লীগ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অধিকারী হবে। তারপর সে গবর্নমেণ্ট দু'ভাগ হয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে একটা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে আর একটা গবর্নমেণ্ট হবে। যে যার নিজের সংবিধান সভা ডাকবে ও যেমন খুশি সংবিধান পাশ করিয়ে নেবে। দু'পক্ষ ইচ্ছে করলে একটা কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পূর্ব পাকিস্তান যদি বাংলাদেশ নামটিকেই সরকারীভাবে গ্রহণ করে তা হলে কনফেডা-রেশনের নামকরণ হবে 'বাংলাদেশ ও পাকিস্তান' কিংবা 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশ'। তা হলে আর পাকিস্তানের শামিল হতে হয় না। অথচ একেবারে বিযুক্ত হওয়ারও প্রয়োজন হয় না। তবে পলিসির উপর দ্বৈত কর্তৃত্ব সঙ্কটকালে কার্যকর হয় না। বিযুক্তিই শেষপর্যন্ত ঘটবে। এই প্রোসেসটা সমাপ্ত হলে স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবী। দুনিয়ার সবাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। ভারত তো সকলের আগে।

মোহমুদ্গার

ন্যাশনালিজম ও ডেমক্রাসী দুটি তত্ত্বই আমরা ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজদের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। ন্যাশনালিজম বলতে বোঝায় এক একটি দেশ এক একটি নেশনেব বাসভূমি, দেশের স্বার্থ সম্প্রদায়ের স্বার্থের ঊর্ধ্বে, বর্ণের স্বার্থের ঊর্ধ্বে, শ্রেণীর স্বার্থের ঊর্ধ্বে, প্রদেশের বা অঞ্চলের স্বার্থের ঊর্ধ্বে। তেমনি ডেমক্রাসী বলতে বোঝায় দেশের শাসনকর্তারা হবেন আইনকর্তাদের কাছে দায়ী, আইনকর্তারা হবেন ভোটদাতাদের কাছে দায়ী, শাসনকর্তারা যদি আইনসভার আস্থা হারান তবে গদী ছেড়ে দেবেন, আইনসভা ভোটদাতাদের আস্থাভাজন কি না তা যাচাই করার জন্যে কয়েক বছর অন্তর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এসবের জন্যে চাই একটি সংবিধান।

দেশের স্বার্থ যে সম্প্রদায়ের স্বার্থের ঊর্ধ্বে এটা কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যরা মেনে নিলেও মুসলিম লীগের সদস্যরা মেনে নিলেন না। তাঁরা আগে মুসলমান, তার পরে ভারতীয়। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই তাঁরা মুসলিম ন্যাশনালিজম বলে চালালেন। প্রচার করলেন যে মুসলমানরা একাই একটি নেশন। অন্যত্র যেমন দেশ থেকে নেশন এক্ষেত্রে তার উলটো। এখানে নেশন থেকে দেশ। মুসলিম নেশনের থেকে মুসলিম হোমল্যাণ্ড। মুসলিম নেশনের জন্যে দাবী করা হলো ভারতের সেইসব প্রদেশ যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেইসব প্রদেশ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হলেও তাদের জুড়ে জুড়ে একটি খাস মুসলিম রাষ্ট্র হবে, তার নাম পাকিস্তান। সেখানে কেবল সেখানকার মুসলমানরাই স্বত্বাধিকারী হবে তা নয়, বহিরাগত মুসলমানরাও হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে বিহারের মুসলমান

মধ্যপ্রদেশের মুসলমান দক্ষিণের মুসলমান এসে ঘরের লোক হবে, অথচ আমরা যারা ঘরের লোক তারা মুসলিম না হলে স্বত্বাধিকারী হব না। থাকতে চাই যদি তো মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হব, আর নয়তো আমাদের অবস্থিতি মুসলিমদের মর্জিনির্ভর। ওরা রাখতেও পারে, মারতেও পারে, তাড়াতেও পারে। কারণ ওটা যে ওদেরি হোমল্যাণ্ড।

পার্টিশনের বছর ছয়েক আগে হাওয়া থেকে আমি বুঝতে পারি যে ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্বটা কতক মুসলমান মেনে নিলেও অধিকাংশ মুসলমান গ্রহণ করেনি, করতে পারেও না। তার আগে তাদের একটা দেশ থাকা চাই। তাদের মতে তারা আরব ইরান মধ্য এশিয়ার অধিবাসী, অধুনা বাসভূমিহীন, ভারত তো তাদের দেশ নয়, প্রবাস। কী করবে, আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ায় ফিরে যেতে তো পারবে না, অগত্যা এইখানেই তাদের জন্যে একটা দেশ সৃষ্টি করতে হবে। তার নাম দিতে হবে পাকিস্তান। তা হলেই তারা ন্যাশনালিজমের মর্ম বুঝবে, দেশকে ভালোবাসবে, তাকে স্বাধীন করার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে, স্বাধীন করার পর রক্ষা করবে। মুসলমানকে ন্যাশনালিস্ট করতে হলে পাকিস্তান স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যাদের খরচে সেটা হবে তারা কি অমনি রাজী হবে? এই নিয়ে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। রক্তপাত অনিবার্য।

সত্যি তাই হলো। নোয়াখালীর পর বাঙালী হিন্দুরাই বলতে আরম্ভ করল যে মারামারি করার চেয়ে দেশ ভাগাভাগি করে নেওয়াই ভালো, তবে সেইসঙ্গে প্রদেশও ভাগ হয়ে যাবে। এর পরে সত্যি সত্যি বাংলার একভাগ পাকিস্তানের শামিল হলো আর পাকিস্তান হলো অবশিষ্ট ভারতের মতো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারত তো চিরদিনই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই বাসভূমি, সে কেন কেবল হিন্দুদের বাসভূমি হতে যাবে? ভারতের নেতারা মুসলমানদের অভয় দিলেন, সমান স্বত্বাধিকার অঙ্গীকার করলেন। ভারত রাষ্ট্র

হলো সেকুলার স্টেট, যেখানে ধর্ম অনুসারে ন্যাশনালিটি নির্ধারিত হয় না।

ওদিকে পাকিস্তানের জনক ঝীণা সাহেবও ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সকলেই পাকিস্তানী নাগরিক, সমান স্বত্বাধিকারী। শুনে ভরসা হলো যে পাকিস্তানের সৃষ্টি খাস মুসলমানদের জন্যে হলেও হিন্দুরা সেখানে অনধিকারী নয়। সঙ্গে সঙ্গে ঝীণা ভারতীয় মুসলমানদের ভারতে বসবাস করতেই উপদেশ দিলেন, তারা যেন পাকিস্তানের দিকে পা না বাড়ায়। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী তো তাদের ভারতে রাখবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস করছিলেন, পরে এই প্রশ্নেই তাঁর প্রাণ গেল

কেউ আশঙ্কা করেনি যে পার্টিশনের পূর্বক্ষণে পাঞ্জাবে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে মুসলমানরা পালিয়ে যাবে, পশ্চিম থেকে পূর্বে হিন্দু শিখরা পালিয়ে আসবে। এই যে লোকবিনিময় এটা তিন সপ্তাহের মধ্যেই ঘটে যায়। তিন সপ্তাহে পাঁচ লক্ষ মানুষ মরে ও এক কোটির মতো লোক বিতাড়িত হয়। এর পরে পশ্চিম পাকিস্তান সত্য সত্যই একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বাসভূমিতে পরিণত হয়। সেখানে নেশন ও সম্প্রদায় সত্য সত্যই একার্থক হয়। মুসলিম দেশ, ইসলামী রাষ্ট্র এসব কথা আপনা হতেই চলতি হয়ে যায়। হিন্দু কোথায় যে হিন্দুর মুখ চেয়ে মুসলিম লীগের পলিসি পরিবর্তন করতে হবে ?

কিন্তু যার নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান সেখান থেকে প্রথম দিকে হিন্দুরা কেউ চলে আসেনি। আসতে শুরু করে কাশ্মীর নিয়ে বিবাদের পরে হাওয়া গরম দেখে। হায়দরাবাদের পরে আরো গরম হয়। এর পরে একটা না একটা কারণে ক্রমাগত গরম হতে থাকে। স্থানীয় মুসলমানদের ইচ্ছা নয় যে পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য হয়, কিন্তু সেখানে বিস্তর বিহারী মুসলমান গিয়ে জুটেছিল, গুজরাটী মুসলমানরা তে ব্যবসা বাণিজ্যে জাঁকিয়ে বসেছিল, পাঞ্জাবী মুসলমানরা সর্বঘটে

অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের মতে হিন্দুরা হচ্ছে হস্টেজ। ভারতে মুসলমানদের উপরে কিছু হলেই পাকিস্তানে হিন্দুদের উপরে তার শোধ নেওয়া হবে। যারা হস্টেজ তাদের আবার অধিকার কিসের? ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান ছাড়া আর কেউ নাগরিক নয়। কোরানের যুগে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তারা পৌত্তলিক নয় বলে। কিন্তু পৌত্তলিকদের কোনো রকম সুবিধা দেওয়া হয়নি। তারা থাকতে চায় তো ইসলাম কবুল করবে, নয়তো মানে মানে বিদায় হবে আর নয়তো কোতল হবে। পাকিস্তান নামক ইসলামী রাষ্ট্র পৌত্তলিকের উপর জাতক্রোধ।

তা হলে হিন্দুরা সবাই চলে এল না কেন? কারণ তাদের ভিটে-মাটির টান ছিল, ছিল জন্মভূমির টান, ছিল মানুষের উপর বিশ্বাস। যাদের সঙ্গে তারা সাত শতাব্দী সুখে দুঃখে একসঙ্গে কাটিয়েছে তারা আজ একটা রাষ্ট্র হাতে পেয়েছে বলে কি তেরো শো বছর আগেকার মতো ধর্মান্ধ হবে? কিন্তু ধর্মান্ধ হয়েছিল অনেকেই। হিন্দুকে তারা বড় জোর ইহুদী খ্রীস্টানের মতো জিম্মির মর্যাদা দেবে, মুসলমানের সমান মর্যাদা দেবে না। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মান্ধতার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। তারা আগে মুসলমান, তারপরে বাঙালী। তাই ইসলামী রাষ্ট্র তারাও মেনে নিয়েছিল, ভেবে দেখেনি হিন্দুর পক্ষে তার তাৎপর্য কী দাঁড়ায়।

সম্প্রদায়কে নেশন আখ্যা দেওয়া এক জিনিস আর সবাইকে নিয়ে নেশন তৈরী করা অন্য জিনিস। সমাজে যাদের আত্মসাৎ করতে পারা যায় না রাষ্ট্রে তাদের আত্মসাৎ করতে পারা যায়। ভারত সেই চেষ্টাই করছে। কিন্তু পাকিস্তানের বেলা চেষ্টা পর্যন্ত নেই। যে মুসলমান সে পাকিস্তানী, যে পাকিস্তানী সে মুসলমান, পাকিস্তান ও ইসলাম একার্থক। এটা অবশ্য হিন্দুর বিরুদ্ধে চমৎকার একটি অস্ত্র। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস এটা মুসলমানের বিরুদ্ধেও বুমেরাং করল।

২

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাস খানেকের মধ্যেই ভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বাঙালীরা মুসলমান হলেও বাঙালী থেকে যায়, অবাঙালীরা বাংলাদেশে বসবাস করলে বিয়ে সাদী করলে বাঙালী বনে যায়। সাত শো বছর বাঙালী মুসলমান তার বাঙালীত্ব রক্ষা করে এসেছে। বাংলাভাষা তার মাতৃভাষা, তার মাতৃস্থানীয়। ইসলাম তার পিতৃধর্ম, তার পিতৃস্থানীয়। দুটোই তার কাছে সমান সত্য, সমান আপনার।

উর্দূর বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলমানের কোনো প্রেজুডিস ছিল না। সে স্বেচ্ছায় উর্দূ শিখেছে। ইকবালকে মহাকবি বলেছে। বাংলার মধ্যে উর্দূর আমেজ এনেছে। কিন্তু তাকে উপর থেকে আদেশ দেওয়া হলো সে যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে সব মুসলমানের যেটা শিক্ষণীয় ভাষা তারও সেটা শিক্ষণীয় ভাষা। সেটা উর্দূ। সেটা শুধু শিক্ষণীয় নয়, সেটাই শিক্ষার মাধ্যম। বাংলা শিখতে চাও শেখ, কিন্তু মনে থাকে যেন ওটা হিন্দুর ভাষা, ওর গায়ে পৌত্তলিকতার গন্ধ লেগে রয়েছে। ওকে শুদ্ধ করতে হলে ওর সঙ্গে বিস্তর আরবী ফারসীর মিশোল দিতে হবে। ওকে আবার আরবী হরফেও লিখতে হবে। আরবী নাকি হরফ-উল কোরান। কোরানের হরফ। পশ্‌তু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী যদি আরবীতে লেখা হয় তবে বাংলাই বা আরবীতে লেখা হবে না কেন?

কর্তারা স্থির করে ফেললেন যে উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার প্রমাণ পাওয়া গেল মনি অর্ডার ফর্মে, দশটাকা পাঁচটাকা একটাকার নোটে। ব্রিটিশ আমলে বাংলাও ছিল, পাকিস্তানী আমলে বাংলা উঠে গেল। সাধারণ লোকের দুরবস্থা।

কার কথা অনুসারে কাজ হবে? কোটি কোটি দেশবাসীর কথা? না মুসলিম লীগ দলপতিদের কথা? এঁদের যুক্তি হলো একটাই মুসলিম নেশন, একটাই মুসলিম রাষ্ট্র, এক আল্লা, এক রসুল, এক কোরান, এক হরফ-উল কোরান, এক রাষ্ট্রভাষা। সে ভাষা কি সংখ্যাগুরু বাঙালীর ভোটে বাংলা হতে পারে? না, বিনা ভোটেই উর্দু হতে হবে। যেহেতু উর্দু হচ্ছে মুসলমানদের ভাষা, মুসলিম ভাষা, আরবীর নিকটতর ভাষা, ইসলামী ধর্মগ্রন্থ উর্দুতেই বেশী লেখা হয়েছে। একাধিক রাষ্ট্রভাষা পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন।

"কেন? এক রাষ্ট্রের কি একাধিক রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না? কানাডা, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষা আছে।" জনাব তোয়াহা নিবেদন করেন।

"কে বলল কানাডায় সুইটজারল্যাণ্ডে একাধিক রাষ্ট্রভাষা? মোটেই তা নয়।" কায়দে আজম ঝীণা সাহেব বেবাক অস্বীকার করেন।

"একাধিক রাষ্ট্রভাষার কথা একটি ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই সেই সত্যকে আপনি কী ভাবে অস্বীকার করতে পারেন?" মহম্মদ তোয়াহা তর্ক করেন।

"আমি ইতিহাস পড়েছি। আমি এসব জানি।" উষ্মার সঙ্গে উত্তর দেন কায়দে আজম ঝীণা।

এর নাম একনায়কত্ব। এর নাম গণতন্ত্র নয়। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরণের ফতোয়া বা ফারমান জারী করার কথা আছে। কিন্তু যুগটা আধুনিক। এ যুগে অধিকাংশ লোকের মত অগ্রাহ্য করা চলে না। এই প্রশ্নে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও দ্বিমত ছিল। যাঁরা ইসলামী সংহতির অন্ধ সমর্থক তাঁরা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চান। কিন্তু বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বলে অধিকাংশ ছাত্র যে ধূয়া ধরে ২১শে ফেব্রুয়ারী

১৯৫২র পর সেটা অধিকাংশ বাঙালীর সমর্থন পায়। দু'বছর বাদে সেই ইস্যুতেই মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচনে পরাজিত হন।

বোঝা গেল বাঙালী মুসলমান আগে মুসলমান নয়, আগে বাঙালী হয়ে উঠেছে। সে হিন্দুকে আপন জন মনে করে রাখতে চায়, সমান অধিকার দিতে চায়। হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন যাতে উঠে যায় সেবিষয়ে প্রস্তাব পেশ করে। যে সংবিধান ১৯৫৬ সালে রচিত হয় তাতে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনের প্রবর্তন বিধিবদ্ধ হয়। তার মানে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে। হিন্দু মুসলমানকে ও মুসলমান হিন্দুকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিতে পারবে। হিন্দুর ভোটে মুসলমান ও মুসলমানের ভোটে হিন্দু জয়ী হতে পারবে। এমনি করে সাম্প্রদায়িকতার গোড়ায় কোপ মারা হলো।

কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তো? অনুষ্ঠানের মুখেই আয়ূব খান্ ক্ষমতা হস্তগত করে বসেন। সংবিধান পড়ল সাত হাত জলের তলে। পরে আয়ূব স্বয়ং যে সংবিধান জারী করলেন তাতে যুক্ত নির্বাচনই বহাল রইল, কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচন তুলে দেওয়া হলো। ঘড়ির কাঁটা চল্লিশ বছর পেছিয়ে গেল। গণতন্ত্রের এই পরিণাম ইংলণ্ডে বা ভারতে কল্পনা করা যায় না। পাকিস্তানে যে এটা সম্ভব হলো তার কারণ পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হতে গিয়ে ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় আদর্শ থেকে সরে গেছে। অথচ আয়ূব খান্ বলছেন যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল সীসটেম অনুসরণ করছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেসের ও সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সর্বেসর্বা করা হয়নি। আয়ূব খান্ আইন সভাকে পকেটে পুরলেন, ভোটারসংখ্যা কমিয়ে দিয়ে তাদের অধিকাংশকে হাত করলেন। সুপ্রীম কোর্টের অধিকারও আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয় নয়।

যেমন ন্যাশনালিজম তেমনি ডেমক্রাসী কোনোটাই পাকিস্তানে পা পায়নি। আসমানে ঝুলছে। যতবার মাটিতে পা দেয় কেউ না

কেউ এসে শূন্যে চালান করে দেয়। আয়ুবের জায়গায় ইয়াহিয়া এসে গণতান্ত্রিক সংবিধানের আশা দেন। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়েও দেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ফিরিয়ে দেন। যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রাখেন। এক একজন মানুষের এক একটি ভোট প্রবর্তন করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের আসনসংখ্যা বেড়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের কমে যায়। কেন্দ্রীয় পরিষদে বাঙালীরাই হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অভ্যুদয় ঘটেছিল। অটোনমির দাবী তুলে এই দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অথচ মুসলিম লীগের মতো এ দল সর্ব পাকিস্তানব্যাপী নয়।

অটোনমির দাবী মেনে নিলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিষম-ভাবে কমে যায়, মাত্র দুটি কি তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়, এটা কেন্দ্রীয় কর্তাদের অসহ্য। বিশেষত সামরিক গোষ্ঠীর। অপর পক্ষে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ আসন দাবী করে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র ও অর্থ দপ্তর, তা হলে সেটা শুধু কেন্দ্রীয় কর্তা বা সামরিক গোষ্ঠীর নয়, পশ্চিমপাকিস্তানী দলগুলির অধিকাংশেরই অসহ্য।

দুটো দাবীর দুটোই যদি অসহ্য হয় তা হলে তৃতীয় উপায় আর কী থাকে ?. চিরন্তন সামরিক একনায়কত্ব? পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেটা বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু বাঙালীরা করবে কেন? সৈন্যদলে মাত্র দশ পারসেন্ট বাঙালী। সিভিল সার্ভিসে মাত্র পনেরো পার-সেন্ট। পশ্চিমাদের সঙ্গে স্বার্থের মিলও নেই। এরা উপার্জন করে বৈদেশিক মুদ্রা, ওরা ভোগ করে। বিদেশ থেকে উভয় প্রান্তের জন্যে যে সাহায্য মেলে তা ওরাই লুটে নেয়। তা ছাড়া অর্থনৈতিক দোহন তো আছেই। পূর্ব পাকিস্তান একদা ইংরেজের উপনিবেশ ছিল, এখন পাঞ্জাবীর। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় কেউ এটা ভাবতে পারেনি যে যাদের ভোটের ফলে ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে পাকিস্তান

হাসিল হলো তারাই তার ভারবাহী গর্দভ। ইতিহাসে এমন বিশ্বাসভঙ্গের নজীর আছে কী?

তবে কেউ কেউ এটা অনুমান করেছিলেন বলে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে একাধিক মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র নয়। মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রে হিন্দুরও মর্যাদার স্থান থাকতে পারে। লাহোর প্রস্তাব অনুসারে কাজ হলে পাকিস্তান বলতে বোঝাত কেবল পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান বলে কোনো রাষ্ট্র থাকত না। থাকত পূর্ব বাংলা। সে রাষ্ট্র মুসলিম-প্রধান হলেও হিন্দু মুসলমানের উভয়ের বাসভূমি হতো। সেখানে পাঞ্জাবী আধিপত্য থাকত না। সে তার আপনার সংবিধান রচনা করত। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের উপর খোদকারী করে ঝীণা লিয়া-কতের দল বাংলাসমেত একটিমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্যান করেন, যেখানে দরকার হলে সব ভারতীয় মুসলমান একত্র হতে পারবে। যেখান থেকে হিন্দুদের সবাইকে বিদায় দিতে পারা যাবে। এমন এক পাকিস্তানের জন্যে মাদ্রাজ বম্বে বিহার উত্তরপ্রদেশের মুসমানরাও ভোট দেয়। নির্বাচনে জেতার পক্ষে এমন একটি অপূর্ব স্লোগান আর কী হতে পারত? মুসলিম লীগের তো অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের বালাই ছিল না। এক ঢিলে সে কংগ্রেস মুসলিম, কৃষকপ্রজা, ইউনিয়নিস্ট মুসলিম প্রভৃতি অনেকগুলি পাখি মেরে মুসলমানদের একমাত্র দল হয়ে ওঠে। একটিমাত্র পাকিস্তান দাবী করে ও পায়। না ভেবে না বুঝে বাঙালী মুসলমানরাও খাল কেটে কুমীর ডেকে আনে।

৩

সেবারকার আওয়াজ ছিল বাংলাভাষা হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। এবারকার আওয়াজ বংলাদেশ হবে অন্যতম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভাষাবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে দেশবোধ, নেশনবোধ। বাংলাভাষা, বাংলাদেশ, বাঙালী নেশন। ইসলামী সংস্কৃতির উপর আর ঝোঁক পড়ছে না। পড়ছে বাংলা সংস্কৃতির উপর। যে সংস্কৃতি কেবল পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। যার অতীত হিন্দু মুসলমান উভয়ের অতীত।

এ অবস্থা একদিনে হয়নি। গোড়ায় অবাঙালী মুসলমানদের উপর বাঙালী মুসলমানদের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। কায়দে আজম ঝীণা, উজিরে আজম লিয়াকৎ আলী খান্ এঁরা ছিলেন পরম আস্থাভাজন। এমন কি আয়ুব খান্কেও বাঙালী মুসলমানরা প্রথমবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কুমারী ফতেমা ঝীণা। অধিকাংশ বাঙালী মুসলমান আয়ুবকে না দিয়ে কুমারী ফতেমাকে ভোট দেয়, আয়ুব জিতে যান প্রধানত অবাঙালী ভোটে। তখন থেকেই বাঙালী মুসলমানরা বুঝতে পারে যে তাদের ইচ্ছার উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে না। নির্ভর করে অবাঙালীদের ইচ্ছার উপর। ওরা যাকে জিতিয়ে দিতে চাইবে তিনিই জিতবেন।

ততদিনে প্রধানমন্ত্রী পদটি খারিজ হয়েছে। আয়ুব কোনো শরিক পছন্দ করেন না। তিনি নিজেই কয়েকটা দপ্তর পরিচালনা করেন। তাঁর পছন্দমতো তিনি উচ্চতম পদ দেন। গভর্ণর করেন তাঁর বাছাই করা লোকদের। তাঁর সভাসদ আর গভর্নরদের সভাসদ সবাই তাঁর আস্থাভাজন। আপোজিশন বলতে বিশেষ কেউ নেই।

এইভাবে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি

করাচী ছেড়ে ইসলামাবাদে রাজধানী সরিয়ে নেন। এক চোখ রাখেন রাওয়ালপিণ্ডির আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের উপরে। আরেক চোখ কাশ্মীরের উপরে। তৃতীয় চক্ষু থাকলে তো পূর্ব পাকিস্তানের উপরে রাখবেন। ক্ষমতা যেমন ইসলামাবাদের সিভিল ও মিলিটারি কর্তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় ঐশ্বর্য তেমনি করাচীর ধনকুবেরদের হাতে। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য এই দুটোই তো মুখ্য পুরুষার্থ। দুটোর একটাও বাঙালীর ভাগ্যে জুটল না। অন্তত নৌবহরটার হেডকোয়ার্টার্স হোক পুবদিকে। চট্টগ্রামে। অন্তত দ্বিতীয় রাজধানী হোক ঢাকায়। না, ওসব হবে না। এর একটাও যদি হতো বাঙালী অত সহজে বিদ্রোহী হতো না। বেশ বোঝা গেল যে পশ্চিম পাকিস্তানটাই মাথা, পূর্ব পাকিস্তানটা লেজুড়।

গোড়ায় এরকম কোনো কথা ছিল না। তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের আসনসংখ্যা কম। পূর্ব পাকিস্তানীদের আসনসংখ্যা বেশী। সেখানে বাঙালীরাই মেজরিটি। সংবিধানসভাতেও তাই। মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারি পার্টিতেও তাই। মুসলিম লীগ সংবিধানসভা পার্টিতেও তাই। অথচ দেখা গেল মাথা ওরা নয়। ওরাই লেজুড়। এমন হীনমন্যতা ইতিহাসে অতুলনীয়। ফজলুল হক সাহেব ও তাঁর দলবল থাকলে কি এমনটি হতো? না, বোধহয়। এমন কি সুহরাবর্দী সাহেব ও তাঁর দলবল থাকলেও হতো না। ঝীণা ও লিয়াকৎ আলী ও তাঁদের পার্শ্বচররা আর সবাইকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিলেন। তাছাড়া আমার সন্দেহ হয় যে বাঙালী মুসলিম মানসিকতায় একটা অহেতুক পশ্চিমা প্রেম ছিল। ওরাই সাচ্চা মুসলমান। ওদের মধ্যে যত সৈয়দ আছে যত পীর আছে এদের মধ্যে কোথায়? ওরাই তো মক্কার নিকটতর। বোধহয় বেহেস্তেরও নিকটতর। নিজেদের বাঙালী না ভেবে মুসলমান ভাবলে এইরকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

তাছাড়া এটাও বোধহয় মনের উপর কাজ করছিল যে পাকিস্তান তো ওদেরই আইডিয়া, যদিও তার জন্যে ভোট বেশী পড়েছে বাংলাদেশে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরও প্রধান ও প্রথম ঘাঁটি কলকাতা। সত্যের খাতিরে এটাও স্বীকার করতে হবে যে পাকিস্তানের জনক যেমন ঝীণা পালনকর্তা তেমনি পাকিস্তান আর্মি। আর্মি যদি ভারতের উপর দরকার হলে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তবে পূর্ববাংলাকে বাঁচাবে কে? ভারতই তো পয়লা নম্বর শত্রু। অতএব পশ্চিমাদের কাছে হাত জোড় করে থাকতে হবে। যেমন আরো একদল পশ্চিমার কাছে হাত জোড় করে থাকতে হতো স্বাধীন হওয়ার আগে।

প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতার স্বাদ পূর্ব পাকিস্তানীরা কোনোদিনই পায়নি। পেয়েছে পাঞ্জাবীরা। সিন্ধী ও গুজরাতী বেনেরাও পেয়েছে। এক গোষ্ঠীর পীঠস্থান ইসলামাবাদ, আরেক গোষ্ঠীর পীঠস্থান করাচী। পাকিস্তান বলতে সত্যি যা বোঝায় তা ওই তুটি পীঠস্থান। পূর্ব পাকিস্তান আসলে তাদের উপনিবেশ। এ জ্ঞান যাদের জন্মেছে তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছয় দফা কর্মসূচী ও এগারো দফা কর্মসূচী রচনা করেছে। পুরোপুরি স্বাধীনতা চায়নি, চেয়েছে আধাআধি স্বাধীনতা। পুরোপুরি স্বাধীন হতে চাইলে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হতো না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। যদিও একদল ছিল যারা নির্বাচনে বিশ্বাস করত না। করত সশস্ত্র সমরে। তার জন্যে অপেক্ষা করলে একূল ওকূল তুকূল যেত। অত অস্ত্র কোথায়? চীন থেকে বন্দুক আসবে, বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা আসবে, এসব যুক্তি যাদের মুখে তারা কি জানে না যে বন্দুক সব চেয়ে বেশী আর্মির হাতে? বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা যদি আসে তো সে ক্ষমতা তাদের হাতেই আসবে।

রাজনৈতিক বস্তুজ্ঞান যাঁদের ছিল তাঁরা সকলেই বুঝতেন যে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা এক কিস্তিতে হবার নয়। হবে তুই কিস্তিতে। প্রথম কিস্তিতে অটোনমি। দ্বিতীয় কিস্তিতে ইণ্ডিপেনডেন্স। তাঁদের

ধারণা ছিল প্রথম কিস্তির জন্যে লড়তে হবে না। লড়াই যা তা সংবিধান সভাতেই হবে। ভোটের জোর তো বাঙালীদেরই বেশী। সিন্ধী, বেলুচি, পাঠানরাও তো অটোনমি চায়। ওরাও বাঙালীদের সঙ্গে ভোট মেলাবে। অমনি করে যদি তুই-তৃতীয়াংশ ভোট জোটানো যায় তবে তো কেল্লা ফতে। রক্ত দিতে হবে কেন? ব্যাপারটা তো জলের মতো সোজা।

কোনো রকমে একটা সংবিধান পাশ করিয়ে নিলেই ক্ষমতার হস্তান্তর হয় এটা একটা মোহ। ইংরেজরা তো পরিষ্কার বলে দেয় যে মুসলিম লীগের অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস যদি একটা সংবিধান পাশ করিয়ে নেয় তা হলে তারা ওটা অনিচ্ছুক প্রদেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেবার দায়িত্ব নেবে না। অর্থাৎ তা নিয়ে যদি লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায় তারা সেটা থামাবার দায়িত্ব নেবে না, তার আগেই পৃথক পৃথকভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর করে চলে যাবে। হলোও পৃথক পৃথকভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। সংবিধান রচনা শিকেয় তোলা রইল। ব্রিটিশ অপসরণের পর শিকে থেকে নামানো হলো।

আগে সর্বসম্মত সংবিধান রচনা, তার পরে ক্ষমতার হস্তান্তর, এটা ১৯৪৭ সালেও হয়নি, এটা হবার নয়। ইয়াহিয়া খান্ ফরমাস দেন সর্বসম্মত সংবিধান রচনার জন্যে ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে একমত হতে হবে। সেবার যেমন ফরমাস দেওয়া হয়েছিল ঝীণা সাহেবের সঙ্গে একমত হতে হবে। ভুট্টো সাহেবই এবারকার ঝীণা সাহেব ঠিক ঝীণা সাহেবের মতো তিনি সংবিধান সভায় অনুপস্থিত থাকার চাল তো চাললেনই, উপরন্তু খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের হুমকি দেখালেন। ইয়াহিয়া খান্ অনির্দিষ্টকালের জন্যে পেছিয়ে দিলেন সভার তারিখ। জানতেন না যে দশরথের মতো কৈকেয়ীর কথায় রামের যেদিন রাজা হবার কথা সেদিন জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করলেন।

অযোধ্যার লোক সহ্য করেছিল, পূর্ববাংলার লোক সহ্য করেনি

তারা জ্বলে উঠেছে। অভূতপূর্ব হরতাল, অভূতপূর্ব অসহযোগ, অভূতপূর্ব শাসনব্যবস্থার উপর নির্বাচিত জননায়কের নির্দেশ। ম্যাজিক, ম্যাজিক, সবটাই যেন ম্যাজিক। কিন্তু দেশে একটার জায়গায় দুটো অথরিটি দেখা দেয়। একটা তো মিলিটারি, অপরটা সিভিল। কোথাও সিভিলের উপর মিলিটারি থাকে, কোথাও মিলিটারির উপর সিভিল। পূর্ববাংলায় দেখা গেল পাশাপাশি সিভিল তথা মিলিটারি, কেউ কারো অধীন নয়। এর আয়ুষ্কাল বেশিদিন হতে পারে না, হলে আপনা থেকেই সংঘাত বেধে যায়।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের সতর্ক করে দিয়ে যান যে এরপর মিলিটারি পাওয়ারের সঙ্গে সিভিল পাওয়ারের সংঘর্ষ বাধতে পারে। সেই সময় থেকে আমরা সতর্ক রয়েছি। সিভিল পাওয়ার দুর্বল হলে বা দ্বিধাগ্রস্ত হলে মিলিটারি পাওয়ার তাকে তাঁবেদার করবেই। পাকিস্তানে তাই হয় স্বাধীনতার দশ বছর বাদে। তখনি বোঝা যায় যে ভারতের সঙ্গে বল কষাকষি করতে গিয়ে পাকিস্তান তার মিলিটারিকে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো অনাবশ্যক বাড়তে দিয়েছে। অপর পক্ষে মুসলিম লীগের পতনের পর তার শূন্যতা পূরণ করার মতো একচ্ছত্র দল গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন দলের জোড়াতালি তার বিকল্প নয়। মিলিটারি তার সুযোগ নিয়ে একচ্ছত্র হয়েছে। মুসলিম লীগের শূন্যতা পূরণ করেছে।

পাওয়ার ভ্যাকুয়াম পূরণ করার প্রয়োজন ছিল বইকি। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে তিন হাজার মাইল জলপথের ব্যবধান। ভারতের উপর দিয়ে আকাশপথে যাতায়াত সম্ভব না হলে পাকিস্তান কখনো একটি কেন্দ্র থেকে শাসন করা যায় না। সেই একটি কেন্দ্র যে প্রান্তেই হোক সেটা একটা প্রান্তীয় কেন্দ্র, সেটা একটা জাতীয় কেন্দ্র হতে পারে না। গঠনের দিক থেকে পাকিস্তান গোড়া থেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। তার সংবিধান কিছুতেই রচিত হয় না। কে বড়ো কে

ছোট দুই প্রান্তের মধ্যে এই নিয়ে অনন্ত তর্ক। প্যারিটির ফরমুলা দিয়ে এর একটা ফয়সালা হলো তা ঠিক, কিন্তু প্যারিটি হলে ব্যালান্স অফ পাওয়ারের প্রশ্ন ওঠে। পূর্ব আর পশ্চিম উভয়ের মাথার উপর কেউ না থাকলে ব্যালান্স রক্ষা করবে কে? ক্যাবিনেটে পাঁচজন মন্ত্রী যদি একদিকে যান ও পাঁচজন অপরদিকে তা হলে কাদের কথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? কাস্টিং ভোট কার হাতে? এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতা চলে যায়। তিনি যে প্রান্তের হবেন সেই প্রান্তই বলতে গেলে কাস্টিং ভোটের মালিক। আয়ুব খান্ জোর করে রাষ্ট্রপতি হন। ইয়াহিয়া খান্ও জবরদস্তি করে তাঁর আসনে বসেন। আর্মি যার তাঁবে থাকবে সেই আর সবাইকে তাঁবেদার বানাবে। পশ্চিম পূর্বকে।

পাকিস্তানের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ অবাস্তব। তার ক্যাবিনেটে কোনোদিনই বাঙালী মেজরিটি হবে না। যদি হয় তা হলে মাথার উপরে থাকবেন পশ্চিমা প্রেসিডেন্ট! তিনি বরাবরই নিজের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা রেখে দেবেন। দরকার হলেই খাটাবেন। বাঙালী প্রধানমন্ত্রী তাঁবেদারে পরিণত হবেন। আর সেই প্রেসিডেন্টও হবেন আর্মির মনোনীত বা আস্থাভাজন ব্যক্তি। নয়তো আর্মি আর কাউকে মানবে না। আর কারো কাছ থেকে হুকুম নেবে না।

শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের অধ্যক্ষতায় প্রধানমন্ত্রী হতে রাজী হলে তো কোনো গোলমালই বাধত না। সেটা কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তর হতো না। তাই রাজী হননি। ইয়াহিয়া খান্ সিভিল পাওয়ার হস্তান্তর করলেও মিলিটারি পাওয়ার হস্তান্তর করতেন না। তাঁর সেনাপতিরাই তাঁকে করতে দিতেন না। শেখ মুজিব বাঙালী না হয়ে পশ্চিমা হলেও মিলিটারি পাওয়ার পেতেন না। ওটা বোধহয় চিরকালের মতো আর্মির কুক্ষিগত হয়ে গেছে। যদি না কোনো এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরাজয় ঘটে।

অমন যে সর্বশক্তিমান পাকিস্তান আর্মি তার অথরিটি অমান্য করে

সিভিল অথরিটি হস্তগত করলেন কিনা আওয়ামী লীগ দলপতি শেখ মুজিব। মিলিটারি আর সহ্য করতে না পেরে ২৫শে মার্চ রাত্রে সিভিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিভিল পপুলেশনের উপর। মুদ্গর দিয়ে এমন এক প্রচণ্ড প্রহার হানে যে, একরাত্রেই তেইশ বছরের মোহভঙ্গ হয়। পরের দিন মোহমুক্তরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুখের মতো জবাব দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

ইয়াহিয়া খান্ যার সঙ্গে লড়ছেন সে কোনো একজন ব্যক্তি বা কোনো একটি দল নয়। তার নাম বাংলাদেশের সিভিল পপুলেশন। তাঁর লড়াই সাড়ে সাত কোটির সঙ্গে। হয় এরা জয়ী হবে, নয় এরা দাস হবে। মধ্যপন্থা নেই। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ অবাস্তব। এখন থেকে ভাষার ভিত্তি মেনে নিতে হবে। তা মেনে নিলে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের সংসার থেকে বিদায় দিতে হয়। পাকিস্তানের সংসার বরাবরের মতো ধর্মভিত্তিক। ধর্মের ভিত্তি বর্জন করলে পাকিস্তানই বিলীন হয়। কেউ কখনো স্বেচ্ছায় অত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি?

পাকিস্তান থাকবে। বাংলাদেশও থাকতে এসেছে। ওদের এখন অদ্বৈতবাদী না হয়ে দ্বৈতবাদী হতে হবে। ভাষভিত্তিক বাংলাদেশ ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানের তাঁবেদার হতে রাজী হবে না, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানও ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশের প্রভুত্ব স্বীকার করবে না। কিন্তু উভয়েই সহ-অবস্থান করতে পারে। সহ-অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে। বাঙালীরা পাঞ্জাবীদের বাসভূমিতে গিয়ে তাদের নিকাশ করেনি, করবেও না। বাঙালীদের গোলাগুলী থেকে পাঞ্জাবীদের মৃত্যুভয়ের কারণ নেই। কিন্তু পাঞ্জাবীদের গোলাগুলী থেকে বাঙালীদের মৃত্যুভয়ের কারণ আছে ও চিরকাল থাকবে। এরা কখনো এক নেশন হতে পারে না। এতদিন যে এক নেশন হয়েছিল সেটা মোহে পড়ে। মুদ্গর দিয়ে সেই মোহ ভঙ্গ করা হয়েছে। মিলিটারি অ্যাকশন হচ্ছে মোহমুদ্গর।

পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের বাইরে গেছে এতে আমি আশ্চর্য হইনি। পঞ্চাশ বছর আগেও আমি আশঙ্কা করেছি স্বাধীন ভারত তার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে বাগ মানাতে পারবে না, খোদ মুঘলদেরও বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলা বরাবরই ভারতের অঙ্গ। সে যদি চায় স্বাধীন হতে পারে। তারও নজীর আছে। কিন্তু পাঞ্জাবের সঙ্গে একজোট হবার নজীর নেই ইতিহাসে বা ভূগোলে। একজোট হবার পরে সেও মধ্যপ্রচ্যের শামিল হয়ে গেছে। মানতে বাধ্য হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য। সে ঐতিহ্য ন্যাশনালিজমেরও নয়, ডেমক্রাসীরও নয়। আধুনিক কালেরও নয়। মধ্যযুগের।

মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যযুগ মিলে এই তেইশ বছরে পূর্ব বাংলায় যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। এই মোহমুদ্গর যদি মধ্যপ্রাচ্যের ও মধ্যযুগের মোহ ভঙ্গ করে থাকে তবে এতে কল্যাণ হবে। বিধাতা এমনি করেই শিক্ষা দেন।

পূর্ববাংলার সাহিত্যিক ও ইনটেলেকচুয়ালরা দলে দলে এপারে চলে এসেছেন। তাঁদের উপরেই রাগটা বেশী। কারণ তাঁরাই সকলের আগে মোহমুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মোহমুক্তি একদিনে ঘটেনি, দিনে দিনে ঘটেছে। সেই ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, সেই সঙ্গে মধ্যযুগের। তবে পাকিস্তানের মোহ কাটাতে পারেননি। সে মোহ এইবার ভেঙেছে।

কিন্তু দেশের সাহিত্যিক ও ইনটেলেকচুয়ালরাই কি দেশের জনগণ? তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কি নিশ্চিত বোঝা যায় যে পূর্ববাংলার জনগণ মধ্যপ্রাচ্য তথা মধ্যযুগের মানসিক কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছে? বহুকাল যোগাযোগ নেই, তাই ঠিক বলতে পারছিনে গত তেইশ বছরে তাদের কী পরিমাণ মানসিক বিবর্তন ঘটেছে। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যযুগের সঙ্গে যদি তাদের নাড়ীর টান অটুট

থাকে তবে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে তাদের বাঁচাবে কে? পাকিস্তানের সঙ্গে তারা লড়বে কিসের জোরে?

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্তরের চেয়ে আরো গভীর স্তর হচ্ছে সাংস্কৃতিক স্তর। তার চেয়েও আরো গভীর স্তর আছে। ধার্মিক স্তর। পাকিস্তান আর সব স্তরে হটে গেলেও ধার্মিক স্তরে হটবে না, যদি সাধারণ লোকের মন ধর্মের দোহাইতে ভোলে। পাকিস্তান ভেঙে গেলে ইসলাম বিপন্ন হবে, পাকিস্তান দুর্বল হলে ইসলাম দুর্বল হবে, এই যদি হয় জনমানসের ধারণা তবে পাকিস্তান তার পূর্ণ সুযোগ নেবে। ইয়াহিয়া একথা জানেন বলেই নিজের জয় সম্বন্ধে পরম নিশ্চিন্ত। তাঁর কাছে একটা ধর্মযুদ্ধ। হিন্দুঘেঁষাদের বিরুদ্ধে। হিন্দুদের বিরুদ্ধেও। সেই সূত্রে ভারতের বিরুদ্ধেও হতে পারে।

সাহিত্যিক ও ইনটেলেকচুয়ালদের কাজ জনগণের মধ্যে। তাদের থেকে বিযুক্ত হয়ে নয়। বহুকাল ধরে বিভ্রান্ত জনগণ সহজেই মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর প্রচারণার শিকার হবে, প্রচারণা যে প্রতারণা সেটা ধরতে পারবে না। যুদ্ধ কেবল সৈনিকরাই করে না। করে প্রচারকরাও। ইয়াহিয়া খানের শিবিরে ইসলামী প্রচারকদের সমাবেশ ঘটেছে। বাঙালী ন্যাশনালিজম ইসলামী ধর্মান্ধতার সঙ্গে মোকাবিলা না করে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করবে কী করে?

ভারতে ইসলাম ?

ইতিহাস রচয়িতারা ব্রিটিশ আমলকে খ্রীস্টান যুগ বলে চিহ্নিত করেন না। অথচ তার পূর্ববর্তী আমলদুটিকে একসঙ্গে জড়িয়ে মুসলিম আমল বলে চিহ্নিত করেন। আবার সেইরকম আরো একটি আমলকে হিন্দু যুগ বলে চিহ্নিত না করে মুসলিম যুগেরই অন্তর্গত করে দেখান। আমি মরাঠা আমলের কথা বলছি। মরাঠারাও শতাব্দী জুড়ে রাজত্ব করেছিল। তাদের অধীনস্থ এলাকা মুঘলদের মতো বৃহৎ না হলেও পাঠান বা তুর্কদের তুলনায় বৃহৎ।

ইতিহাস যখন নতুন করে লেখা হবে তখন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ওই যুগবিভাগটিরও পুনর্বিন্যাস করতে হবে। প্রথমে প্রাচীন যুগ, তার পরে হিন্দু যুগ, তার পরে মুসলিম যুগ, তার পরে ব্রিটিশ যুগ এটা একেবারেই অসঙ্গত। ধর্মকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন? আর যদি টেনে আনা হয় তবে খ্রীস্টান কী অপরাধ করল? সে না থাকলে চিত্রখানি পূর্ণাঙ্গ হবে কেন?

তাকে সঙ্গত কারণেই বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ইংরেজরা এদেশে ইংরেজ হিসেবেই এসেছিল, খ্রীস্টান হিসেবে নয়। অপরাপর খ্রীস্টান নেশনকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আর এদেশের লোক খ্রীস্টান হলেও তাদের কোল দিত না। তফাতে রাখত। তাই যদি হয় তবে পাঠান বা তুর্করাও কি অন্যান্য দেশের মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঠেকাত না? এদেশের লোক মুসলিম হলেই কি তাদের কোলে তুলে নিত?

না, সেসব আমল মুসলিমশাসিত হলেও আসলে পাঠান বা তুর্কি আমল। তার পরে মুঘল আমল। সমসাময়িকরা সেইভাবেই নামকরণ করতেন। বলতেন সুলতানী আমল, বাদশাহী আমল,

নবাবী আমল। মুসলিম যুগ তাঁদের মুখের কথা নয়। তাঁদের পরবর্তী ঐতিহাসিকদের লেখনীমুখের কথা। এতে সত্যের অপলাপ তো হয়েছেই, পাঠকদের মনে ভুল ধারণা জন্মানোর ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। কেউ খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করলেই রাজার জাতির অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু যারা ইসলাম অবলম্বন করেছিল তাদের বংশধরদের এমন কথা মনে হতে পারে যে তারাও এককালে রাজার জাতির সামিল ছিল। এই অহেতুক রাজবংশীভাব প্রতিবেশীর প্রতি অবজ্ঞার হয়ে দাঁড়াতে পারে। গত শতাব্দীর শেষভাগে পেশাওয়ার অঞ্চলের এক মুসলিম সামন্ত বলেছিলেন, "কী! আমরা হব কিনা আমাদের ক্রীতদাসদের ক্রীতদাস!" কথাটা কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে বলা। এর পরে তো প্রভুর জাতি মুসলিম লীগ স্থাপন করে কংগ্রেসের সঙ্গে রেষারেষি শুরু করে দেন। ব্রিটিশ আমল যদি খ্রীস্টীয় যুগ হতো তা হলে খ্রীস্টান লীগও আর একটি শিবির সৃষ্টি করত।

ব্রিটিশ ভারতের আদি অন্ত বুঝতে হলে ব্রিটেনের ইতিহাসও পড়তে হয়। ব্রিটিশ ভারত ছিল একই কালে ব্রিটিশ তথা ভারত। আর ব্রিটিশ বলতে শুধু কয়েকজন লাট বড়লাট বা সিভিল সার্ভাণ্ট বা গোরা সিপাহী বা সওদাগর বোঝাত না। ব্রিটিশ ভারতের দুই শতাব্দী খাস ব্রিটেনেরও দুই শতাব্দী। ওখানকার ঢেউ এখানে, এখানকার ঢেউ ওখানে প্রতিনিয়ত আনাগোনা করত। ইংরেজ আমল যেমন তার পূর্ববর্তী আমলের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না তেমনি ব্রিটেনের সমসাময়িক পরিস্থিতির থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল না। একটাকে না জানলে আরেকটাকে জানা শক্ত। দুই দেশের ইতিহাস পাশাপাশি রেখে পড়তে হয়।

একবার এক রুশদেশীয় পণ্ডিতের সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হয়। তিনি বলেন তিনি মঙ্গোলীয় জাতির ইতিহাস রচনায় নিবিষ্ট। তাঁর মতে ভারতের মুঘল আমলের প্রথম তিনটি রাজত্ব মঙ্গোলীয় জাতির

ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোলীয়দের না জানলে ভারতের আদি মুঘলদের জানা যায় না। আদি মুঘলদের না জানলে মঙ্গোলীয়দের জানা যায় না। ভারত ও মঙ্গোলিয়া দৃশ্যত বিচ্ছিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন ছিল না। মঙ্গোলীয়রা মধ্য এশিয়া জুড়ে বসেছিল। তাদেরই একাংশ তুর্ক বলে পরিচিত। তুর্ক থেকে তুর্কিস্থান। ভারতের ঠিক উত্তরেই সে দেশ। কাবুলকে তখনকার দিনে ভারতের অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হতো। নাদির শা তাকে ভারতের থেকে আলাদা করে দেন। সেই অবধি কাবুল বা আফগানিস্থান ভারতের বাইরে। যেমন ইদানীং পাকিস্তানও ভারতের বাইরে। কিন্তু বাবর, হুমায়ুন, আকবরের সময় কাবুলও ছিল ভারতের অঙ্গ। আর তুর্কিস্থান বা তার অন্তর্গত রাজ্যগুলি ভারতের অব্যবহিত উত্তরে অবস্থিত। কখনো মঙ্গোলিয়ার ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে সম্প্রসারিত হয়েছে, কখনো ভারতের ইতিহাস মঙ্গোলিয়ায় সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগে।

যে অধিকারে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে সম্প্রসারিত হয় সেই অধিকারেই ইসলাম ভারতের ভিতরে সম্প্রসারিত হয়। ইসলামের আগমন আরবদের সিন্ধুবিজয়েরও পূর্বেকার ঘটনা। ধর্মের সম্প্রসারণের ইতিহাস ও রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস একই জিনিস নয়। তেমনি বাণিজ্যবিস্তারের ইতিহাস। ইসলামের প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই আরব বণিকরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় বণিকরাও আরবদেশের সঙ্গে। প্রথমে বাণিজ্য, তারপরে ধর্ম, তারপরে রাজত্ব আরবদের বেলা এই হলো পরম্পরা। ইংরেজদের বেলা প্রথমে বাণিজ্য, তারপরে রাজত্ব, তারপরে ধর্ম।

যা বলছিলুম। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস যেমন ব্রিটেনের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত, মুঘল ভারতের ইতিহাস যেমন মঙ্গোল জাতির ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত তুর্কি ভারতের ইতিহাস তেমনি তুর্কিস্থানের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতের তথাকথিত মুসলিম

যুগের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ভারতের বাইরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তুর্ক ও মুঘলরা যে ভারতে এসে রাজ্য বিস্তার করল এটার সঙ্গে তাদের নতুন ধর্মের সম্বন্ধ কতটুকু? তাদের আগেও তো তো মধ্য এশিয়া থেকে অমুসলিম শক হুনরা আক্রমণ করেছিল। তখন তো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ওঠেনি। প্রকৃত সত্য কি এই নয় যে তুর্ক ও মুঘলদের আক্রমণও সেই জাতীয় আক্রমণ? কার কী ধর্ম সেটা অপ্রাসঙ্গিক। পরেও তো পর্তুগীজ ফরাসী ইংরেজরা আক্রমণ করে। ধর্মের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! ধর্ম সেখানেও অপ্রাসঙ্গিক।

বহুলোক মুসলমান হয়ে যাবে, ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে, তার ফলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধে যাবে, পরে সেটা স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হবে, এসব কি মহম্মদ ঘোরী বা ভারতের আদি সুলতানরা কল্পনা করতে পেরেছিলেন? না, ইংরেজরাও কল্পনা করেনি যে খ্রীস্টধর্মের এই পরিমাণ বিস্তার ঘটবে। ব্রিটিশ রাজত্ব যদি আরো তিন চারশো বছর টিকে থাকত, ইংরেজরা যদি এদেশে বসবাস করতে মনঃস্থ করত, তা হলে খ্রীস্টীয় সমাজও বাড়তে বাড়তে মুসলিম সমাজের মতো বৃহৎ হতো, তার সঙ্গেও অপরাপর সমাজের বিরোধ বেধে যেত।

যেখানে একটি ধর্ম একচ্ছত্র ছিল সেখানে আর একটি ধর্ম এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বিরোধের সম্ভাবনা থাকবেই। ইউরোপের তুলনায় ধর্মগত বিরোধ মধ্যযুগের ভারতে এমন কিছু বেশী ছিল না। জার্মানীর ত্রিশবছরের যুদ্ধের মতো যুদ্ধ ভারতের মাটিতে কেউ দেখেনি। সেইজন্যে এককালে আমার ধারণা ছিল যে আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াটা ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্টের ঝগড়ার মতো তীব্র নয়। মধ্যযুগেই যদি অনর্থের পরিমাণ এত অল্প হয়ে থাকে তবে আধুনিক যুগে ওর চেয়ে এমন কী বেশী হবে? কিন্তু দেখা গেল ভারতের আধুনিক যুগটাই তার মধ্যযুগ। চব্বিশ বছর

আগে পাঞ্জাবে যা ঘটে গেল এখনো পূর্ব বাংলায় তার জের চলেছে। আশি লক্ষ শরণার্থীর মধ্যে ষাট লক্ষই নাকি হিন্দু। যে আগ্নেয়গিরি তুর্কি আমলে বা মুঘল আমলেও এত বেশী লাভা উদ্‌গীরণ করেনি সে করছে কিনা স্বাধীন আমলে।

তুর্কি বা পাঠান অধিকৃত এলাকার বাইরে বিস্তর হিন্দুরাজ্য ছিল। ধর্মীয় অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দলে দলে হিন্দু সেসব রাজ্যে শরণার্থী হয়নি। মুঘল অধিকৃত এলাকায় বাইরেও হিন্দু রাজ্যের অভাব ছিল না। ধর্মীয় উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সেখানেও দলে দলে হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী হয়নি। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবার নজীর মধ্যযুগের রক্তাক্ত কাহিনীতেও মেলে না। এক মহম্মদ তুঘলক নাকি মানুষ শিকার করতেন। তাই প্রজারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচত। কিন্তু তারা ধর্মনির্বিশেষে পালাত।

মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ আমলে প্রজারা যেমন নিরস্ত্র ছিল তুর্কি বা মুঘল আমলে তেমন ছিল না। লোকের হাতে অস্ত্র ও প্রাণে সাহস ছিল। আহির, গুজ্জর, জাঠ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতকে ধর্মের জন্যে খোঁচালে তারাও বিদ্রোহী হয়ে প্রতিশোধ নিত। বিদ্রোহের অধিকার তো বরাবর ছিলই। বিদ্রোহ মাঝে মাঝে ঘটতও। কিন্তু ধর্মের জন্যে নয়। ধর্মের জন্যেও ঘটল অনেক পরে, যখন শিখরা উপায়ান্তর না দেখে কৃপাণ হাতে নিল। ও জিনিস গোড়ার দিকে ঘটলে তুর্কি রাজত্ব কায়েম করাই দুষ্কর হতো। সেকথা ভেবে সুলতানরা তাঁদের ধর্মান্ধতাকে সীমার মধ্যে রাখেন। কয়েকটা মন্দিরভঙ্গ, মূর্তিভঙ্গ করেই তাঁরা ক্ষান্তি দেন। এ ছাড়া আর একটা কর্ম ছিল জিজিয়া কর আদায়। সেটা প্রজামাত্রের উপরে ধার্য কর নয়, হিন্দু প্রজাদের উপর।

জিজিয়া প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে হিন্দুরা তো রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে অস্ত্র ধারণে বাধ্য নয়, মুসলিমরাই বাধ্য। জিজিয়া হচ্ছে কনস্ক্রিপশন থেকে অব্যাহতির দরুণ খেসারৎ। এ যুক্তির

মূলে ছিল এই প্রত্যয় যে তুর্কি রাষ্ট্র ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। একালের সেকুলার স্টেট নয়। সেকুলার স্টেট বিবর্তিত হয় আধুনিক যুগের ইউরোপে ও আমেরিকায়। মধ্যযুগের তুর্কি রাষ্ট্রের কাছে ওটা প্রত্যাশা করাই ভুল। ওদের জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় ততদূর পৌঁছয়নি। সেকুলার রাষ্ট্রের জ্ঞান হিন্দুদেরও ছিল না। হিন্দু রাষ্ট্রকে বলা যেতে পারত ধর্ম বিষয়ে সহনশীল রাষ্ট্র। পরে তুর্কি রাষ্ট্রও সহনশীল রাষ্ট্র হয়। মুঘল রাষ্ট্র তো রীতিমতো উদার। রাজপুতরাই সে রাষ্ট্রের স্তম্ভ। হাজার বছরের মধ্যে অত বড়ো একটা সাম্রাজ্য চালাবার মতো অভিজ্ঞতা কোনো হিন্দুর হয়নি, যেমন হয় আকবরের হিন্দু সেনাপতি ও রাজস্ব কর্মচারীদের। আকবরের রাষ্ট্রকে ভারতের ন্যাশনাল রাষ্ট্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

বিবর্তন আকবরের পরেও সমান তালে চললে সেদিনকার সেই ন্যাশনাল রাষ্ট্রই চিরস্থায়ী হতো। প্রগতি পশ্চাদ্‌গতিতে পরিণত হবার ফলেই ন্যাশনাল রাষ্ট্রের পতন ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। মরাঠারাও যে ন্যাশনাল রাষ্ট্রের মর্ম বুঝত তা নয়। ওদের ওটা হিন্দু রাষ্ট্র।

মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার একটা মানে হয়। অন্যান্য দেশেও মধ্যযুগ ছিল ধর্মান্ধদের দ্বারা উৎপীড়নের যুগ। নইলে ইংলণ্ড থেকে শরণার্থীরা গিয়ে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করত না। তাদের পিছু পিছু যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের উৎপীড়িত শরণার্থীরা। কিন্তু আধুনিক যুগ তো ধর্মান্ধদের দ্বারা উৎপীড়নের যুগ নয়। যেটা মধ্যযুগে ঘটলে মানাত সেটা এ যুগে বেমানান। এ বিষয়ে আরো চিন্তা করতে হবে।

"ইণ্ডিয়ান শব্দটির মতো হিন্দু শব্দটিও ভৌগোলিক বা জাতিবাচক শব্দ হিসেবে ইসলামের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। দেশের নাম হিন্দ, সেইজন্যে দেশের লোকের নাম হিন্দু। সেই থেকে তাদের ধর্মের নামও হিন্দু। তার মধ্যে বৌদ্ধ মতও পড়ে। জৈন

মতও পড়ে। আগন্তুকরা গোড়ার দিকে হিন্দু বলতে জৈন বৌদ্ধ ও বৈদিক সবাইকেই বুঝত। পরে হিন্দু শব্দের সংজ্ঞা সংকীর্ণ হয়ে যায় ও হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের পৃথক করবার জন্যে শব্দটিকে সাম্প্রদায়িক সীমায় নিবদ্ধ করে। তখন হিন্দু বলতে আর ইণ্ডিয়ান বোঝায় না। ইণ্ডিয়ান বলতেও আর হিন্দু বোঝায় না। হিন্দুরাও একটা সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হয়। নেশন থেকে সম্প্রদায়ে পরিণত হবার পরে আর একথা বলা চলে না যে হিন্দু রাষ্ট্র হচ্ছে ভারতের ন্যাশনাল রাষ্ট্র। মরাঠারা আরো এক শতাব্দী রাজত্ব করলেও তাদের রাষ্ট্র ভারতের ন্যাশনাল রাষ্ট্র হতো না।

যেখানে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় চিরকাল বাস করবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র তো একেবারেই অবান্তর, হিন্দু রাষ্ট্রও অর্থবহ নয়। অর্থবহ হতে পারত যদি হিন্দু শব্দের অর্থ না বদলাত। মরাঠাদের ক্ষমতাবিস্তারের পাঁচশো বছর আগেই হিন্দু শব্দটির অর্থান্তর ঘটে যায়। পূর্বতন অর্থে ফিরে যাওয়া এখন সাতশো বছর বাদে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুসলমানরা তো থাকতে এসেছেই, খ্রীস্টানরাও থাকতে এসেছে। হিন্দুরা একাই একটা নেশন ছিল, এখন কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষ। নেশন বলতে এখন বোঝাবে ধর্মমত-নির্বিশেষে ভারতীয়দের। ভারতীয় শব্দটিও আগেকার দিনে প্রচলিত ছিল না, হয়েছে ইণ্ডিয়ান শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে।

দেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও ইতিহাস তো অবিভক্ত ও অবিভাজ্য। হিন্দু যেখানেই থাকুক সে হিন্দুসমাজের অঙ্গ। মুসলিম যেখানেই থাকুক সে মুসলিম সমাজের অঙ্গ। দুই নেশন থিওরি কার্যত দুই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়েছে। দুটি রাষ্ট্রই মিশ্র রাষ্ট্র। গায়ের জোরে তাদের একটাকে ইসলামী বলে চালাতে গেলে কী হয় তা তো পূর্ব বাংলায় দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্রের দিন গেছে। ইসলামকেও তার সেই তত্ত্ব ত্যাগ করতে হবে। আওরংজেব যদি আকবরের কীর্তিকে বিনষ্ট না করতেন তা হলে

ইসলামী রাষ্ট্র আকবরের আমলেই বরাবরের মতো পরিত্যক্ত হতো। বলা বাহুল্য ইসলামও থাকত, রাষ্ট্রও থাকত, থাকত না শুধু ইসলামী রাষ্ট্র। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রকে জুড়ে দেওয়া একদা হয়তো আদর্শ ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে অচল। তুরস্কের মতো দেশও তার মায়া কাটিয়েছে। বাংলাদেশও কাটিয়ে উঠছে।

ধর্মীয় রাজনীতির ছায়া সরে গেলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক চন্দ্রগ্রহণমুক্ত হবে। মুক্ত আলোয় আমরা আমাদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারব।

আমারও মুক্তিযুদ্ধ

প্রথম পর্যায়ে এটা ছিল ওপারের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্ধারিত দিবসে সম্মিলিত হয়ে সংবিধান রচনায় অহেতুক বাধাদানের উত্তরে অহিংস অসহযোগ, তারপর অসামরিক প্রশাসনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। কেউ আমাদের হস্তক্ষেপ চায়নি, আমরাও অনাহূত হয়ে হস্তক্ষেপ করিনি, দূর থেকে তটস্থ হয়ে অবলোকন করেছি, মনে মনে তারিফ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় স্মরণীয় পঁচিশে মার্চ তারিখে। সেদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের কথাবার্তা সফল হতে চলেছে, আজকেই মিটমাট হয়ে যাবে। মিষ্টান্ন আনিয়ে ঘটনাটিকে সেলিব্রেট করব ভেবেছিলুম। কিন্তু রেডিও পাকিস্তান যতবার খুলি ততবার নীরব। বুঝিতে পারিনে কী ব্যাপার। মনটা ভরে যায় উদ্বেগে। কিন্তু কেন উদ্বেগ তাও বলতে পারিনে। রাত্রে শুতে গিয়ে ছটফট করি। কেউ আমাকে জানতে দেয় না কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড চলেছে রাতভোর ঢাকায় ও অন্যান্য শহরে। সকালবেলা যা পড়ি ও যা শুনি তা সম্পূর্ণ অভাবিতপূর্ব। মিলিটারি অ্যাকশন! সেইদিনই রেডিওতে প্রচার করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সেটা আর রেডিও পাকিস্তান নয়। ঢাকা বেতার কেন্দ্র। অভাবিতপূর্ব ও অভিনব সংঘটন। বিপ্লব আর কাকে বলে! বেধে যায় সহিংস সংগ্রাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কি নিষ্ক্রিয় থাকতে চাইলেও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি? নৈতিক সমর্থন জানাই, সীমান্তে গিয়ে সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করি। যদি কেউ সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিতে

চান তবে তাঁর সেই ব্যক্তিগত প্রয়াস অনুমোদন করি, কিন্তু রাষ্ট্র-হিসাবে অপর রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষপ অনুমোদন করিনে। তা করতে গেলে দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে আর যুদ্ধ জিনিসটা ঝোঁকের মাথায় করবার মতো কাজ নয়।

সীমান্তের ওপারে যেসব পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তার খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল। বিদেশী সাংবাদিকরাই প্রকাশ করে দিলেন। ওপার থেকে যাঁরা এপারে এলেন সেই সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে গভীরভাবে বিচলিত হলুম। মানুষ যখন রাক্ষয় হয় তখন রাক্ষসকেও ছাড়িয়ে যায়। আমাদের মনে সন্দেহ রইল না যে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালী জাতিকে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হচ্ছে। যাদের মৃত্যু অবধারিত তারা যদি পাল্টা মার দেয় সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। যারা মরবেও না, মারবেও না, তাদের পালিয়ে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। ভারত ছাড়া কোথায়ই বা তারা যাবে! দেশ ছেয়ে গেল শরণার্থীতে। গোড়ার দিকে যারা এল তাদের অধিকাংশই হিন্দু। বোঝা গেল বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে পাঞ্জাবের অনুরূপ করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হস্তক্ষপ করব না সেটা ঠিক। তা বলে এটাও কি ঠিক যে পাকিস্তানে বাঙালীমাত্রেই হবে সংখ্যা-লঘু, হিন্দুমাত্রেই হবে নির্মূল? এ ধরনের ব্যাপার জার্মানীতে ঘটলে দুনিয়ার লোক প্রতিকার করতে ছুটে যায়, কিন্তু শত আবেদন নিবেদনের পরেও দেখা গেল বিশ্ববিবেক অকর্মক। সকর্মক তা হলে হবে কে? ভারত, আবার কে। কিন্তু কী ভাবে সকর্মক হবে? এই জিজ্ঞাসা আমাদের সবাইকে প্রতিনিয়ত অস্থির করে তোলে। গান্ধী-বাদীরাও বলতে আরম্ভ করেন যে শুধুমাত্র সেবাশুশ্রূষা করে কোনো ফল হবে না। ওপারে গিয়ে লড়তে হবে। অহিংসভাবে সম্ভব না হলে সহিংসভাবে। কিন্তু লড়বে কে? কোথায় অস্ত্র? কোথায় তালিম? কোথায় সংগঠন?

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা গেল যে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরই অস্ত্র জোগাতে হবে, তালিম করতে হবে। সংগঠিত করতে হবে। এসব কাজ ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে করা যায় না। করতে হবে রাষ্ট্রগতভাবে। হাঁ, দরকার হলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে ভারতকে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে মাসের পর মাস কেটে যায়। ততদিনে কয়েক লক্ষ লোক নিপাত। ষাট সত্তর লক্ষ লোক উৎখাত।

এমন সময় শোনা গেল পাকিস্তান বলছে সে যুদ্ধে নামবে, তার পেছনে নাকি অন্যেরা আছে, সে নিঃসঙ্গ নয়। একথা শোনার পর কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে! রাতারাতি সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করতে হলো। না করলে ভারত যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হতো, অক্ষম হতো। পাকিস্তান তার সুযোগ নিয়ে আরো কয়েক লক্ষকে নিপাত করত, আরো চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষকে উৎখাত করত।

রাজনৈতিক সমাধানের আশা অনেকদিন পর্যন্ত দুনিয়াকে নিশ্চেষ্ট রাখে। ক্রমে বোঝা গেল রাজনৈতিক সমাধান বলতে বোঝায় সংখ্যাগুরু রাজনৈতিক দলকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা ও সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্র করে সংখ্যাগুরুতে পরিণত করা। তার জন্যে বহুলোকের নাম কেটে দিয়ে উপনির্বাচনের উদ্যোগ হলো, পরে দেখা গেল উপনির্বাচনমাত্রেই একতরফা। নতুন লোকদের নিয়ে যে সরকার গঠন করা হবে সেটা অসামরিক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সংখ্যালঘু দলগুলির সরকার। এমনতর সরকার কি শরণার্থী-দের অভয় দিতে পারে? বিশেষত যেসব সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল হিন্দুদের উৎসাদনে সহায়তা করেছে ও ভিন্নপন্থী মুসলমানদেরও দেশ থেকে তাড়িয়েছে।

কেবল ভারতের মতে নয়, আরো অনেকের মতে রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষা ও মুক্তি, তারপরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও বোঝাপড়া। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের তফাৎ এইখানে যে ভারতের মতে এটা জরুরি। আর একটা দিনও সবুর

করা চলে না। রাশিয়াও ভারতের সঙ্গে একমত হয়, তবে যুদ্ধে নামতে উৎসাহ দেয় না, বরঞ্চ বেশ কিছু দেরি করিয়ে দেয়। তার যথেষ্ট কারণ ছিল। যুদ্ধ বাধলে বিশ্বযুদ্ধ পরিণত হতে পারে। এত বড়ো দায়িত্ব কি চোখ বুজে নেওয়া যায়?

দেশের লোক হাজারবার বললেও ভারত সরকার পেছপাও হন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে সমস্যাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সফল হলেন কতদূর তা বলা যায় না। তবে এইটুকু হলো যে ফ্রান্সকে ও ব্রিটেনকে নিরাপত্তা পরিষদে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে দেখা গেল। আজকের খবর ফ্রান্স ও ব্রিটেন রাষ্ট্র-সংঘের সাধারণ পরিষদেও নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। পঁচিশে মার্চের মতো স্মরণীয় দিবস ছয়ই ডিসেম্বর। এই তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ ভারতের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন থেকে তৃতীয় পর্যায় শুরু। এখন এটা আর পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। রীতিমতো আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ তো বটেই, উপরন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ।

রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। এ প্রস্তাব মান্য করা উচিত, কিন্তু ভারত পাকিস্তান মান্য করলেও বাংলাদেশ মান্য করবে না; কারণ সে তো রাষ্ট্রসাংঘের সদস্য বা স্বীকৃত রাষ্ট্র নয়। যুদ্ধবিরতির পরের ধাপ তো শান্তিবৈঠক। যে বৈঠকে বাংলাদেশ থাকবে না, শেখ মুজিব থাকবেন না, সে বৈঠক আদৌ বসবে কি না সন্দেহ। কারণ ভারত একবার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পর আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এটা এমন একটা পদক্ষেপ যা প্রত্যাহার করা অসম্ভব।

প্রথম তথা দ্বিতীয় পর্যায় যেমন সরল তৃতীয় পর্যায় তেমন নয়। পাকিস্তানে ইচ্ছা করেই পশ্চিম প্রান্তে আর একটা ফ্রন্ট খুলেছে, যাতে

কাশ্মীরকেও বাংলাদেশের সঙ্গে জড়ানো যায়। ভারত যদি বাংলাদেশে এগিয়ে যায় সেও কাশ্মীরে এগিয়ে যাবে। তাকে সেখান থেকে হটাতে না পারলে যুদ্ধবিরতিটা তার পক্ষে লাভজনক হবে। শান্তি বৈঠকে তার হাতে তুরুপের তাস থাকবে। সে বলবে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় কাশ্মীরও স্বাধীন হবে। বাংলাদেশে যদি প্লেবিসাইট হয় কাশ্মীরেও প্লেবিসাইট হবে।

তৃতীয় পর্যায়ই কি শেষ পর্যায়, না এর পরে চতুর্থ পর্যায় আসছে? যে পর্যায়ে ভারত পাকিস্তানের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন? কে জানে কার সঙ্গে পাকিস্তান কী গোপন চুক্তি করছে। চুক্তিবদ্ধ মানে অঙ্গীকারবদ্ধ। পাকিস্তানের বিপাকে তার দোস্তরা তাকে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ১০৪টি ভোট পাইয়ে দিয়েছেন। আর ভারতের বন্ধুরা ভারতকে পাইয়ে দিয়েছেন মাত্র ১১টি। দশটি দেশ ভোটদানে বিরত। পাঁচটি অনুপস্থিত। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যার জাতীয় স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হয় ও চুক্তি অনুসারে কাজ করে। যুক্তি অনুসারে নয়। বিবেক অনুসারে নয়।

সেইজন্যে জোর করে বলতে পারা যাচ্ছে না চতুর্থ পর্যায়ে কী আসছে। বৃহত্তর যুদ্ধ না চূড়ান্ত মীমাংসা। এমনও হতে পারে যে কোনোটাই আসছে না, আসছে অচল অবস্থা। সামরিক ও রাজনৈতিক স্টেলমেট। পাকিস্তানের হাতে আরো একখানা তুরুপের তাস আছে, সেটা সে খেলবে কাশ্মীর না পেলে ও বাংলাদেশ হারালে। সে তার নিজের দখলী জায়গায় বিদেশীকে ঘাঁটি গেড়ে বসতে দেবে। সেটা হবে তার ঘরোয়া ব্যাপার। ঘরোয়া ব্যাপারে কেই বা হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে? গেলে নতুন এক যুদ্ধ।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী ও তাদের বিভিন্ন মিত্রগোষ্ঠী ভারতকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। বাংলাদেশকেও নিষ্কণ্টক হতে দেবে না। আর একটা যুদ্ধ হয়তো

বাধবে না, কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই বহুকাল ধরে চলবে। একমাত্র সুখের কথা ভারত আর বাংলাদেশ এখন থেকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এ বন্ধুতা অটুট। বাংলাদেশের দুর্দিনে ভারত তার জন্যে যা করেছে আর কেউ তা করেনি বা করতে পারত না। পাকিস্তানীরা আরো কিছুকাল থাকলে আরো কত হাজার লোক মারত, আরো কত হাজার নারীর সম্মানহানি করত, আরো কত লক্ষকে নির্বাসনে পাঠাত। ভারত এই সব পুরুষকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, এই সব নারীর মান বাঁচিয়েছে, এই সব মানুষকে ঘরবাড়ী জমিজমা ফেলে নির্বাসনে যাবার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচিয়েছে।

উপরন্তু বাঁচিয়েছে তার নিজের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী জনতার হাত থেকে। জনতা আর বেশীদিন ধৈর্য ধরত বলে মনে হয় না। সাম্প্রদায়িকতা এখন চিরতরে গেল। আর সে অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে না। ওই নিয়ে আমার প্রবন্ধ লেখাও ফুরোল। গান্ধীহত্যার পর যে দায় আমি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলুম আজ আমি সে দায় থেকে মুক্ত। এ যুদ্ধ আমারও মুক্তিযুদ্ধ।

শোকাশ্রু

পঁচিশে মার্চের ঘটনার পর থেকে আমার মনকে আমি এই বলে শান্ত রেখেছিলুম যে, কাঁদবার সময় এটা নয়, এটা লড়বার সময়। লড়ছে যারা যাদের লড়তে সাহায্য করতে হবে। বল জোগাতে হবে। নিজে শক্ত হতে হবে। আগে তো যুদ্ধ শেষ হোক, দেশ মুক্ত হোক, তারপরে নিহতের জন্যে শোক।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের জীবন সার্থক হয়েছে। এখন যদি আমি আমার অশ্রুরোধ করতে না পারি তবে সেটা মানুষ-মাত্রেরই স্বভাবধর্ম। এখন যদি না কাঁদি তো কাঁদব কখন? গীতা কোরান বাইবেল একবাক্যে বলে যে মৃত যাদের মনে হচ্ছে তারা কেউ মৃত নয়, তাদের আত্মা অমর। তা সত্ত্বেও মানুষের জন্যে মানুষের কান্না থামে না। আর এ তো একজন দু'জন নয়। কমবেশী দশ লাখ লোক।

সকলেরই জন্যে আমি শোকাকুল, তবু বিশেষ করে তাঁদের জন্যে যাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহল। ফরাসীতে যাঁদের বলে এলিৎ। সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক গায়ক বাদক অভিনেতা চিত্রকর ভাস্কর ডাক্তার উকিল হাকিম এন্‌জিনীয়ার অধ্যাপক শিক্ষক ছাত্র। অন্যান্য দেশেও তাঁদের মতো লোকের উপর নির্যাতনের নজীর মেলে কিন্তু সে নজীর অন্যায়ভাবে কণ্ঠরোধ করার, আটক করার, কারাদণ্ড দেওয়ার, বিচারপূর্বক প্রাণদণ্ড দেওয়ার। তালিকা তৈরি করে হানা দিয়ে হত্যা করার নজীর কি ইতিহাসের অন্য কোনো অধ্যায়ে মিলবে? নাৎসীরা যাকে সন্দেহ করত তাকে সরাসরি খুন করত, সেটা ঠিক। কিন্তু একটা দেশের সমগ্র এলিৎকে নির্মূল করার পরিকল্পনা নাৎসীদেরও ছিল না বোধহয়।

পঁচিশে মার্চের ঘটনার পরও বহু বুদ্ধিজীবী প্রাণ নিয়ে দেশে বাস করছিলেন। কর্তারা তাঁদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁদের অভয় দিয়েছিলেন। কর্তাদের উপর বিশ্বাসই তাঁদের কাল হলো। পরাজয় আসন্ন দেখে পাকিস্তানী ফৌজ আবার এক তালিকা তৈরি করে ও তাদের তাঁবেদার বাহিনীর হাতে দেয়। শোনা যায় তাতে ছ'হাজার নাম ছিল। তাদের সবাইকেই সময় পেলে বধ করা হতো, ভারতীয় সৈন্য হঠাৎ গিয়ে হাজির হওয়ায় অধিকাংশেরই প্রাণরক্ষা হলো। যতদূর জানা গেছে শ'তিনেক বুদ্ধিজীবী নিহত বা নিখোঁজ। এক ঢাকাতেই তার অর্ধেক। এঁদের অনেকেই সাহিত্যে সুপরিচিত। এঁদের লেখা আমি পড়েছি, অন্তত নাম শুনেছি। এঁদের জন্যে আমি বিশেষ শোকার্ত।

অবিশ্বাস্য শোক মানুষকে হতবাক করে। হতবাক হই যখন পড়ি যে নিহতদের একজন মোফজ্জল হায়দার চৌধুরী। আগের বারেও মোফজ্জল হায়দারের নাম পড়েছি, এমন কি তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করে লেখা নিবন্ধও পড়েছি, অভিভূত হয়েছি। কিন্তু পরে জানা গেল ওটা ভুল খবর। এবারেও কি তাই? মনে হচ্ছে এবারকার খবরটা ঠিক। নয়তো এতদিনে তার বিপরীতটা জানা যেত।

মোফজ্জল বাংলাসাহিত্যের পরীক্ষায় শান্তিনিকেতনের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। তখনকার দিনে পরীক্ষা দিতে হতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মোফজ্জল বি. এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে। তাঁর ছাত্র অবস্থায় আমি সেখানে ছিলুম না, পরিদর্শনকালে যতদূর মনে পড়ে একবার তাঁকে ছাত্রহিসাবে দেখেছি। পরবর্ত্তীকালে আমার শান্তিনিকেতনের বাসায় তিনি সস্ত্রীক এসে দেখা করেন। ততদিনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছেন, কিছুদিন বিদেশ ভ্রমণ করে দেশে ফেরার পথে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছেন।

কতরকম কথাবার্তা হলো মোফজ্‌জলের সঙ্গে। মনে প্রাণে বাঙালী, বাংলাসাহিত্যের একান্ত অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রীতির ডোরে বাঁধা আমার ছেলেমেয়েদের মতো আশ্রমের সব ছেলেমেয়ে-দের অতি আপন "হায়দারদা"।

অধ্যাপকদের অতি প্রিয় "মুখোজ্জ্বল"। সম্মুখে তাঁর আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। একদিন তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার চেয়ার অলঙ্কৃত করতেন। দূর থেকে আমরা পুষ্পবৃষ্টি করতুম। মোফজ্জল যে উদার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন আর কারই বা সুযোগ ঘটেছিল? সেইজন্যে তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাশা ছিল সর্বাধিক। তিনিই ওপারের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে উদারতর করতেন। হিন্দু মুসলমানে লেশমাত্র ব্যবধান রাখতেন না। ঢাকা হতো সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যতীর্থ।

তখন তো আমি ভাবতেই পারিনি যে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী এত স্বল্পকালের মধ্যে হটে যাবে। মোফজ্জলকেই মনে হয়েছিল একক যোদ্ধা। কিন্তু বছর পনেরো বাদে দেখা গেল তিনি আর একক নন, অধিকাংশ অধ্যাপক ও ছাত্র তাঁরই মতো মনে প্রাণে বাঙালী, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। এমন দিনও এল যেদিন সকলেরই কণ্ঠে শোনা গেল "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।" যেখানে সবাই যোদ্ধা সেখানে মোফজ্জল সকলের একজন। সবাই মিলে সাম্প্রদায়িকতাকে হটিয়ে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালে আমরা "মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়" বলে কৌতুক করতুম। সাম্প্রদায়িকতার সেই পীঠস্থান কেমন করে যে ধর্মনিরপেক্ষতার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো তার ইতিহাস একদিন লেখা হবে। লিখলে দেখা যাবে যে মোফজ্জল হায়দারের মতো উদারমনা অধ্যাপকদের নীরব নিঃশব্দ সাধনাই তার মূলে কাজ করেছে। শুধুমাত্র বাংলাভাষার দাবীতে অত বড়ো একটা পরিবর্তন

ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গেছে যেসব ছাত্র ও ছাত্রী তারাও পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। ইতিহাস একদিন তাদের প্রাপ্য তাদের দেবে। তা বলে মৃত্যু! মৃত্যু তাদের কারো প্রাপ্য বলা যায় না। "মুক্তধারা"র অভিজিতকেও তো মৃত্যু বরণ করতে হয়। কে জানে হয়তো আমাদের বর্তমান ট্র্যাজেডীর অভিজিত আর কেউ নয়, শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের চিরদিনের সেই "হায়দারদা"।

শহীদুল্লা কায়সারের নামও নিহতদের তালিকায় দেখে আমি হতবাক। আগে তো শুনেছিলুম তিনি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। এখন শুনছি তিনি বাইরেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, চিঠিপত্রও লেখালেখি হয়নি। বছরখানেক আগে জসীমউদ্দীন সাহেব কলকাতা আসেন, তখন তাঁরই ভাষণে প্রথম শুনি যে শহীদুল্লা কায়জার "সংশপ্তক" বলে একখানি উপন্যাস লিখেছেন, ওটি নাকি বাংলাসাহিত্যের একটি সেরা উপন্যাস। এপারের সঙ্গে তুলনায় ওপার আর পেছিয়ে নেই। শোনা অবধি আগ্রহ ছিল, পরে বন্ধুবর মনোজ বসু বইখানি সংগ্রহ করে আমাকে পড়তে দেন ও আমার অভিমত জানতে চান। বেঙ্গল পাবলিশার্স পূর্ববাংলার বিশিষ্ট কোনো সাহিত্যিককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবেন বলে স্থির করেছেন। "সংশপ্তক" আকারেও যেমন বিপুল প্রকারের তেমনি বিচিত্র। সাহিত্যকীর্তির জন্যে শহীদুল্লা কায়সার নিশ্চয়ই পুরস্কারযোগ্য। মনোজবাবুকে আমার এই অভিমত জানাতেই তিনিও একমত হন। পুরস্কার নিতে শহীদুল্লা কায়সার স্বয়ং উপস্থিত হতে পারেন না, তার আগেই পচিশে মার্চ ঘটে গেছে, তিনি নিখোঁজ। পুরস্কারের টাকা বাংলাদেশের কমিশনে গচ্ছিত থাকে। ইচ্ছা ছিল সুদিন এলে তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনা যাবে। কে জানত যে এইভাবে তাঁকে আমরা হারাব! তবে কি সেই পুরস্কার তাঁর নিধনের কারণ হলো! জানিনে কী তাঁর অপরাধ।

বাংলাসাহিত্যে অসামান্য হওয়াটাই যদি না অপরাধ হয়ে থাকে। মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকে না, তার কীর্তি বেঁচে থাকে। শহীদুল্লা কায়সার নিজেই নিজের কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করে গেছেন। "সংশপ্তক" তাঁকে অমর করবে।

মোদের গরব মোদের আশা

অতুলপ্রসাদ কি জানতেন যে ভাষা সম্বন্ধে যা তিনি লিখে গেছেন দেশ সম্বন্ধেও তা একদিন সত্য হবে? তাঁর জন্মশতার্ষিকীতে আজ আমি খোদার উপর খোদকারী করে সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলাদেশ!

জানি মিল দিতে গিয়ে ভুল হলো, কিন্তু তথ্যে ভুল হলো না। আজকের দিনের সব চেয়ে চমকপ্রদ ঐতিহাসিক তথ্য পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি দেশ। বাংলাদেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। পীপলস রেপাবলিক অফ বাংলাদেশ।

আমার পরমশ্রদ্ধেয় এক বন্ধু লিখেছেন, বাংলাদেশ কেন? পূর্ব বাংলা কেন নয়? কথাটা মুখে মুখে ঘুরছে। ওদের কী অধিকার আছে? কোন্ অধিকারে ওরা ওদের অঞ্চলটাকে বাংলাদেশ বলে আখ্যায়িত করবে? তা হলে আমরা কেমন করে পশ্চিমবঙ্গ মেনে নেব? পূর্ব না থাকলে পশ্চিম কেমন করে হয়? পশ্চিম যদি থাকে পূর্ব কেমন করে অদৃশ্য হয়!

এর উত্তর, আয়ারল্যাণ্ড যখন স্বাধীন হয় তখন তার বৃহত্তর অংশের নাম রাখা হয় আইরিশ ফ্রী স্টেট। পরে সংক্ষেপে "এরা"। তার মানে আয়ারল্যাণ্ড। বৃহত্তর অঙ্গই সমগ্রের নাম ধারণ করে। ক্ষুদ্রতর অঙ্গ হয় নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড বা আলস্টার। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন তারও বৃহত্তর ভাগের নাম রাখা হয় ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে ইণ্ডিয়া। বৃহত্তর ভাগই সমগ্রের নাম বহন করে। ক্ষুদ্রতর ভাগ হয় ইসলামিক স্টেট অফ পাকিস্তান।

বৃহত্তর খণ্ড যে সমগ্রের উত্তরাধিকারী হয় এর আরো নজির

ইতিহাসে আছে। জার্মানী বলতে জার্মানী অস্ট্রিয়া উভয়কেই বোঝাত। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাই ছিল তার সম্রাটের সাম্রাজ্যধানী। শতখানেক বছর আগে প্রাসিয়া ও অস্ট্রিয়া আলাদা হয়ে যায়। প্রাসিয়াই আরো কয়েকটি রাজ্যকে অঙ্গীভূত করে জার্মান সাম্রাজ্য বলে পরিচয় দেয়। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরি ও আরো কয়েকটি অঞ্চল থাকে। নতুন নাম হয় অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি।

পূর্ব বাংলা যদি বলে যে তার নামই বাংলাদেশ তবে তার পক্ষে সাক্ষী দেবেন স্বয়ং কবি কৃত্তিবাস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যাঁর জন্ম।

"পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।

গঙ্গাতীর সে সময় বঙ্গদেশের সামিল ছিল না। এর পরে কৃত্তিবাস বলেছেন তিনি রাজপণ্ডিত হবার আশায় গৌড়েশ্বরের সকাশে উপস্থিত হন। বলতে পারতেন বঙ্গেশ্বর। কিন্তু রাজসভার বর্ণনায় কোথাও বঙ্গের উল্লেখ নেই। ঈশ্বর যিনি তিনি শুধু গৌড়ের ঈশ্বর। হয়তো তিনি বঙ্গেরও অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজধানী ছিল গৌড়ে। অতএব গৌড়েশ্বর। যেমন বাদশাদের বলা হতো দিল্লীশ্বর।

মুসলমানী আমলেই গৌড় বঙ্গ একাকার হয়ে যায় ও দেশের নাম হয় বাঙ্গালা। মোগল অধিকারের পর দেশ আর স্বাধীন থাকে না, হয়ে যায় প্রদেশ বা সুবা। সুবে বাঙ্গালার সঙ্গে সুবে বিহার ও সুবে ওড়িশা মিলিয়ে তিনটি সুবার উপর আধিপত্য করতেন মুর্শিদাবদের নবাব মুরশিদ কুলী খান্। ইংরেজ আমলে তিনটি সুবা একাকার হয়ে একটি প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হয়। তখন তাঁর নাম হয় সংক্ষেপে বেঙ্গল। বেঙ্গল বলতে ইংরেজরা শুধু বাংলাভাষীদের

দেশ বুঝত না। তখনকার দিনে বাংলা ছিল বেঙ্গলের অন্যতম ভার্নাকুলার।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস সারা উত্তর ভারত জুড়ে শাসন করত আর বেঙ্গল আর্মি করত সারা উত্তর ভারত রক্ষা। দক্ষিণে ছিল মাদ্রাস সিভিল সার্ভিস ও মাদ্রাস আর্মি। পশ্চিমে ছিল বম্বে সিভিল সার্ভিস ও বম্বে আর্মি। পরে রানী ভিকটোরিয়া শাসনভার নিলে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস ইত্যাদির মিলিত নাম হয় ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আর বেঙ্গল আর্মি প্রভৃতির মিলিত নাম হয় ইণ্ডিয়ান আর্মি।

বেঙ্গল শব্দটির আদিতে বঙ্গদেশ, যার সবটাই ছিল গৌড়ের পূর্বে। পরে সেই বেঙ্গলই বিহার ওড়িশাকে অঙ্গীভূত করে সারা উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শক্তির কেতন ওড়ায়। তার সেই ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে হতে যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানে আবার সেই আদি নাম বঙ্গদেশ। আদি অবস্থা স্বাধীনতা। ইতিমধ্যে লাট কার্জনের আমলে পূর্ববঙ্গ কথাটির সৃষ্টি হয়। লাট মাউণ্টব্যাটেনের আমলে আবার তার ব্যবহার। পরে "পূব" বিশেষণটি অব্যাহত থাকে, "বঙ্গ" বিশেষ্যটি "পাকিস্তানে" রূপান্তরিত হয়। এখন "পাকিস্তান" নামকাটা, "পূর্ব"ও নামকাটা। ইতিহাসের পাতা থেকে দুটোই মুছে গেল একসঙ্গে ভারতের এক প্রান্তে। রয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষী দিতে যে পূর্ববঙ্গ বলে কার্জনের ইচ্ছায় একটি প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল মাউণ্টব্যাটেন যাকে পুনর্গঠন করে পাকিস্তানের কোলে তুলে দেন।

আমার ছেলেবেলায় বেঙ্গল বলতে যা বোঝাত তাও কি সমগ্র বঙ্গ? পূর্ববঙ্গ ও আসাম ছিল স্বতন্ত্র একটি প্রদেশ। বিহার ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে অবশিষ্টের নাম ছিল বেঙ্গল। তখন ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাথায় "বেঙ্গল" নামের টুপী, এখন পূর্ববঙ্গের মাথায় "বাংলাদেশ" নামের টুপী। পশ্চিমবঙ্গ সে টুপী বিহার ওড়িশার সঙ্গে

ভাগ করে আরো বড়ো বোধ করেছে। তখনকার বড়াই এখনো যায়নি। কলকাতাকেন্দ্রিক অহঙ্কার এখনো প্রবল। তবে সেই সঙ্গে একটা হীনমন্যতাও কাজ করছে। অবিভক্ত ভারতের প্রিমিয়ার প্রভিন্স এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য। ওদিকে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের দিকে পা বাড়িয়েছে। একদিন সেখানে আসন পাবেও। আর সকলের সঙ্গে সমান আসন।

বিহার ওড়িশার থেকে বিযুক্ত হলেও সংযুক্ত বঙ্গ ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বাধিক সংখ্যাবহুল প্রদেশ। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ভারতবর্ষের আইনসভায় তারই আসনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সেইজন্যে তারই প্রভাব ছিল সব চেয়ে বেশী। ভারত যদি অবিভক্ত থাকত, বঙ্গ যদি অবিভক্ত থাকত, তা হলে ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে বাঙালীদেরই হতো সর্বাধিকসংখ্যক আসন। তাদের প্রভাব হতো এখনকার চেয়ে তিনগুণ বেশী। পার্টিশনে বাঙালীদের যে ক্ষতি হয়েছে আর কারো তা হয়নি। অথচ একথা কোনো মতেই বলা চলে না যে এবারকার পার্টিশন বাঙালীদের অমতে হয়েছে।

"ভারত যদি দুই ভাগ হয় তোমরা কোন্ ভাগে পড়তে চাও? হিন্দুস্থানে না পাকিস্তানে?" এই হলো ১৯৪৭ সালের উভয়সঙ্কট। অবিভক্ত বঙ্গের জনমত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তখনকার দিনের প্রাদেশিক আইনসভাও দ্বিমত হয়। একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ পাকিস্তানে যেতে হিন্দুদের রুচি ছিল না। মোগল কিংবা ব্রিটিশ রাজত্ব বিনা হিন্দুস্থানে থাকতেও মুসলমানদের মতি ছিল না। তখনো বুঝতে পারা যায় নি যে হিন্দুস্থান হবে সেকুলার স্টেট ও তার নাম হবে ইণ্ডিয়া। তা ছাড়া মেজরিটির উপর মাইনরিটির বহুদিনের জমানো ভয় ও অবিশ্বাস ছিল। আরো বড়ো কথা ইংরেজ চলে গেলে যে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম হতো তা পূরণ করা কংগ্রেসের একার সাধ্য ছিল না। ইণ্ডিয়ান আর্মির যে রেজিমেণ্টগুলি মুসলিম তারা কিছুতেই কংগ্রেসের সৈন্যবি

সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিত না। মিউটিনি বাধিয়ে দিত। তাদের দমন করতে গেলে গৃহযুদ্ধ বাধত। কংগ্রেস যাদের আনুগত্য পাবে না তাদের স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যেতে দেয়। একবার যখন স্থির হলো যে পাকিস্তান সৃষ্টি হবে তখন বাংলার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের ভাগেই পড়ল। তাদের আনুগত্য কংগ্রেস শাসনের প্রতি নয়।

তাদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁরা ভারত ভাগে রাজী ছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাগে নারাজ। তাঁদের কাম্য ছিল অবিভক্ত বঙ্গ। তাঁরা মনে প্রাণে বাঙালী, অথচ ভারতীয় হতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ভারতের বাইরে গিয়ে অবিভক্ত বঙ্গে বাস করতে অধিকাংশ হিন্দু যেমন অনিচ্ছুক পাকিস্তানের বাইরে গিয়ে অবিভক্ত বঙ্গে বাস করতে অধিকাংশ মুসলমানও তেমনি অনিচ্ছুক। অধিকাংশ হিন্দুর ও অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছা থাকলে ১৯৪৭ সালেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিনা রক্তপাতে ভূমিষ্ঠ হতো। বিশ্বসভায় সেই বছরই সে তার প্রাপ্য আসন পেতো। পঁচিশ বছর আগেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হতুম। রব উঠত "জয় বাংলা," "জয় সুহরাবর্দী", "জয় শরৎ বসু"।

তেমন কিছু হলো না তার মূল কারণ আমরা কেবল বাঙালী নই, আমরা ভারতীয়। ভারতের সর্বত্র আমাদের গতি, স্থিতি ও বিস্তৃতি। ভারতের সর্বত্র আমাদের তীর্থক্ষেত্র, আমাদের কর্মক্ষেত্র। আমাদের সংস্কৃতির ত্রিবেণী আর্য দ্রাবিড় ও মুসলিম। রামায়ণ মহাভারত যেমন আমাদের, ইল্লোরা অজন্তাও তেমনি আমাদের, তাজমহল ফতেপুর সিক্রীও তেমনি আমাদের। কর্ণাটকী সঙ্গীত যেমন আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতও তেমনি আমাদের। সংস্কৃত যেমন আমাদের উর্দুও তেমনি আমাদের। বুদ্ধ অশোক যেমন আমাদের আকবর শের শাহ্‌ও তেমনি আমাদের। আমাদের ভারতীয় উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র বঙ্গীয় উত্তরাধিকার

নিয়ে আমরা উন্নত হতে পারিনে। তা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দান কি কারো চেয়ে কম! ভারত স্বাধীন হবে আর আমরাই থাকব না স্বাধীন ভারতের শরিক হয়ে?

সেদিন যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলুম তা একান্ত বেদনার সঙ্গে নেওয়া। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমাদের উপায় ছিল না। ভারতের বহির্ভূত অবিভক্ত বাংলাদেশ আমাদের অবশিষ্ট ভারতে এলিয়েন করত। অভারতীয় বলে পরিচয় দিতে আমাদের মাথা হেঁট হতো। সেটা অসত্যও বটে। এই পঁচিশ বছর পরেও সেটা সমান অসত্য। আমরা যেমন একদিক দিয়ে বাঙালী তেমনি আরেকদিক দিয়ে ভারতীয়। আমাদের বাদ দিয়ে ভারত নয়। ভারতকে বাদ দিয়ে আমরা নই। এই দুই সত্যকে একসঙ্গে ধারণ করলে যা হয় তারই নামরূপ পশ্চিমবঙ্গ। অথবা ভারতীয় বঙ্গ। এর আর রদবদল নেই।

আমরা জানি যে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের বাইরে চলে যাওয়ায় পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো দল এখন তারই অনুরূপ স্বাধীনতার কল্পনা করছেন। ইতিহাসে কিছুই অসম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোক যদি লাল হয়ে যায় তবে তাদের লাখে লাখে গুলী করে মারতে আমরা পারব না। আমরা ইয়াহিয়া বা টিক্কা নই। ভারতের ঐতিহ্য তেমন নয়। আমরা অধিকাংশের ইচ্ছা আপসে মেনে নেব। যেমন মেনে নিয়েছিলুম ১৯৪৭ সালে। তবে আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ লোক ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদ চাইবে না। তারা ভারতের ভিতরে থেকেই ভারতকে সামাজিক ন্যায়ের দিকে আরো কয়েক কদম এগিয়ে যেতে প্রস্তুত করবে।

তা হলে পূর্ব বাংলার পরিণতি অন্যরূপ হলো কেন? কেন তবে ওরা পাকিস্তানের ভিতরে থেকে প্রগতির পথ খুঁজল না? এর উত্তর, ওরা পঁচিশ বছর ধরে খুঁজেছে। কিন্তু পায়নি। পাকিস্তানে পূর্ব বাংলাই ছিল সর্বাধিক সংখ্যাবহুল। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে পূর্ব

বাংলার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হবার কথা। কিন্তু পাকিস্তানের প্রকৃত শাসকরা থাকতেন দেড় হাজার মাইল দূরে। তাঁদের এজেন্টরা ঢাকায় বসে শাসন চালাতেন। জননায়কদের হাতে ইংরেজ আমলে যতটুকু ক্ষমতা ছিল পাকিস্তানী আমলে ততটুকুও না। ধর্মের মোহে তাঁরা সব সহ্য করেছিলেন। কেবল ভাষার উপর অত্যাচার বাদ। ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। ছাত্ররাই নেতৃত্ব নেয়। ভাষা তাদের চোখে ধর্মের চেয়ে ছোট নয়। তাদের ভাষাপ্রেমই দেশপ্রেমে পরিণত হয়।

একবার দেশপ্রেমের জোয়ার যখন এল তখন তা ধর্মান্ধতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মোল্লা মৌলবীর ছেলেরাই হয়ে উঠল সেকুলার। আমি অন্তত দু'জন সাহিত্যিকের নাম জানি যাঁদের জন্ম গোঁড়া মুসলমান পীর ও ইমাম বংশে। কী জানি কেমন করে তাঁরাই বড়ো হয়ে মুক্ত বুদ্ধির প্রবক্তা হন। পাকিস্তানের আবহাওয়ায় কী করে এটা সম্ভব হলো! হলো এইজন্যে যে স্বাধীনতার পরে দেশেও একদল ইনটেলেকচুয়ালের আবির্ভাব হয়। তাঁরা বিদেশ ঘোরেন। নানা বিদ্যা শিখে আধুনিকভাবে চিন্তা রেন। আবহাওয়াটাই বদলে যায়। আমরা এদেশে বসে কেবল ন্ধদের কাণ্ডকারখানার খবরাখবর রাখতুম। ইনটেলেকচুয়ালদের বুদ্ধির প্রতিবাদ আমাদের কাছে আসত না। পূর্ব বাংলা মাদের অলক্ষিতেই আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ে। নামে কুলার নয়, কাজে সেকুলার।

পুরোনো বোতলে নতুন মদ সেদেশের বিদ্যার্থী ও বিদ্বান সমাজ। তল তো ভাঙবেই। পাকিস্তানের শাসকরা বোধ হয় ভাবতেই রন নি যে এক পুরুষের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্র বাসি হয়ে যাবে। রা চায় সত্যিকারের গণতন্ত্র, অনেকেই সমাজতন্ত্র, কেউ কেউ বাদ। তাদের অধিকাংশেরই বাড়ী গ্রামে। গ্রামে গ্রামে তাদের

প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ লোক তাদের নির্দেশমতোই ভোট দেয়।

"আমরা আপাতত অটোনমি চাই। কিন্তু আমাদের মনের কথা কী, জানেন? ইণ্ডিপেনডেন্স।" বছর আড়াই আগে কলকাতা বেড়াতে এসে আমার কাছে মন খোলেন ঢাকার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। তখন আমি চমকে উঠি। এখন বোঝা যাচ্ছে ইয়াহিয়া গোষ্ঠী কেন ইনটেলেকচুয়ালদের নির্মমভাবে হত্যা করল। তাঁরাই তো ছাত্রদের মন্ত্রণা দেন। কিংবা বলা যেতে পারে ছাত্ররাই তাঁদের সাহসী করে তোলে।

গত মার্চ মাসের বিবরণ যা শুনেছি যা পড়েছি তার থেকে আমার ধারণা জন্মেছে যে অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলেই অটোনমিকে স্বাধীনতার স্তরে উত্তীর্ণ করে দেন। নইলে রাজনীতিকদের দৌড় অতদূর যেত না। অটোনমি পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যেতেন। কিন্তু একদিকে ইয়াহিয়া ভুট্টোর চক্রান্ত আরেকদিকে ছাত্র অধ্যাপকদের অধৈর্য রাজনীতিকদের উপর জোর করে স্বাধীনতার সংগ্রাম চাপিয়ে দেয়। মিলিটারি অ্যাকশনের পর তঁদের সামনে আর কোনো পন্থা খোলা থাকে না। সংগ্রাম যারা করে তারা সব চেয়ে প্রেরণা পায় অটোনমি থেকে নয়, স্বাধীনতা থেকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নয়, পূর্ব বাংলা থেকেও নয়, বাংলাদেশ থেকে। স্বদেশী গানগুলো তো বাংলাদেশকে ঘিরে। পূর্ব বাংলাকে ঘিরে নয়।

গান্ধীজী যতবার সংগ্রামে নেমেছেন ততবার তখনকার দিনের সব চেয়ে চরমপন্থী সংকল্প নিয়েছেন। সংগ্রামের শেষে তার চেয়ে নরম হয়েছেন। ইয়াহিয়া খান্ যদি শেখ সাহেবের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হতেন তা হলে সংঘাত এত বীভৎস, এত তিক্ত, এত নিষ্ঠুর হতো না। এত লোক মরত না, এত লোক দেশত্যাগ করত না। সময়মতো সন্ধি হলে আবার জাতীয় পরিষদ্ ডাকা হতো। মিলে মিশে সংবিধান সংরচিত হতো। আপসে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটত। কিন্তু

দেখা গেল পাকিস্তান ভাঙবে, তবু মচকাবে না। মাথায় ভুত চেপেছিল যে ভারতই সকল দোষের দোষী, ভাততের সঙ্গে বলপরীক্ষা না করলেই নয়। যেটা পাকিস্তানের ঘরোয়া লড়াই সেটা আন্তর্জতিক যুদ্ধে পরিণত হলে কী যে লাভ হবে তা ঠাহর করা শক্ত। বোধ হয় পাকিস্তান ভেবেছিল যে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ভারতকে নিরস্ত করত, ভারত নিরস্ত করত মুক্তি যোদ্ধদের। রাজনীতিকরা অটোনমির কমেই রাজী হতেন আর ছাত্ররাও তাঁদের ক্ষমা করত। ভারতকে বা ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তান চিনত না, চিনত না শেখ মুজিবকে ও তাঁর হাই কমাণ্ডকে। মুক্তিযোদ্ধেদের তো চিনত না-ই। ছাত্রদেরও চিনত না। এইসব অজ্ঞাত শক্তিদের হাতে পাকিস্তানের পরাভব ঘটেছে।

নয় মাস গর্ভযন্ত্রণার পর স্বাধীন বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার মতে এটা প্রিমেচিওর ডেলিভারি। এই নবজাতককে অতি সাবধানে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ঘরে বাইরে এর অনেক শত্রু। ইসলামী দলগুলি এর অস্তিত্বকে সুনজরে দেখবে না। অতিবাম-পন্থীরাও একে সাধ্যের অতিরিক্ত গতিতে দৌড়তে বলবে। পাকিস্তান আর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তো চক্রান্ত চালাবেই। তাদের পেছনে দাঁড়াবে দুনিয়ার বড়ো বড়ো মোড়ল। অথচ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বলতে বিশেষ কিছু এর নেই। ভারতীয় সেনা ঘরে ফিরে এলে শান্তিরক্ষার জন্যে যারা থাকবে তাদের ক্ষমতাও অপরীক্ষিত। একটা পাওয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হলে আপনা আপনি পূর্ণ হবে না। তার জন্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চাই। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে ওপারের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখা যাক বাঙালীর শৃঙ্খলা কত দৃঢ় হতে পারে, বাঙালীর হুকুম বাঙালী মান্য করে কি না। শেখ মুজিব দেশে ফিরে শাসনের রশি হাতে নিয়েছেন। মনে হয় তাঁর হুকুম সকলে মানবে।

এক্ষেত্রে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেনি। বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকারের উত্তরাধিকারী সরকার নন। মাঝখানে একটা ছেদ পড়ে

গেছে। বিপ্লবের সময় যেমন পড়ে। সেই অর্থে এই সরকার একটি বৈপ্লবিক সরকার। তা বলে যদি কেউ মনে করে থাকেন যে বিপ্লব এক্ষেত্রে সমাজবিপ্লব তিনি ভুল করবেন। নতুন সরকার সমাজ-তন্ত্রের কথা বলছেন বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্র বলতে এক্ষেত্রে বুঝতে হবে গণতান্ত্রিক সংবিধান মোতাবেক সামাজিক পরিবর্তন। যেমন ভারতে ঘটেছে ও ঘটছে। ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে আরো দ্রুত ঘটতে পারে, যদি শেখ মুজিবের পেছনে শতকরা নিরনব্বইটির উপর ভোট থাকে। তাঁর দেশের পার্লামেণ্ট যদি তাঁকে একবাক্যে সমর্থন করে তবে তিনি যা-ই চাইবেন তাই হবে। কিন্তু আইন করলেই আইন কাজে পরিণত হবে না, তার জন্যে চাই উপযুক্ত প্রশাসন, জনগণের কর্মশক্তি ও ত্যাগশক্তি, যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণ না দিলে কেউ মূলধন বিনিয়োগ করবে না। রাষ্ট্রেরই বা এত মূলধন কোথায়? প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ না করলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন দেশের অভাব দূর করবে না। লোকে অভাবে অনটনে জর্জর হবে। বড়লোক হয়তো কেউ হবে না, কিন্তু সবাই মিলে গরিব হওয়া প্রগতির লক্ষণ নয়। ধনসম্পদ আগে বাড়াতে হবে, তারপরে বাঁটতে হবে। কিংবা একই কালে বাড়াতে ও বাঁটতে হবে। উৎপাদন না করে বণ্টন করতে গেলে দারিদ্র্য ঘুচবে না।

স্বাধীনতা শক্ত। গণতন্ত্র আরো শক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা তার চেয়েও শক্ত। সমাজতন্ত্র সব চাইতে শক্ত। নবজাতকের পক্ষে রাতারাতি বড়ো হয়ে ওঠা যেমন সম্ভব নয় নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনি অসম্ভব একসঙ্গে এতগুলি দুরূহ কৃত্য।

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্ন আজকের নয়। বছর পনেরো ষোল আগেও আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার বন্ধু হুমায়ুন কবির ও আমি। আরো আগে আমার অগ্রজ কাজী আবদুল ওদুদ ও আমি। হুমায়ুন আমাকে বলেন, "আপনার কি মনে হয় পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলে আত্মনির্ভর হতে পারবে না?" আমি এর উত্তরে

বলি, "নেপাল যদি আত্মনির্ভর হয়ে থাকে, বর্মা যদি আত্মনির্ভর হয়ে থাকে পূর্ববঙ্গও আত্মনির্ভর হতে পারবে।" কিন্তু প্রশ্নটা শুধু আত্মনির্ভরতার নয়, আত্মরক্ষার। পূর্ববঙ্গ কি নেপালের মতো, বর্মার মতো আত্মরক্ষা করতে পারবে? তার সামরিক শক্তি কোথায়!

আমার আশঙ্কা ছিল যে আত্মরক্ষার তাগিদে পাকিস্তান যেমন সেনটো সিয়াটোতে ভর্তি হয়েছে, আমেরিকাকে পেশোয়ারের কাছে ঘাঁটি দিয়েছে, স্বাধীন হলে পূর্ববঙ্গও তেমনি আত্মরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন জোটভুক্ত হবে, আমেরিকাকে চট্টগ্রামের কাছে ঘাঁটি দেবে। তা হলে যে ভারতের বিপদ। চীন তখনো আমাদের ভয় দেখায়নি। পরে আমার আশঙ্কা হয় যে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলে খাল কেটে চীনকে ডেকে আনতে পারে।

বছর দেড়েক আগেও আমার এই আশঙ্কা আমি ঢাকা থেকে আগত এক অধ্যাপকের কাছে ব্যক্ত করি। বলি, "দোহাই আপনাদের! স্বাধীন হয়ে আপনারা যেন চীনের পাল্লায় না পড়েন। তা হলে আমরা বিপন্ন হব।"

এখন আমার আর সে আশঙ্কা নেই। চীন আর আমেরিকা যে ব্যবহার করেছে তার পরে বাংলাদেশের লোক আর তাদের কারো পাল্লায় পড়বে না। পড়লে পড়বে রাশিয়ার কিংবা ব্রিটেনের পাল্লায়। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে, সে আমাদের বিপন্ন করবে না। আর ব্রিটেনের সঙ্গে তো ১৯৪৭ সালেই বোঝাপড়া হয়ে যায় যে সে আর এই উপমহাদেশে ঘাঁটি গাড়বে না, সৈন্য পাঠাবে না। এতকাল সে বিশ্বাস রক্ষা করেছে। ভবিষ্যতেও করবে বলে ধরে নিতে পারি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে এইরকম মোড় নেবে তা আমি বা আমার বন্ধুরা কেউ কল্পনা করতে পারিনি। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরামের দল রাতারাতি একটা সামরিক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন হয়েছিল গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে শিখরা। পাঞ্জাবীর

মতো বাঙালীও এখন একটা মার্শাল রেস। সাত কোটি সন্তান এখন আর শুধু বাঙালী নয় এখন মানুষ হয়ে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের মতে কবিগুরুর উক্তি এখন ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কবিগুরু জীবিত থাকলে তিনিও সেইকথা বলতেন। লিখতেন,

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
মানুষ করেছ, শুধু বাঙালী করনি।"

বাংলাদেশ কেবলমাত্র নদীমাতৃক নয়, সমুদ্রতীরবর্তী দেশ। বঙ্গোপসাগরের নাম যার নাম অনুসারে হয়েছে সে দেশ একদা সমুদ্র-যাত্রায় অগ্রণী ছিল। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এসব নাম অকারণে রাখা হয়নি। যারা রেখেছিল তারা পৃথিবীর নাবিক সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে বাঙালী নাবিকরা গণ্যমান্য ছিল। সেইসব নাবিকের বংশধর এখন লস্কর নামে বিদিত। বিশ্বের সব দেশ এদের চেনে। এদেরও সব দেশ চেনা। কিন্তু এদের নিজেদের দেশের কোনো জাহাজ নেই। পরের জাহাজেই এদের জীবন কেটে যায়। এদের দুঃখের কাহিনী আমার জানা। একদা এদের বা এদের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছিল আমার বিচার্য বিষয়। সবাই এরা পূর্ব বাংলার লোক। সাধারণত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট জেলার।

এখন এই লস্করদের জাহাজ জোগাতে হবে। নিজেদের দেশের জাহাজে কাজ করে এরা আত্মসম্মান বোধ করবে। চট্টগ্রাম এককালে জাহাজ তৈরি করত। আবার করবে। তেমনি করে নতুন এক জাহাজনির্মাতা শ্রেণীর অভ্যুদয় হবে। পুরানো কারিগর শ্রেণী এখনো বিলুপ্ত হয়নি, এখনো ছোটখাটো জলযান তৈরি করে। ছোটখাটো জলযানও আরো চাই। উপকূলবর্তী বাণিজ্য ছোটখাটো জলযান দিয়েও হয়। আরো কম খরচে হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জলযান ইচ্ছা করলে বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে।

কলকাতা, বিশাখাপত্তনম্, মাদ্রাজ, কলম্বোর সঙ্গেও। এই একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে বাঙালী নাবিকরা ও বণিকরা অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীকদের মতো কুশলী হতে পারে।

যে যার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই বড়ো হয়। বাংলাদেশের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলুম। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা সকলেই জানেন। পাট আর কোথাও অত বেশী আর অত ভালো হয় না। চা আর তামাক আর রেশমও বিদেশের বাজারে আদর পায়। চেষ্টা করলে তুলোর চাষও জমবে। এককালে মসলিন হতো কোথাকার তুলোয়! এখনি বা হবে না কেন? আমার এক সহযোগী পাট থেকে গালিচা তৈরির শিল্প প্রবর্তন করেছিলেন। এত দিনে নিশ্চয়ই তার অনেক উন্নতি হয়েছে। চাষীর বৌদের হাতের কাজ নক্‌শী কাঁথাও বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। সেইভাবে ঘরে বসে তারাও কিছু উপার্জন করবে। আরো কতরকম হাতের কাজ আছে যার জন্যে পূর্ব বাংলার ঘরণীদের সুনাম! কলকারখানার উপর জোর না দিয়ে কুটিরশিল্পের উপর জোর দিলে মেয়েদেরও সহজে কাজ জোটে। জনসংখ্যার অর্ধেক তো নারী। নারীশক্তিকে সক্রিয় না করলে দেশ সমৃদ্ধ হবে কী করে?

ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড পাশাপাশি' দুটি দেশ। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের অর্থনীতির বনিয়াদ কৃষি ও ছোট ছোট শিল্প। জার্মানী ও ডেনমার্ক পাশাপাশি দুটি দেশ। কিন্তু ডেনমার্কের অর্থনীতির বনিয়াদ কৃষি ও ছোট-ছোট শিল্প। দুধ মাখন মাছ মাংসকেও আমি এর মধ্যে ধরেছি। বাংলাদেশের যে অবস্থা সেই অনুসারে তো ব্যবস্থা করতে হবে। সে কি রাতারাতি ইংলণ্ড হতে পারবে, না জার্মানী? হলে-হয়ত পারে আয়ারল্যাণ্ড বা ডেনমার্ক। শুনতে পাই চট্টগ্রামে নাকি স্টীল মিল হয়েছে। অথচ পূর্ব বাংলায় লোহার খনি আছে বলে শুনিনি। বিদেশী জাহাজে বিদেশ থেকে লোহা আনিয়ে নিতে হয়। লোহা এসে না পৌঁছলে কারখানা অচল, কর্মীরা অলস।

তাদের পেছনে যে খরচটা হয় তার কৌতুকপ্রদ বিবরণ শুনেছি। শাদা হাতী পোষার মতো ব্যাপার।

পাকিস্তানী আমলে কতকগুলি শাদা হাতী পোষা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। নতুন আমলেও যদি তাই হয় তবে হাতীর খোরাক জোগাতেই দেশ দেউলে হবে। ভারতে আমরা দেখছি শিল্পায়নের দরুণ একদল হঠাৎ বড়লোক সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সঙ্গে এক উচ্চবেতনভুক ম্যানেজার শ্রেণী। বাংলাদেশ যদি ভারতের অনুকরণে মাতে তবে মজবে। গাছে ওঠা যত সহজ গাছ থেকে নামা তত সহজ নয়। অনেক সময় আমি দুঃস্বপ্ন দেখি যে গাছে উঠে বসে আছি, নামতে পারছিনে। ভারতেরও তাই হবে। বাংলাদেশ আর সব বিষয়ে ভারতের পন্থা নিতে পারে, কিন্তু অর্থনীতিতে নয়। শিল্পায়ন সাত কোটি মানুষকে দুধে ভাতে বা মাছে ভাতে রাখতে পারবে না। তখন তাদের অনেকেই বিপ্লবের নামে খুনখারাপি করে বেড়াবে।

যাক, মোদ্দা কথা হলো বাংলাদেশ বহুকাল পরে স্বাধীন হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পলাশীর পর এই প্রথম। ময়মনসিংহ থেকে একটি মুসলমান যুবক বছর পাঁচেক আগে শান্তিনিকেতন এসেছিল। সে সময় ময়মনসিংহের স্বনামধন্য মোনেম খান্ই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। কোথায় তা নিয়ে গর্ব করবে! তা নয়, মাথা হেঁট করে বলে, "মেসোমশায়, আমরা কবে স্বাধীন ছিলুম বলতে পারেন? পাঠান আমল কি আমাদের আমল? মোগল আমলও কি আমাদের? ইংরেজ আমল আমাদের আমল ছিল না। এই পাঞ্জাবী আমলও আমাদের আমল নয়। আমরা চির পরাধীন।"

আজ যদি সে বেঁচে থাকে তবে তার মুখে অন্য কথা শুনতে পাব। সে বলবে, "মেসোমশায়, আর আমরা পরাধীন নই। আজ আমরা স্বাধীন। সাতশো বছর পরে এই প্রথম আমরা স্বাধীনতার আস্বাদন পাচ্ছি। এ স্বাধীনতা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব। জয় বাংলা।"

এক দুই তিন

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে তাঁকে প্রায়ই দেখতে পেতুম। আমার তো ধারণা ছিল তিনিও আমার আর-একটি কাকা। চার পাঁচ বছর বয়সে তোলা আমার যে দু'টি ফোটোতে তাঁকে দেখেছি তার একটিতে তিনি আমাকে কোলে নিয়ে বসেছেন, অন্যটিতে কাকাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। পরনে ধুতী চাদর, পিরাণ বা কোট। মুখে দাড়ি নেই, গোঁফ আছে।

হাঁ, তিনিই আমাদের স্কুলের পাঠানমাস্টার। মুসলমান কথাটা তত বেশী শোনা যেত না। হিন্দু কথাটাও না। শোনা যেত ওড়িয়া বাঙালী হিন্দুস্থানী পাঠান এইসব শব্দ। মাস্টার যদি পাঠান না হয়ে মুসলমান হতেন তা হলে সেকথা আমার মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনত। আমি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছি, তার কারণ তিনি ছিলেন পাঠান। পাঠান তুর্ক মোগল ইংরেজ এসব শব্দ সাম্প্রদায়িক নয়।

আসলে তিনি বাঙালী মুসলমান। অন্যান্য বাঙালীদের মতো তাঁর কথাবার্তা চালচলন। বংশপদবী খোন্দকার। নাম কী তা ছেলেবেলায় শুনিনি, পরে শুনেছি, মনে রাখিনি। পাঠান কাকা আমাদের কাছাকাছি আরেকটি বাড়ীতে বাস করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে যেতুম। মাস্টারনী খেতে দিতেন সিদ্ধ ডিম। হাঁ, মুরগীর ডিম। সেটা আমাদের বাড়ীতে বারণ। তাঁদের বাড়ীতে নয়। বোঝা গেল এইখানেই অমিল। নয়তো আর সব বিষয়ে মিল। আমাদের বাড়ীতে মাস্টারনীকে আসতে দেখিনি। তিনি ছিলেন উর্দুভাষিণী। এখানেও আবার অমিল।

পরে একদিন শোনা গেল মাস্টারনী ইলোপ করেছেন। যার

সঙ্গে সে একটি ওড়িয়া হিন্দু ছাত্র। তখনো বোঝবার বয়স হয়নি যে ধর্মের অমিল ভাষার অমিল থাকলেও মনের মিল হতে পারে। হতে পারে দেহের মিল। সেখানে আবার মিল। মাস্টার সাহেব মুখ দেখাতে না পেরে স্থানত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন খুলনা জেলার লোক। আর যেখানকার কথা বলছি সেটা হলো ওড়িশার একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানী।

এর বছর কয় বাদে একবার ঠাকুমা নিয়ে যান তাঁর দাদার বাড়ী। সেখানে দেখি ইউরোপীয় পোশাক পরা এক নবীন ডাক্তার আত্মীয়কে। চমৎকার চেহারা। পরে শুনি তিনি শহরের মাঝখানে ধরা পড়েছেন এক বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে। সঙ্গে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলিম মহিলা। হাঁ, আবার ইলোপমেন্ট। এবারেও নায়ক হিন্দু, নায়িকা মুসলমান। এক্ষেত্রে আবার মিল। প্রেমের শ্রীক্ষেত্রে।

আমাদের বাড়ীর পেছনে একঘর মুসলমান থাকতেন। তাঁরা উর্দুভাষী। হিন্দুদের পাড়ায় মুসলমানের বাস আমাদের চোখে কখনো বিসদৃশ বোধ হয়নি। কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে তাঁরা অন্য ধর্মের লোক বলে আমাদের কেউ নন বা আমাদের দুশমন। তাঁদের ধর্ম নিয়ে তাঁরা থাকতেন, আমদের ধর্ম নিয়ে আমরা। সমাজও যার যার তার তার। বাদবাকী বিষয়ে কে হিন্দু ও কে মুসলিম এ গণনা ছিল না। খেলার মাঠে তো নয়ই। খেলোয়াড়দের মধ্যে মুসলমান দেখেছি, তাঁরাও সমান প্রিয়, কখনো কখনো আরো প্রিয়। স্কুলে আমার সহপাঠীদের মধ্যে মুসলমান যারা ছিল তাদের সঙ্গেও আমার ভাব ছিল। কলেজেও তাই। শেষের দিকে আমি মুসলিম হস্‌টেলেই থাকতুম। সেটা পাটনায়। আমার উপর কে জানে কেন তাদের একটা অহেতুক টান ছিল।

অবিভক্ত বঙ্গের নানান জেলায় কর্ম উপলক্ষে বাস করেছি। গ্রাম্য চৌকিদার থেকে আরম্ভ করে গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলার ও মিনিস্টারদের সঙ্গেও মিশেছি। কোনো স্তরেই হিন্দু

মুসলিম ভেদ মানিনি। তাঁরাও যে মেনেছেন তা নয়। হাওয়া বদলাতে শুরু করে ১৯৩৭ সালের পর থেকে। একদিনে নয়, একটু একটু করে। ঠিক দশটি বছর পরে বঙ্গবিভাগ ও ভারতবিভাগ। ঘটনাটা রাতারাতি ঘটলেও তার মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল দশ বছর ধরে। না, তারও বেশী। তবে আমার নিজের জীবনে তার ছায়া পড়েনি। পড়লেও আমি চোখ বুজে রয়েছি।

পার্টিশনের আগে আমি যখন ময়মনসিংহের জেলা জজ তখন আমার কোর্টে একদিন শেরে বঙ্গাল ফজলুল হক সাহেবের পদার্পণ ঘটে। এবার নায়ক মুসলমান, নায়িকা হিন্দু। ততদিনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। হক সাহেব তখন তাঁর নিজের সম্প্রদায়েই অপ্রিয়। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী পদ ঘুচে গেছে। না, তখনকার দিনে বলা হতো প্রধান মন্ত্রী। সেই জাঁকালো চেহারার ঐতিহাসিক পুরুষটি আদালতকে সম্বোধন করে কারুণ্যভরা কণ্ঠে নিবেদন করেন, "ওকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হোক। আফটার অল, হিন্দুজ অ্যাণ্ড মুসলিমস্ উইল হ্যাভ টু লিভ টুগেদের।" যে যাই বলুক, হিন্দুদের আর মুসলমানদের একসঙ্গে থাকতে হবেই।

এর অনুরূপ উক্তি আমি ইউরোপীয়দের মুখেও শুনেছি। পার্টিশনের পরমুহূর্তে কায়দে আজম ঝীণা সাহেবও তো এই কথাই শুনিয়েছিলেন। উজীরে আজম লিয়াকৎ আলী খান্ সাহেবেরও মনের কথা ছিল তাই। হিন্দু মুসলমান যাতে একসঙ্গে থাকতে পারে তার জন্যে কে না চেষ্টা করেছেন? কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এই সেদিন পূর্ববঙ্গ থেকে এককোটি শরণার্থী ছুটে এল। তাদের অধিকাংশই হিন্দু। যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যাবার পর আবার সবাই যে যার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। যুদ্ধ না বাধলে, পাকিস্তান না হারলে তারা ফিরত না। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ সারা হলেও পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ এখনো অসমাপ্ত। একভাবে না একভাবে তারও সমাপ্তি ঘটবে। তার পরে হয়তো দেখা যাবে যে পার্টিশনের সময়

পালিয়ে আসা পাঞ্জাবী ও সিন্ধীরাও যথাস্থানে ফিরে যাচ্ছে। বৃত্ত অমনি করেই শেষ হবে। আফটার অল, হিন্দুজ অ্যাণ্ড মুসলিমস উইল হ্যাভ টু লিভ টুগেদের।

রাষ্ট্র একটা না হয়ে দুটো হতে পারে, দুটো না হয়ে তিনটে হতে পারে, কিন্তু জনগণ দু'ভাগ বা তিনভাগ হয়ে বাঁচতে পারে না। একসঙ্গে যারা থাকে তাদের কারো কারো ঘরও ভাঙে মুখও পোড়ে। যেমন আমাদের পাঠান মাস্টারের। কিংবা হক সাহেব যে মামলাটিতে সওয়াল করেছিলেন তার নায়িকার স্বামী এক গোবেচারা ব্রাহ্মণের। অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? তা সত্ত্বেও একসঙ্গে থাকতে হবে ও রাষ্ট্রের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সে বিশ্বাস ইংরেজদের আইন আদালতের উপর ছিল। পরবর্তী আমলের আইন আদালতের উপর ছিল না, থাকলে এত লোক পালিয়ে আসত না। পালিয়ে কেবল আসেনি, গেছেও। হাঁ, এটাও একটা তথ্য। যেখানে নারীর উপর অত্যাচার হয়নি সেখানে লুটপাট ঘরজ্বালানী হয়েছে, খুনখারাপি হয়েছে।

এখন এই লজ্জাকর অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়লেই বাঁচি। যারা পালিয়ে গেছে তারাও ফিরে আসুক। আবার সেইখান থেকে শুরু করুক যেখান থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। মাঝখানকার চব্বিশটা বছর যেন একটা নির্বাসন। প্রাক্তন প্রতিবেশীরা কেউ কেউ পরস্ব অপহরণ করে লাভবান হয়েছে, কিন্তু সকলে কিছু লাভবান হয়নি। অনেকেই বরঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতবর্ষ হয়তো আর অখণ্ড হবে না, বাংলাও হয়তো আর অখণ্ডতা ফিরে পাবে না, কিন্তু ভারতের তথা বাংলার লোকসমষ্টি আবার সুখে দুঃখে যেমনকে তেমন হতে পারে। তফাতের মধ্যে এই হবে যে কেউ কাউকে শোষণ করবে না। ইতিমধ্যে ওরা শিখেছে যে হিন্দুও হিন্দুকে শোষণ করতে পারে, মুসলমানও মুসলমানকে। তাই যদি না হতো তবে বাংলাদেশের

মুসলমানরা পাঞ্জাবী বা পশ্চিমা স্বধর্মীদের কবল থেকে মুক্তির জন্যে অপরিমেয় রক্তমূল্য দিত কেন? আর এপারেই বা বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিত কেন?

হিন্দুতে মুসলমানে অমিল ছিল বইকি, কিন্তু মিলও ছিল। যতদিন পর্যন্ত তারা মিল সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ছিল ততদিন মুসলমান পক্ষ থেকে ভারত বিভাগের দাবী ওঠেনি, হিন্দুপক্ষ থেকে পাঞ্জাববিভাগের বাংলাবিভাগের দাবী ওঠেনি। এসব দাবী যাঁরা তুলেছে তারাও ভেবে দেখেনি যে তার পরিণাম হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগ। দেশত্যাগ যখন কোটির পর্যায়ে উঠবে তখন তার পরিণাম হবে যুদ্ধবিগ্রহ। এই হলো ঐতিহাসিক নিয়তি, কেউ একে খণ্ডাতে পারে না। আমরা এই প্রবল স্রোতের মুখে বাঁধ দিতে চেষ্টা করেছি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি। যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখা গেল, কিন্তু নিবারণ করা গেল না। যেটা ঘটবার সেটা ঘটবেই। এরই নাম বুঝি হিস্টরিকাল ডিটারমিনিজম।

হিন্দু মুসলমান যতদিন মিল সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ছিল ততদিন দেশবিভাগ প্রদেশবিভাগ চায়নি। অমিল সম্বন্ধে যখন অধিকতর সচেতন হলো তখনি চাইল। তার ফল শেষ পর্যন্ত যা হলো তা যুদ্ধবিগ্রহ। সেইভাবে বৃত্ত সমাপ্ত হলো। এখন আবার যে যার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে। মিল সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হবে। অমিলটাকেই বড়ো করে দেখবে না। একবার যদি একসঙ্গে বাস করার সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে সেইটেই শান্তি ও শৃঙ্খলার সব চেয়ে জোরালো নিশ্চয়তা। হিন্দু রাখবে মুসলমানকে, মুসলমান রাখবে হিন্দুকে। কোথাও হিন্দুরা হয়তো সংখ্যাগুরু, কোথাও মুসলমানরা হয়তো সংখ্যাগুরু। অমন তো আগেও ছিল। কিন্তু কেউ কোনোদিন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি তো। প্রতিবেশীর উপর আস্থা হারিয়ে না ফেললে পালাত না। রাষ্ট্রের উপর আস্থা থাকলেও পালাত না। এখন আস্থা ফিরিয়ে আনার পালা।

পার্টিশনের দশ বিশ বছর আগে থেকে যেমন হিন্দু মুসলমান তাদের অমিল সম্বন্ধে আরো বেশী সচেতন হয় ও শেষকালে দেশভাগ প্রদেশভাগের ধুয়ো ধরে তারই রকমফের দেখা গেল পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায়। যার নাম এখন বাংলাদেশ। মুসলমানদের মধ্যে যারা বাঙালী ও যারা তা নয় তাদের মধ্যেই এল ভাষাভিত্তিক জাতিচেতনা। এটাও একপ্রকার দ্বিজাতিতত্ত্ব। সবাইকার উপর উর্দূ চাপিয়ে মুসলিম লীগ পন্থীরা চেয়েছিলেন এটাকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত। ভাষার জন্যে ছেলেরা জান দিল। তার পর থেকে এত স্পর্শকাতর হয়েছে যে বাংলাভাষায় একটিও আরবী ফারসী শব্দ রাখবে না। এপারের আমরাও ওদের চেয়ে বেশী আরবী ফারসী ব্যবহার করি। ওরা যেন প্রমাণ করতে চায় যে পশ্চিমাদের সঙ্গে ওদের কোথাও কিছু মিল নেই, ধর্ম বাদে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ওরা সেকুলার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধর্ম ওদের কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমষ্টিগত ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নয়। এত বড়ো একটা পরিবর্তন মাত্র চব্বিশ বছরের মধ্যে ঘটেছে। এটা যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। এটা ওরা অন্তর থেকেই পেয়েছে। অনুকরণ থেকে নয়।

এমনি করে এক রাষ্ট্র থেকে দুই রাষ্ট্র হলো, দুই রাষ্ট্র থেকে তিন রাষ্ট্র। এক দুই তিন। তিন পরে একদিন মিলে মিশে এক হবে কি না ইতিহাস জানে। হতে পারে এটা যেমন অসম্ভব নয়, হবেই এটা তেমনি অবধারিত নয়। সব কিছু নির্ভর করছে আমাদের অন্য-নিরপেক্ষ ব্যবহারের উপরে, পারস্পরিক বিশ্বাসের উপরে। আমরা যদি অমিলটাকেই বড়ো করতে থাকি তো তিন থেকে একে উপনীত হওয়া সুদূরপরাহত।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ বহু তপস্যার পরে স্বাধীন হয়েছে, সে তার স্বাধীনতা নিছক একত্বের খাতিরে বিসর্জন দেবে না। পাকিস্তানের কাছেও না, ভারতের কাছেও না। বাংলাদেশ থাকতে

এসেছে। থাকবেই। ভারতকেও সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, সে যেন বাংলাদেশের উপর ভুলেও চাপ না দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদেরও সতর্ক থাকতে হবে। তারাও যেন তেমন কোনো প্রত্যাশা না করে। বাংলাদেশ স্বাধীন। যে স্বাধীন সে ভালোর জন্যেও স্বাধীন, মন্দের জন্যেও স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সে মন্দও করতে পারে। যদি করে তবে পালটা দেবার স্বপ্ন যেন কেউ না দেখে। কোনো অবস্থাতেই আমরা পালটা দেব না। তেমন কথা মুখেও আনব না, মনেও আনব না। ইচ্ছা করে কেউ মন্দ করে না। বাংলাদেশেও করবে না। বিশেষত ভারতের মন্দ। তবে এটাও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বামদিকে যাবে, আমাদের চাইতেও বেশী। পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে সম্পর্কটা মধুর থাকবে না। একদিন ধর্মান্ধ বলে যাদের উপর চটেছি আরেকদিন সাম্যবাদী বলে তাদের ছেলেদের উপর চটব। তা বলে সংযম হারাব না। সহ অবস্থানের জন্যে প্রস্তুত থাকব।

বলাই বাহুল্য যে পাকিস্তানও থাকতে এসেছে। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও বাকী স্থান থাকবে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি অটোনমির ভিত্তিতে তার পুনর্বিন্যাস হবে। সে তার আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে ভারতকে জ্বালাতন করবার সময় পাবে না। বাংলাদেশকে তো নয়ই। বাধ্য হয়ে মিটমাট করবে। তবে তার রাগ পড়তে আরো অনেকদিন লাগবে। আর তার প্যান ইসলামিক মোহভঙ্গ হতে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল শৃঙ্খলের সে অঙ্গ। এর থেকে সে যে শক্তি পায় তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে পায় না। পেলে পৃথক হয়ে যেত না। যেদিন আর পাবে না সেদিন ভারতের দিকে হাত বাড়াবে। আমাদের চোখে পাকিস্তান ভারতীয় ইতিহাসের একটি ফসল। পাকিস্তানীদের কাছে ইসলামের ইতিহাসের। ইতিহাস যখন ওরা পড়ে তখন ইসলামের আদিপর্ব থেকেই শুরু করে।

ভারতের জাতীয়তাবাদ দেশভিত্তিক। পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ ধর্মভিত্তিক। আর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। এই যে তিনপ্রকার জাতীয়তাবাদ এর বীজ গত শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে আসে। আমার ছেলেবেলায় আমি তিনটিরই প্রভাব দেখেছি। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রীস্টান পার্শী নির্বিশেষে সব ভারতীয়কেই আহ্বান জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস ছিল সকলের মিলনক্ষেত্র। কথা ছিল কংগ্রেস হবে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের বেসরকারী সমালোচকমণ্ডলী। সংবিধানসিদ্ধ প্রথায় শাসনসংস্কার চাইবে। কিন্তু মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে আকারে ও সংখ্যায় লোকসভায় পরিণত হয়। কংগ্রেস সভাপতি হয়ে ওঠেন বড়লাটের বেসরকারী প্রতিনায়ক। তখন শাসকদের টনক নড়ে। তা হলে কি কংগ্রেসই ব্রিটিশ সরকারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে এত বড়ো দেশ একাই শাসন করবে? তার হাতে ব্রিটিশ স্বার্থের কী দশা হবে?

এই চিন্তা থেকেই বঙ্গভঙ্গ, এর থেকেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকারের একমাত্র প্রতিপক্ষ হতে না দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়কে তার প্রতিপক্ষ রূপে খাড়া করা হয় বা খাড়া হতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তার আগে তৎকালীন বেঙ্গলকে দু'ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি মুসলিমপ্রধান প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য করা হয়। কংগ্রেস যখনি যা চাইবে লীগ তখনি তার পালটা চাইবে। কর্তারা যা দেবার তা দু'ভাগ করে দেবেন। লীগকে অংশ না দিলে কংগ্রেস তার পাওনা পাবে না। আর লীগকে তার অংশ দিলে কংগ্রেস আর বলতে পারবে না যে সেই ভারতীয়দের সকলের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান।

পরিস্থিতি জটিল তাতে সন্দেহ নেই। তাকে জটিলতর করেন কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে কর্মরত চরমপন্থী নেতারা। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের স্বাধীনতা অস্ত যায় পলাশীতে নয়, তার অনেক

আগে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ে। হিন্দু ভারতটাই ছিল তাঁদের মতে স্বাধীন ভারত, মুসলিম ভারত নয়। সুতরাং কেবলমাত্র ইংরেজ শাসনের অবসান নয়, হিন্দু ভারতের পুনরুজ্জীবনও ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা যদি হিন্দু ভারত ফিরিয়ে আনতেন তা হলে সেখানে মুসলমানদের স্থান হতো কী করে? তাদের স্বার্থ রক্ষা করত কে? ইংরেজ চলে গেলে যদি মুসলমানকেও চলে যেতে হয় তবে মুসলমান তো ইংরেজের সঙ্গে লড়তে যাবে না, উল্টে ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে চাইবে।

ইংরেজের বেলা যাঁরা চরমপন্থী মুসলমানের বেলা তাঁরা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। আর ইংরেজের বেলা যাঁরা নরমপন্থী মুসলমানের বেলা তাঁরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী। হিন্দু বা মুসলিম কোনো আমলেই গণতন্ত্র ছিল না। সেটা যদি মূল্যবান হয়ে থাকে তবে ইংরেজের কাছ থেকেই শিক্ষা করতে হবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস থেকে। ইংরেজ শাসনের অবসানে যখন কংগ্রেস শাসনের সূত্রপাত হবে তখন সেটাও হবে ইংলণ্ডের মতো গণতান্ত্রিক শাসন। পৃথ্বীরাজের স্বৈরাচারী শাসন নয়।

চরমপন্থীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটে যায়। কংগ্রেস পরিচালনা করেন নরমপন্থীরা। তাই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ঝীণা। ইংরেজী কেতায় জিনা। দেশী উচ্চারণে জিন্না। ভুল আরবীতে জিন্নাহ্। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেকুলার সংজ্ঞায় তাঁর সমর্থন ছিল। তিনিও ছিলেন একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী। তবে তিনি সেইসঙ্গে মুসলিম লীগের সদস্যও ছিলেন। কারণ তাঁর মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ স্বার্থ ছিল যার জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান না হলে চলত না। যেমন চাকরিবাকরিতে সংখ্যানুপাতিক ভাগ, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিতে যথোপযুক্ত সংখ্যায় আসন। কংগ্রেস তো কোনো একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করবে না, তবে সে কাজ করতে উদ্যোগী হবে কে? মুসলিম লীগ, আর কে?

তা বলে ঝীণা হিন্দু জাতীয়বাদীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। হয়ে দাঁড়ান কালক্রমে। প্রায় চল্লিশ বছর রাজনীতিতে অংশ নিয়ে। তাঁর এই মোড় একদিনে সম্ভব হয়নি। তাঁর আগে যাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের কংগ্রেসবহির্ভূত নেতা ছিলেন তাঁরা ছিলেন ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী নরমপন্থী অথবা তার বিরুদ্ধবাদী চরমপন্থী। নরমপন্থীরা মুসলিম লীগের নেতা। চরমপন্থীরা মোল্লা মৌলবী মৌলানাদের নেতা। নরমপন্থীরা মোগল আমল ফিরিয়ে আনতে চান না। গণতন্ত্রে যথোপযুক্ত স্থান পেলেই খুশি। চরমপন্থীরা চান শরিয়তী শাসনের প্রত্যাবর্তন। ইসলামের পুনরুজ্জীবন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণ নয়, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের অনুরূপ মুসলিম রাষ্ট্র। সারা ভারতে কী করে সেটা বাস্তব রূপ নিতে পারে, এই ছিল তাঁদের সমস্যা। পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের সমস্যার সমাধান পেয়ে যান। পাকিস্তান সেই বাস্তব রূপ। সারা ভারতে নয়, ভারতের দুই প্রান্তে। একভাগ উত্তরপশ্চিমে, অপর ভাগ উত্তরপূর্বে। কাশ্মীর তো তাঁদের দাবীর তালিকায় ছিলই, আসামও ছিল। ইতিহাস তাঁদের মনস্কামনা বহুলাংশে পূরণ করে। অথচ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বেলা করে না।

ইংরেজরা শেষপর্যন্ত দুটি উত্তরাধিকারীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। কংগ্রেসের হাতে দেশভিত্তিক ভারত। লীগের হাতে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান। লীগ ততদিনে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের দল হয়ে তার ভারতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়েছিল। অনায়াসেই দিল্লী আগ্রার উপর দাবী ছেড়ে দিয়ে করাচীতে প্রস্থান করল। তখন থেকে সে আর নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নয়। নিখিল পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস কিন্তু নিখিল ভারতীয় থেকে যায়। যদিও তার এলাকা আগের মতো ব্যাপক নয়।

দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বহুপরিমাণে সফল হলো। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদও হিন্দুদের বেলা না হোক মুসলমানদের বেলা বহু-

পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করল। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় যে ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেখেছিলুম তার ফলশ্রুতি কী হলো? সে কি তা হলে বঙ্গবিভাগ দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হলো?

লর্ড কার্জনের কার্যের প্রতিবাদে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। বাঙালী বলে একটি জাতি হঠাৎ আপনাকে আবিষ্কার করে ও আপনার প্রকাশ চায়। স্বদেশী আন্দোলন কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে না। ভাষায় সাহিত্যে চিত্রকলায় সঙ্গীতে শিল্পকর্মে শিক্ষাদীক্ষায় সঞ্চারিত হয়। ধর্মও তাতে একটা বৃহৎ অংশ নেয়। ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা না পেলে তরুণরা হাসিমুখে ফাঁসী বরণ করত না। কিন্তু ধর্ম সেক্ষেত্রে ইসলাম নয়। ইসলাম থেকে প্রেরণা পেয়ে কেউ ফাঁসীও যায়নি, গুলীর সামনেও দাঁড়ায়নি। সেই আন্দোলনে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল কিন্তু মুসলমানদের অধিকাংশকেই ভোলানো হয়েছিল এই বলে যে পূর্ববঙ্গ ও আসামে তারাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের স্বার্থেই তো বঙ্গভঙ্গ হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তারাই তো হবে সংখ্যালঘু। তাই মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়।

অবশেষে এমন একটা সূত্র পাওয়া যায় যাতে বঙ্গভঙ্গ রদও হয়, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠও হয়। বিহার ওড়িশা মিলে আলাদা প্রদেশ হয়। আসামও আলাদা হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা থাকে তাকেই বলা হয় বঙ্গ। তাতে হিন্দুরা বনে যায় সংখ্যালঘু। সিংহভূম মানভূম যদি তার সামিল হতো তা হলে হিন্দু মুসলমান সমসংখ্যক হতো। কিন্তু সীলেট তার সামিল হলে হিন্দু মেজরিটি আর কিছুতেই হবার নয়। বাঙালী হিন্দুরা সেই প্রথম অনুভব করে যে বঙ্গ আর পূর্বেকার বঙ্গ নয়, তারাই সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নয়। অবশ্য তাদের সংখ্যাগুরুত্বও অনন্যনিরপেক্ষ ছিল না। ছিল বিহারী ওড়িয়া হিন্দুদের কল্যাণে।

বঙ্গদেশের পুনর্বিন্যাসের কিছুকাল পরে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের

যে চুক্তি হয় জীণা সাহেব ছিলেন তাতে বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী। প্রধানত তাঁরই মধ্যস্থতায় স্থির হয়ে যায় যে হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানরা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী আসন পাবে প্রাদেশিক আইনসভায়। তেমনি মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে হিন্দুরা ও শিখরা পাবে তাদের প্রাপ্যের অধিক আসন। এর ফলে পুনর্বিন্যস্ত বঙ্গে হিন্দুদের আসনসংখ্যা প্রাপ্যের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুরা ভুলে যায় যে তারা মাইনরিটি। বাংলার মুসলমানরা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের মুখ চেয়ে নিজেদের স্বার্থ কিছুটা ছেড়ে দেয়। তারাই যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এটা কিন্তু ভোলে না। পূর্ববঙ্গে তারা যা ছিল যুক্তবঙ্গেও তারা তাই। গণতন্ত্রে এর একটা প্রতিফলন পড়বেই। চাকরিবাকরির বেলা তাদের সংখ্যানুপাত মানতে হবেই।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এর পরেও যথেষ্ট তীব্র ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে বাঙালীরা একটি নেশন, সেই নেশনের যে বাসভূমি তাকে দু'ভাগ করলে নেশনকেই দু'ভাগ করা হয়। নেশন কথাটি যে বাঙালীদের বেলা ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেকালের দলিলে। বাঙালীরা অবশ্য ভারতের বাইরে যেতে চায়নি। ভারতের ভিতরে থেকেই নেশন হতে চেয়েছে। ভারতবর্ষ তা হলে কী? নেশন না মহানেশন? এসব চিন্তা অনেকদিন পর্যন্ত অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। রবীন্দ্র-নাথ যখন নাম রাখেন "মহাজাতিসদন" তখন ভারতবর্ষকে একটি মহা-নেশন রূপেই কল্পনা করেছিলেন। তার মানে বাংলাকে একটি নেশন রূপে। জবাহরলালও একবার বলেছিলেন ভারতবর্ষ হবে একটি মালটিন্যাশনাল স্টেট। কমিউনিস্টরা তো চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে চোদ্দ পনেরোটি নেশন স্টেট প্রতিষ্ঠা করতে। প্রত্যেকটি হতো ভাষা-ভিত্তিক।

মাউন্টব্যাটেন একটা বিকল্প পরিকল্পনা করেছিলেন। কংগ্রেস

লীগ একমত না হলে তিনি প্রদেশওয়ারি ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। অবিভক্ত বঙ্গ ১৯৪৭ সালেই স্বাধীন দেশ হতো। বলা বাহুল্য সেটা হতো মুসলিমপ্রধান দেশ। ইতিমধ্যে র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের রোয়দাদ কংগ্রেস লীগ চুক্তির উপর খোদকারী করে মুসলমানদের অনুপাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর হিন্দুদের অনুপাত কমিয়ে দিয়েছিল। পরিবর্তিত অবস্থায় হিন্দুরা স্বাধীন বঙ্গে নিরাপদ বোধ করে না। তার চেয়ে দ্বিতীয়বার বঙ্গবিভাগ দাবী করে। ভুলে যায় যে একদা তাদেরি নেতাদের মতে বাঙালীরা একটি নেশন। বাংলাদেশকে ভাগ করলে বাঙালী নেশনকেও ভাগ করা হয়।

তা ছাড়া ইতিমধ্যে বাঙালীদের মানসিক বিবর্তনও হয়েছিল। "বন্দে মাতরম্" গাইতে গিয়ে তারা আর "সপ্তকোটি" বলত না। বলত "ত্রিংশকোটি"। আবার তাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যেত না। এমন কি হিন্দুদের সংখ্যাগুরু করে দিলেও। ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বাঙালী হিন্দুরা বাংলাদেশকে সমান ভালোবাসলেও তাকে ভারতের বাইরে যেতে দেবার পক্ষপাতী ছিল না। অন্যান্য প্রদেশ মিলে ভারতরাষ্ট্র গঠন করতই। বাদ পড়ত শুধু বাংলার মতো কয়েকটি প্রদেশ যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন নয়। তার চেয়ে দু ভাগ হয়ে যাওয়া শ্রেয়।

এতদিন বাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটাও একটি মন-স্কামনার পরিপূর্তি। যদিও এর আয়তন পূর্ণাঙ্গ নয় তবু এর সত্তা খণ্ডিত নয়। এ কেবল মুসলমানদের দেশ নয়। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান সকলেই এদেশে সম অধিকারী। বিশেষ সুবিধা কেউ দাবী করছে না, কারুকে দেওয়া হচ্ছে না। এর জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী যুগের প্রিয় সঙ্গীত। স্বদেশী যুগই আবার অন্য নামে ফিরে এসেছে। স্বদেশী ভাষাকেই সবার উপরে স্থান দিচ্ছে। স্বদেশী সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার করছে। পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে না এলে

এসব সম্ভব হতো না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ছায়া থেকে সরে না এলে এই চারাগাছটি বাঁচত না, বাড়ত না। এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দেশভিত্তিকও বটে। এর প্রতিষ্ঠাতারা দেশানুরাগী।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই ত্রয়ীকে নিয়েই আমাদের উপমহাদেশ। এই ত্রয়ী দীর্ঘজীবী হোক। এখন থেকে আমাদের আদর্শ হবে একে তিন, তিনে এক।

নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিপাত

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ও অবিভক্ত বঙ্গে যদি মাইনরিটি সমস্যা না থাকত কিংবা তার সমাধানে অনতিক্রমণীয় বাধা না থাকত তবে দেশবিভাজন বা প্রদেশবিভাজন কোনোটাই ঘটত না। ঘটল যে তার অন্যান্য কারণ থাকলেও মূলকারণ দীর্ঘকালের অমীমাংসিত মাইনরিটি সমস্যা। সে সমস্যা যে কত জটিল তার একটিমাত্র উদাহরণই যথেষ্ট। আমরা হিন্দুরা মনে করতুম আমরা মাইনরিটি, কারণ অবিভক্ত বঙ্গে আমাদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে কম। আবার মুসলমানরা মনে করতেন তাঁরা মাইনরিটি, যেহেতু অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দুদের চেয়ে তাঁদের সংখ্যা কম।

একই মানুষ একই কালে মেজরিটি তথা মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতবর্ষে মেজরিটি, বঙ্গদেশে মাইনরিটি। কিংবা ভারতবর্ষে মাইনরিটি, বঙ্গদেশে মেজরিটি। একই মানুষ একই কালে মেজরিটি তথা মাইনরিটির দায়িত্ব পালন করতে পারে না, বরঞ্চ দায়িত্ব এড়াতেই চায়। বেকায়দায় পড়লে তৃতীয় পক্ষকে দোষ দেয়। তার মানে ইংরেজ সরকারকে। ইংরেজ যতদিন ছিল ততদিন আমরা ভাবের ঘরে চুরি করেছি। নিজেরা প্রাণপণ চেষ্টা করে সমস্যার মূল উৎপাটন করিনি। যেটা করেছি সেটা পরাধীনতার মূলোৎপাটনের চেষ্টা। সেটা যে অবশ্যকরণীয় ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ করবে কে? তবু ইতিহাস একথাও লিখবে যে তা ছাড়া আরো একটা অবশ্যকরণীয় কর্মও ছিল। মাইনরিটি সমস্যার সর্বসম্মত মীমাংসা। সেখানে আমরা কিছুদূর এগিয়েই হাল ছেড়ে দিয়েছি। ইংরেজ তো আগে বিদায় হোক, তারপরে মাইনরিটি সমস্যা ধীরে সুস্থে মেটানো যাবে। এই মনোভাবই অবশেষে পার্টিশন ডেকে আনে।

পার্টিশনের ফলে স্থির হয়ে যায় যে পাকিস্তানে ও তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রদেশে মুসলমানরাই মেজরিটি, আর হিন্দু শিখ খ্রীস্টান বৌদ্ধরা মাইনরিটি। তেমনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে ও তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রদেশে বা রাজ্যে হিন্দুরাই মেজরিটি, আর মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শীরা মাইনরিটি। একই মানুষ একই কালে মেজরিটি তথা মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। ব্যতিক্রম কেবল কাশ্মীরের বেলা। তা ছাড়া এপারে মুর্শিদাবাদ জেলা, ওপারে খুলনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাও ছিল ব্যতিক্রম। রাষ্ট্র যদি সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হয় তা হলে এরকম দুটো একটা ব্যতিক্রম ক্ষতিকর হয় না। তা না হয়ে যদি হিন্দুরাষ্ট্র বা ইসলামিক স্টেট হয় তা হলে দুর্ভোগের অবধি থাকে না। মাইনরিটি প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালায়, দুই রাষ্ট্রে লোকবিনিময়ের ধুম পড়ে যায়, শরণার্থীদের চাপ যুদ্ধ ডেকে আনে।

পূর্ব বাংলার মুসলমানরা আগেও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মেজরিটি ছিল, পাকিস্তান হওয়ায় তাদের লাভের মধ্যে হলো এই যে তারা আর ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মাইনরিটি রইল না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক উভয় স্তরেই তারা হলো মেজরিটি। তাদের দিক থেকে পার্টিশনের এইটুকুই যা নীট লাভ।

পরে বোঝা গেল যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্তরে মেজরিটি হলেও তারা মেজরিটির অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের যারা বঞ্চিত করেছে তারা তাদেরই ধর্মভ্রাতা। কেবল যে কেন্দ্রীয় স্তরে বঞ্চিত করেছে তাই নয় প্রাদেশিক স্তরেও তাদের দাবিয়ে রেখেছে। দেখা গেল পার্টিশনের পূর্বে তাদের নিজেদের প্রদেশে তাদের যে ক্ষমতা ছিল পাকিস্তানের সামিল হয়ে সে ক্ষমতাও কমতির দিকে। শেষে তো সামরিক কর্তারা সমস্ত ক্ষমতাই কুক্ষিগত করলেন। লাভের চেয়ে লোকসানের বহর হলো বেশী। গণতন্ত্রের নামে বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলো, সেটা সামরিক শাসনেরই ছদ্মবেশ। পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা বঞ্চিত ও তাদের রণনায়কদের দ্বারা প্রবঞ্চিত

হয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ধীরে ধীরে মনঃস্থির করে যে, পাকিস্তানে থাকলেও তারা সব বিষয়ে কেন্দ্রাধীন হবে না, তিনটি ছাড়া আর সব বিষয়ে স্বনির্ভর হবে।

নির্বাচনের ফলাফল দেখে পশ্চিম পাকিস্তানী রণনায়ক ও জননায়কদের উচিত ছিল তিনটি বিষয় কেন্দ্রের অধীনে রেখে আর সব প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তাঁদের কাছে বড়ো হলো শক্তিশালী কেন্দ্র। যে কেন্দ্রের রাজধানী পশ্চিমে। যার কলকাঠি পশ্চিমাদের হাতে। যার মাথার উপরে পশ্চিমা মিলিটারি ডিকটেটর। সেইরূপ অবস্থায় বিচ্ছেদ অনিবার্য। সংগ্রাম অপরিহার্য। সংগ্রাম যারা করবে তারা তিনটে বিষয় ছেড়ে দিয়ে বাকীটার জন্যে করবে কেন? ষোল আনার জন্যেই করবে। এমনি করে মানুষের মন স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত হয়।

নয় মাস সংগ্রামের পর ভারতের সহায়তায় সংগ্রামীরা জয়যুক্ত হয়েছে। ভারত যোগ না দিলেও যে তারা জয়ী হতো না তা নয়। হতো ঠিকই, তবে আরো কিছুকাল দেরি হতো। সেই অবসরে আরো কয়েক লক্ষ নিহত হতো। আরো এক আধ কোটি শরণার্থী হতো। ভারতের যোগদান সময় বাঁচিয়েছে, প্রাণ বাঁচিয়েছে, দুর্ভোগ বাঁচিয়েছে। তা হলেও একথা মানতেই হবে যে সংগ্রামের তুফানটা প্রধানত পূর্ব বাংলার জনগণের উপর দিয়েই গেছে। আগের বছরের তুফানের মতো এবছরের তুফানেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে। তফাতের মধ্যে সেটা ছিল প্রাকৃতিক আর এটা হলো মানুষিক বা অমানুষিক।

তুফানের শেষে আকাশ এখন পরিষ্কার। পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন। স্বাধীন হয়ে তার নাম এখন বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সঙ্গে তার আর পৌর্বাপর্য নেই। ইসলামিক স্টেট সে স্বীকার করে না। ভারতের মতো সেও একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেও চায় গণতান্ত্রিক সংবিধান। তথা প্রজাতান্ত্রিক মর্যাদা। তার নামকরণ

হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভারতের মতো সেও সমাজতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা করতে উন্মুখ।

এত বড়ো একটা এপিক সংগ্রামের পর এর কমে কেউ সন্তুষ্ট হতো না। কেউ কেউ তো এতেও সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় বুর্জোয়াদের হাত থেকে উদ্ধার। মুক্তি বলতে তারা বোঝে বাঙালী শোষক শ্রেণীর কবল থেকে মুক্তি। কিন্তু মাত্র নয় মাসের সংগ্রামে ষোল আনা স্বাধীনতা পাওয়াও অনেক বেশী পাওয়া। ষোল আনার উপর আঠারো আনা প্রত্যাশা করলে নয় মাস কেন, নয় বছর লেগে যেত। ভিয়েৎ নামের মতো।

এ সংগ্রাম শ্রেণীর ইস্যুতে হয়নি, শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধেও হয়নি। হয়েছে গণতান্ত্রিক স্বাধিকার তথা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কারণ হিন্দুরাও এই সংগ্রামের শরিক। আর ভারত এর সহায়। তিনটি ইস্যুতেই পশ্চিমারা হেরে গেছে। তাদের সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করেছে। তারা বিতাড়িত হয়েছে। চতুর্থ ইস্যু যদি থাকে তবে তার নাম সমাজতন্ত্র। তার জন্যে শ্রেণীযুদ্ধের কী দরকার? অন্তত নতুন সরকারকে একটা সুযোগ দিয়ে তো দেখা যাক। তাঁরা শোষক শ্রেণীকে শাসন করতে পারেন কি না।

নতুন রাষ্ট্রের স্তম্ভ তা হলে চারটি। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে গতি। এর সঙ্গে আরো একটি মূলনীতিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। গোষ্ঠীনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। কিন্তু বাংলাদেশবিরোধীরা যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয় তবে বাংলাদেশকেও অপর একটি গোষ্ঠীর দিকে হেলতে হবে। নয়তো তার গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা তাকে বিপন্ন করবে।

এখন ভিত্তিস্থাপনের সময়। এখন থেকেই ওই চারটি স্তম্ভের উপর জোর দিতে হবে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে এর যে কোনো একটির জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। চারটির জন্যে তো

চতুর্গুণ দাম দিয়েছে। বাংলাদেশ যা দিয়েছে তা অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ও চার-চারটি ফাণ্ডামেণ্টাল ইস্যুর উপর নজর রাখলে অত্যধিক মূল্য নয়। সোনার বাংলা, মোতির গণতন্ত্র, হীরার ধর্মনিরপেক্ষতা, পান্নার সমাজতন্ত্র—এই যদি হয় নীট লাভ তবে যা হারিয়েছে তা সার্থক। এসব জিনিস আরো সস্তায় মেলে না। মিললেও টেকে না।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ যদি এতই মূল্যবান হয় তবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা তার জন্যে যথোচিত মূল্য দিইনে কেন? এর উত্তর, আমরা ইতিমধ্যেই একটি বহুভাষিক রাষ্ট্রে যোগ দিয়ে বহুভাষিক জাতীয়তাবাদ মেনে নিয়েছি। আমাদের সামনে সুইটজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত, যদিও তার সঙ্গে তফাৎও আছে। সেটা হিন্দীর একাধিপত্য। তা নিয়ে একদিন গণ্ডগোল বাধতে পারে। যাতে না বাধে তার জন্যে যথাসাধ্য করে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। তা না করে আমরা ভারতকে বলকানে পরিণত করতে যাব না। বাংলাদেশের পক্ষে যেটা বাঁচবার পথ আমাদের পক্ষে সেটা মরবার পথ। কেউ যদি চোখ বুজে বাংলাদেশের অনুকরণ করতে যায় তা হলে কেবল ভারতের নয়, নিজেরও অনিষ্ট করবে। কারো কারো মাথায় এ ধরনের চিন্তা আছে তা আমি জানতুম বলেই বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাইনি। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে মিশে ফেডারেশন বা কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার কথাই ভেবেছি। কিন্তু ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নেয়। পঁচিশে মার্চ একটি ঐতিহাসিক মোড়। সেই কালরাত্রির করাল ঘাতকতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর আর কে ফেডারেশনে বা কনফেডারেশনে রাজী হবে? পঁচিশে মার্চ যদি ভালোয় ভালোয় যেত তা হলে হয়তো রাজী হতো।

বাংলাদেশ বাধ্য হয়ে যে পথ নিয়েছে আমরা সে পথ নিতে বাধ্য নই। আমরা আমাদের বহুভাষী রাষ্ট্রকেই শক্তিশালী করব

আমাদের প্রথম স্তম্ভ বহুভাষী জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তানেরও হতে পারত, যদি বাংলাভাষার উপর অন্যায় না করা হতো। মাতৃভাষার উপর অন্যায় কোন মানুষ সহ্য করতে পারে। কোথাও কি করেছে! পাকিস্তানের ভাঙন শুরু হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার থেকে। তেমন কোন ঘটনা এখনো এদেশে ঘটেনি। যদি ঘটে তা হলে এদেশেও ভাঙন ধরতে পারে। আমাদের কাজ হবে ভাষার প্রশ্ন অত বেশী বাড়িয়ে না দেখা। তামিল নাড়ে কতক ব্যক্তি এই প্রশ্নে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। তার ফলে হিন্দী সেখান থেকে নির্বাসিত হয়েছে। তামিলরা এখনো সে সন্তাপ ভোলেনি। আবার তাদের প্রাণে আঘাত দিলে তারা বাংলাদেশের পথ ধরতে পারে। এক হিসাবে বাংলাদেশ একটা ওয়ার্নিং।

মুক্তির পরে

॥ ১ ॥

আবহমান কাল থেকে বহু সম্প্রদায় ও বহু ভাষা। সংখ্যার দিক থেকে কোনো একটি সম্প্রদায় গরিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু সেই কারণে সে দাবী করতে পারে না যে সে একাই একটি নেশন। দেশকে দ্বিখণ্ড করলেও পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায় কখনো সম্প্রদায় থেকে নেশনে উন্নীত হতে পারে না। অন্যান্য সম্প্রদায়কে মেরে তাড়িয়ে দিলেও মুসলিম সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। আর ঊর্ধ্বে না উঠলে নেশনে পরিণত হতে পারে না। নেশন বলে পাকিস্তান পরিচয় দিলেও নেশন সে নয়। নেশন বরঞ্চ বাংলাদেশ। সে সাম্প্রাদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠেছে। এর পরেও যদি পাকিস্তানের শিক্ষা না হয় তবে সে ভেঙে টুকরো টুকরো হবে। ইসলাম তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের এই রাষ্ট্রের হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলিরও এর থেকে শিক্ষা করা উচিত যে, গান্ধীজী ও কংগ্রেস বাধা না দিলে—গান্ধীজী প্রাণ না দিলে—এ রাষ্ট্রেও সত্যিকার নেশন গড়ে উঠত না। হিন্দুরা একাই একটা নেশন ছিল হাজার বছর আগে, কিন্তু হাজার বছর হলো তা নয়। অসত্যকে সত্য বলে চালাতে গেলে উপস্থিত কিছু সুবিধা হতে পারে, কিন্তু আখেরে পাকিস্তানের মতোই পরিণাম। এখন তাদের মতিগতি শোধরাবার সময় এসেছে। একই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের উর্দূভাষী তথা ভারতের হিন্দীভাষীদের জন্যেও। সামান্য সুইটজারল্যাণ্ডও চারটি ভাষাকে সমান রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। কে বড়ো কে ছোট গণনা করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এক্ষেত্রে গণনীয় নয়। উর্দূ

তো সংখ্যাগরিষ্ঠতাও দাবী করতে পারে না পাকিস্তানে। ভারতে হিন্দী যদিও তেমন দাবী করে তবু এটা তো সত্য যে তার নিজের এলাকার বাইরে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। স্বেচ্ছায় যারা হিন্দী শিখতে চায় তারা শিখুক, কিন্তু জাতীয় স্বার্থে সবাইকে হিন্দী শিখতে বাধ্য করলে ও হিন্দীশিক্ষিতদের বিশেষ সুবিধাভোগী করলে এই ইস্যুতেই ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ইংরেজীর স্থান হিন্দী পূরণ করতে পারে না। এটা একটা ভ্রান্তি। ইংরেজী উঠে গেলেই সকলে টের পাবে যে সবাইকে একত্র করার শক্তি হিন্দীর একার নেই। তখন সব ক'টা প্রধান ভাষাকেই সমান রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। সেটা যদি অবাস্তব হয় তো ইংরেজীও হিন্দীর পাশাপাপি থাকুক। মর্যাদা না হয় তার খাটো হলো। হিন্দ্‌ হিন্দু হিন্দী যতদিন সমার্থক হবে ততদিন আমাদেরও বিপদ কম নয়। তামিলরা যে কোনোদিন অটোনমির ছয় দফা দাবী পেশ করতে পারে। পরে পৃথক নেশন গড়তে পারে।

॥ ২ ॥

সেকুলার স্টেট মধ্যযুগে পৃথিবীর কোনোখানেই ছিল না। এটা আধুনিক যুগেই বিবর্তিত হয়েছে। এখনো সর্বত্র প্রবর্তিত হয়নি। সেকুলার স্টেট বলতে এই বোঝায় যে রাষ্ট্র কোনো একটি ধর্মের দ্বারা বিশেষিত নয়। সে হিন্দুরাষ্ট্রও নয়, মুসলিম রাষ্ট্রও নয়, খ্রীস্টান রাষ্ট্রও নয়। সব ক'টা ধর্মকে একত্র করলেও তারা সবাই মিলেও রাষ্ট্রকে বিশেষিত করতে পারে না। কারণ নাস্তিকদেরও সমান স্থান। তারাও ট্যাক্স জোগায়, যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দেয়, জ্ঞানবিজ্ঞানকে এগিয়ে দেয়, দেশকে শিল্পোন্নত করে। তা বলে সেকুলার স্টেট যে কেবল নাস্তিকদের নিয়েই হবে তা নয়। ধার্মিকরাও থাকতে পারে, ধর্মকর্ম করতে পারে। তবে ধর্মের জন্যে কোনো বিশেষ সুবিধা দাবী করতে

পারে না। রাষ্ট্রও ধর্মের জন্যে কিছু খরচ করতে বাধ্য নয়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম। রাষ্ট্রধর্ম নয়। সেকুলার স্টেটে কোনো স্টেট রিলিজন নেই। যেখানে স্টেট রিলিজন আছে সে স্টেট সেকুলার স্টেট নয়। ভারতের লোক—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলিমই হোক আর শিখ বা খ্রীস্টানই হোক—এখনো রাষ্ট্রের কাছে ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করে। আমরাও চাইনে যে তারা নাস্তিক হয়ে যায়। মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান অতি মহৎ। কিন্তু ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে এত বেশী বাদ বিসম্বাদ ও এত রক্তপাত হয়েছে যে রাষ্ট্রকে তার উর্ধ্বে তুলতে না পারলে মধ্যযুগেই পড়ে থাকতে হবে। যেমন পড়ে রয়েছে পাকিস্তান। এই সেদিন সেখানকার লোক জেহাদে নেমেছিল। এখানে আমরা একজন পার্শীকে করেছি সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ, একজন ব্রাহ্ম আমাদের আকাশ সেনার অধ্যক্ষ, বিস্তর খ্রীস্টান শিখ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আমাদের আর্মিতে নেভিতে এয়ার ফোর্সে। কী চমৎকার টীম ওয়ার্ক দেখিয়েছেন তাঁরা। আমি শান্তিবাদী, কিন্তু আমি দেখছি যুদ্ধ আমাদের যতখানি সেকুলার করে শান্তি ততখানি নয়। আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স যে পরিমাণে সেকুলার অন্যান্য সার্ভিস সে পরিমাণে নয়। সব সার্ভিস সেইরূপ সেকুলার না হলে মঙ্গল নেই। মুসলিমরা অধিকাংশ সার্ভিসে অনুপস্থিত বা অল্প উপস্থিত। কখনো নিজ দোষে, কখনো অপরের দোষে। খ্রীস্টানরাও একই অভিযোগ করে। তবে পার্শী বা শিখদের তেমন কোনো নালিশ শোনা যায় না। সেকুলার স্টেট যদি কার্যত হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে তাকে সংশোধন করা উচিত। প্রতিযোগিতায় যারা পেরে ওঠে না তাদের জন্যে কিছু একটা করা দরকার। কলকারখানায় ব্যবসাবাণিজ্যে কোথাও না কোথাও তাদের ভিড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হলেই মানুষ অপদার্থ হয়ে যায় না। সে কিসের উপযুক্ত সেটা জেনে নিয়ে সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। সোশিয়ালিস্ট

স্টেটে সবাই কাজ পায় কী করে? শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

॥ ৩ ॥

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে—বিশেষ করে বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে—সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান আমার বহুদিনের ধ্যান। কিন্তু ১৯৫২ সালে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্যমেলার পুনরাবৃত্তি আজ অবধি সম্ভব হয়নি। শান্তিনিকেতনেই হোক আর কলকাতায়ই হোক প্রত্যেক বছর সাহিত্যমেলা বসবে। উভয় রাষ্ট্রের সাহিত্যিকরা যোগ দেবেন। অনুরূপ মেলা বাংলাদেশেও অনুষ্ঠিত হবে। চট্টগ্রামে, রাজশাহীতে, ঢাকায়। তা ছাড়া বইপত্রের চলাচলের উপর কোনোরকম বাধানিষেধ থাকবে না। এখানকার পত্রিকা ওখানেও প্রচারিত হবে, ওখানকার পত্রিকা এখানেও। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অধ্যাপক বিনিময় হবে। বক্তৃতা দেবার জন্যে আমরাও ওপারে যাব, ওঁরাও এপারে আসবেন। ছাত্রদেরও অবারিত আসা যাওয়া চলবে। তারা যেখানে পড়তে চাইবে সেখানে পড়তে পারবে। লোকগীতি, বাউল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাংলা ফিল্ম প্রভৃতির সর্বত্র প্রচার হবে। সংস্কৃতির দিক থেকে আমরা অবিভক্ত। যেমন জার্মানী ও অস্ট্রিয়া। বাংলাসাহিত্যের একটাই ইতিহাস। সেখানে রবীন্দ্রনাথের পাশেই নজরুলের, জীবনানন্দের পাশেই জসীমউদ্দীনের স্থান। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ভেদবুদ্ধি থাকবে না। বাংলাভাষায় মুসলমানদের দান সেই আলাওলের যুগ থেকে চলে এসেছে, অথচ অনেকেই জানত না। এখনো জানে না। সকলেরই জানা উচিত।

(শ্রীমনকুমার সেনের প্রশ্নের উত্তর

এপার ওপার

॥ ১ ॥

রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ বিলুপ্ত হয় নি, এক-আধ বছরেও বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই। তবে জনমত আর এই ধরনের হিংসা প্রতিহিংসা সহ্য করতে রাজী নয়। সকলেই চায় নিরাপত্তা। সে জন্যে সরকারের হাতের মুঠো আগের চেয়ে শক্ত। সরকার যা করছেন জনসাধারণ তার সমর্থক। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে যদি কেউ আন্দোলন করেন তবে জনসাধারণের আপত্তি হবে না। কিন্তু এই দৈনন্দিন অশান্তি তার চরম সীমায় গেছে। জনগণ জানতে পেরেছেন এটা বিপ্লব নয়। সত্যিকারের বিপ্লব যাতে না আসে তার জন্যে দেশের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান আগে থেকেই করতে হবে। ভূমিহীনকে ভূমি, কর্মহীনকে কর্ম দিতে হবে। এ দুটি না হলে অসন্তোষের জড় মরবে না। মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা দেবে।

বুদ্ধিজীবীরাও আর দশ জন মানুষের মতোই অভাব অনটনে অনাচারে অবিচারে দিশেহারা। তাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিশ্চয়তা নেই। সমগ্র সমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা এসেছে তার প্রতিকারও বুদ্ধিজীবীদের সাধ্যায়ত্ত নয়। হতাশা তাদের মধ্যে দিনকার দিন গভীর হচ্ছে। ধর্ম তাদের আগের মতো সান্ত্বনা দিচ্ছে না। তবু ধর্মের মধ্যেও তাঁদের অনেকে সান্ত্বনা খুঁজছেন। বেশীর ভাগই এঁরা রাজনীতির দ্বারা বিভ্রান্ত। অথচ সুস্থ রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মোট কথা সমাজে বা রাষ্ট্রে কোথাও একটা সুস্থিরতা চাই। তা যতদিন না আসছে ততদিন বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমার চোখে দেখতে হবে।

॥ ২ ॥

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পশ্চিম বাংলার আত্মপ্রত্যয় বাড়বে। বহুদিন থেকে বাঙালীরা আত্মপ্রত্যয়হীন। দেশ যখন স্বাধীন হয় নি

তখন তারা বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছিল ও গৌরবময় স্বপ্ন দেখেছিল। পার্টিশনের প্রচণ্ড ধাক্কায় সব স্বপ্ন তছনছ হয়ে যায়। সব স্বার্থত্যাগ নিষ্ফল মনে হয়। এখন পার্টিশন যদিও মুছে যায় নি, তবুও তার কুফলগুলো দূর হতে যাচ্ছে। দুই পারের বাঙালীর সম্পর্ক এখন থেকে স্বাভাবিক হবে। এখন নতুন করে স্বপ্ন দেখতে হবে যে দুই পারের বাঙালী আবার অভিন্নহৃদয় হবে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা কেউ ভারতের কোল ছাড়তে রাজী হবেন। ভারতেই তাঁদের চিরস্থায়ী স্থান। ও-পারের বাঙালীদের সঙ্গে এ-পারের বাঙালীদের তুলনা হয় না। ও-পারের বাঙালীদের পাকিস্তানে স্থান ছিল অচিরস্থায়ী। সেই জন্যে পাকিস্তান থেকে তাঁরা বিদায় নিয়ে নিজেদের আলাদা একটা স্থান করলেন। বাংলা-দেশ তাঁদের চিরস্থায়ী স্থান। পাকিস্তান অস্থায়ী স্থান ছিল। ভারত সম্বন্ধে এ-পারের বাঙালীরা কি এমন কথা কোনোদিন বলতে পারেন? সে জন্যে আমার মনে হয় বাংলাদেশের মতো আর একটি বঙ্গভাষী রাষ্ট্র ইতিহাসে আবির্ভূত হবে না। পশ্চিমবঙ্গ চিরকাল ভারতের সামিল থাকবে।

॥ ৩ ॥

ভারতে যে গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে সেটা অন্যান্য দেশের তুলনায় গর্ব করার মতো। লজ্জা করার মতো নয়। আমাদের চেয়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা অনেক অনেক বেশী। আমরা তাদের তুলনায় নিতান্তই আনাড়ী। তাদের চেয়ে শতগুণ বাধাবিঘ্ন মাথায় করে গণতন্ত্রের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। তা হলেও আমাদের আত্মসন্তোষের সময় আসে নি। পদে পদে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এই গণতন্ত্র জনগণের সমর্থন হারিয়ে ব্যর্থ হয়ে না যায়। কিংবা লীডারশিপের অভাবে বন্ধ্যা না হয়। আর সমাজতন্ত্র কথাটার সংজ্ঞা এখনো নির্দিষ্ট হয় নি। কয়েকটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে

পাব্লিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেই সমাজতন্ত্র হয় বলে আমাদের ধারণা—কিন্তু সেইটুকুতেই সমাজের রূপান্তর ঘটে না। কিছু শ্রমিকের বেতন সামান্য বাড়ালেও যা হয় তা সামাজিক রূপান্তর নয়। কতকগুলি ভূমিহীন কৃষককে জমি পাইয়ে দিলেও যা হয় তাকেও আমি সামাজিক রূপান্তর বলব না। সব কিছুই আমরা খণ্ড দৃষ্টিতে দেখছি। অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখছিনে। যাঁরা দেখছেন তাঁরা আবার টোটালিটেরিয়ান। তাঁদের হাতে পড়লে গণতন্ত্র মরবে। গণতন্ত্রের কবরের ওপর যার প্রতিষ্ঠা তেমন সমাজতন্ত্র আমার ধ্যান নয়। ভারতের লোক গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে সমাজতন্ত্র লাভ করতে চায়। কিন্তু কবে কতদিনে কেমন করে তা সাধারণ লোক বোঝে না। অসাধারণরাও কি বোঝেন? কাজেই আমাদেরকে প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হতে হবে যে, আমরা যেন অনিশ্চিতের জন্যে নিশ্চিতকে না হারাই। সমাজতন্ত্রের জন্যে গণতন্ত্রকে না হারাই।

॥ ৪ ॥

বাংলাদেশ মোটের ওপর ভারতকেই অনুসরণ করবে। তবে প্রত্যেকটি বিষয়ে নয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল, এখন তাকে সার্থক করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সব নাগরিককে তাদের ন্যূনতম প্রাপ্য দিতে হবে। এটা শুধু টাকাপয়সার নিরিখে নয়। সুযোগ সুবিধা, কর্মসংস্থান, অন্নসংস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় নিরিখে। সেখানকার নেতারা এখন থেকেই গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাও করতে চান। দেশটা কৃষিভিত্তিক বলে তাঁদের বাধাবিঘ্ন আমাদের চেয়ে কম। তাহলেও সব জমি তাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারবেন না। কিন্তু কতক জমি সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করতে পারা যাবে। চাষী, মাঝি, জেলে, কারিগর প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী যদি সমবায় প্রথা মেনে নেন তা হলে সেটাও এক-

প্রকার সমাজতন্ত্র হবে। ওখানকার লোকের মধ্যে একতার অভাব নেই। এতদিন ছিল লীডারশিপের অভাব। এখন ওরা যে লীডারশিপ পেয়েছে তা অভিনন্দনের যোগ্য। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব জনগণের দিক থেকে অপোজিশন পাবেন না। যাদের দিক থেকে পাবেন তারা এমন কিছু শক্তিশালী নয়। কাজেই তাঁর পথ অপেক্ষাকৃত সুগম।

॥ ৫ ॥

অবিভক্ত বাংলাদেশ যখন ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিত তখনকার ও এখনকার অবস্থা এক নয়। আজকের ভারতে প্রত্যেকটি রাজ্য আত্মসচেতন হয়েছে। নেতৃত্বের ব্যাপারে কেউ কারো পেছনে পড়ে থাকতে চায় না। সেইজন্যে এখনকার নিয়ম হচ্ছে সবাইকে নিয়ে ক্রিকেট টীম গঠনের মতো রাজনৈতিক টীম গঠন এই কাজে গান্ধীজী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সেই কৃতিত্ব ক্রমে ক্রমে ইন্দিরা গান্ধীতে বর্তেছে। এটা বাঙালী অবাঙালীর প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, কে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হবার যোগ্য। রাজনৈতিক ক্রিকেট খেলায় ভবিষ্যতে হয়তো একজন বাঙালীকে ক্যাপ্টেন রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাঙালী সব সময় কাপ্তেনী করবে এটা দুরাশা।

॥ ৬ ॥

বাংলাদেশে যে রকম জুলুম হয়েছে সে রকম জুলুম ইতিহাসে আর কোনো দেশে হয়েছে কিনা সন্দেহ। সেই চ্যালেঞ্জ-এর উত্তর দেবার জন্যে ওখানকার যুবসমাজ মুক্তিসেনা গঠন করেছে ও ভারতের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছে। তাদের পেছনে স্বদেশের জনগণও ছিল, বিশ্বের জনমতও ছিল। এ-পারের তরুণদের সম্মুখে তেমন কোন অত্যাচারী শত্রু নেই। শত্রু বলে যাদের মনে

হচ্ছে তাদের নির্বাচনে গদিচ্যুত করতে পারা যায়। যেটা ও-পারে অসম্ভব ছিল। সুতরাং এখানে মুক্তিসেনা বা সে রকম কোন সেনা গঠনের আবশ্যকতা নেই। তেমন কিছু করতে গেলে স্বদেশের জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে না। বিশ্ব জনমতও পেছনে দাঁড়াবে না। বাইরে থেকে কেউ সাহায্য করলে সেও দেশের মিত্র নয়। দেশের শত্রু। সুতরাং ওপারের দৃষ্টান্ত দেখে এপারের তরুণদের অনুকরণ করবার মতো যদি কিছু থাকে তবে তা মুক্তিসেনার আকার না নিয়ে অন্য আকার নেবে। ইচ্ছে করলে এদেশে 'ল্যাণ্ড আর্মি' গঠন করা যায়—যারা জমিতে গিয়ে কাজ করবে। কিংবা পীস আর্মি গঠন করা যায়—যারা শান্তিরক্ষা করবে। আর যারা হাতিয়ার নিয়ে লড়তে চায় তারা ভারতের সৈন্যদলে নাম লেখাতে পারে। কিন্তু প্রাইভেট আর্মি গঠনের কোন অধিকার নেই আমাদের এদেশের সংবিধানে। ওদেশে সংবিধান ছিল না বলেই যেটা সম্ভব হয়েছে এদেশে সংবিধান থাকতে সেটা সম্ভব নয়। তরুণদের এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের এ সংবিধান একটা আশীর্বাদ। এটা আছে বলেই ভারত আছে। নয়তো ভারতও পাকিস্তানের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। আমরা যে ডালে বসে আছি সে ডাল কাটব না। কাটলে আমাদেরও সর্বনাশ।

অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। এখানকার অবস্থা ওখানকার মতো নয়। এজন্যে তরুণদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হবে।

(•শ্রীউমাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তর। তাঁর দ্বারা অনুলিখিত।)

জাতীয় ঐক্য

॥ ১ ॥

এই প্রসঙ্গে জাতি বলতে নেশন বুঝতে হবে। কাস্ট কিংবা রেস কিংবা সম্প্রদায় নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বীকৃত হয়ে যায় যে নেশনমাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। সেই অধিকারেই পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়। ভারতবর্ষের নেতারা অতদূর না গেলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকেই ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবী করেন। পরে আবার শোনা গেল ভারতবর্ষের মুসলমানরা নাকি একটি সম্প্রদায় নয়, তারা একাই একটা নেশন। একথা সত্য হলে শিখরাও একাই একটি নেশন, খ্রীস্টানরাও একাই একটি নেশন, পার্শীরাও একাই একটি নেশন। এ নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয় তার মীমাংসা হয় না, বেধে ওঠে সব জায়গায় বিরোধ। অনেক জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামা। সংবিধান তৈরি করার অধিকার বহু সাধনায় অর্জিত হয়, অথচ সংবিধানসভায় দুই একজন বাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যোগ দেন না। তাঁদের অনুপস্থিতিতে সংবিধান তৈরি করে চালাতে গেলে তাঁরা বলতেন তাঁদের উপর জোর করে চাপানো হয়েছে, তাঁরা অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করতেন। তাঁদের স্বধর্মী সৈনিকরাও তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করতেন। গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে অধিকাংশের ভোটে গৃহীত সংবিধান চাপানো সম্ভব নয় বলে ব্রিটেনও পেছিয়ে যায়, কংগ্রেসও পেছিয়ে যায়। কারণ অধিকাংশ এ ক্ষেত্রে হিন্দু। আর অল্পাংশও বড়ো কম নয়, প্রায় দশ কোটি। সেইজন্যে মুসলমানরা একটি সম্প্রদায় হলেও তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। সেটা মেনে নেবার ফলেই সর্বসম্মত সংবিধান রচনা সুগম হয়। সংবিধান রচনার কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়। ততদিন অপেক্ষা

না করে ব্রিটেনও ক্ষমতার হস্তান্তর করে চলে যায়। ওদিকে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্র আর কিছুতেই সংবিধান তৈরি করতে পারে না। সম্প্রদায়কে নেশন বলে ভুল করার মাশুল যে কী ভয়ঙ্কর তার নমুনা পাকিস্তান। বহু কষ্টে যদি-বা একটা সংবিধান রচনা করা গেল হঠাৎ একদিন মিলিটারি ডিকটেটরশিপ এসে সে সংবিধান বাতিল করে দিল। তার বদলে চাপালো গণতন্ত্রবিরোধী এক সংবিধান। সেটা গেছে কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান প্রণয়ণের অধিকার হরণ করে নতুন ডিকটেটর আবার আরেক সংবিধান চাপাতে যাচ্ছেন। সেটাও হবে গণতন্ত্রবিরোধী। সম্প্রদায়-ভিত্তিক নেশন একটা অনাসৃষ্টি।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষ এমন একঠি ভূখণ্ড যাকে দেশ বলতেও পারা যায়, মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মরণাতীত কাল থেকে লক্ষিত হচ্ছে ভারতবর্ষ কখনো বা একচ্ছত্র শাসকের অধীন কখনো বা ছত্র-ভঙ্গ। কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ বলে যে দুটো শক্তি আছে দুটোই এখানে সমান সক্রিয়। একটা শক্তি বহুকে একসঙ্গে গেঁথে একসাথে রাখতে চায়। আরেকটা শক্তি এককে বহুধা করে বিকীর্ণ করতে চায়। এই তো বছর পঁচিশ আগে ছ'শোটা দেশীয় রাজ্য ছিল। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ রাজ্য, ফরাসী রাজ্য, পর্তুগীজ রাজ্য। এখন মাত্র দুটি রাষ্ট্র আছে, একটির নাম ভারতীয় ইউনিয়ন. অপরটির নাম পাকিস্তান। দুটি রাষ্ট্র মানে দুটি কেন্দ্র। মোটের উপর কেন্দ্রাতিগেরই জয় হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে এমন শক্তিশালী কেন্দ্র আমাদের ইতিহাসে আর-কোনো আমলে দেখা যায়নি। ব্রিটিশ ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জীবনের এত-গুলো বিভাগ ছিল না। পাবলিক সেক্টর বলতে তখন ছিল একমাত্র রেলওয়ে। এখন ব্যাঙ্ক, ইনশিওরেন্স ইত্যাদি অনেক কিছু। শক্তি-

শালী কেন্দ্র বলতে যা বোঝায় তা কেবল মিলিটারি অর্থে নয়, তা ইকনমিক অর্থেও। তা ছাড়া পলিটিকাল অর্থেও ভারতীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী। এ সরকার মনোনীত সরকার নয়, যেমন ব্রিটিশ আমলে ছিল। ডিকটেটরশিপও নয়, যেমন পাকিস্তানে দেখছি। এ সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক। জনগণের শক্তিতেই এ সরকার শক্তিমান। বহু ভাষা, বহু সম্প্রদায়, বহু অঞ্চল, বহু রেস। তা সত্ত্বেও এই ভূখণ্ড আর একটা আফ্রিকা বা ইউরোপ নয়। এ কি বড়ো সামান্য কীর্তি! কিন্তু তা বলে আমরা যদি আমাদের এই অপূর্ব ঐক্যকে চৈনিক ঐক্যের অনুরূপ করতে যাই তা হলে সর্বনাশ ঘটাব। চীন দু'হাজার বছর ধরে একান্তভাবে কেন্দ্রাভিগ। অর্থাৎ সেখানে সব কিছুই কেন্দ্রীভূত। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বতন্ত্র্য সেখানে স্বীকার করা হয়নি। একটিমাত্র সিভিল সার্ভিস যেমন ব্রিটিশ ভারত শাসন করত একটিমাত্র সিভিল সার্ভিস তেমনি চীন সাম্রাজ্য শাসন করত। সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা চীনই প্রথম প্রবর্তন করে বহু শতাব্দী পূর্বে। এক বছর বা দু' বছরেই রাষ্ট্রপতির শাসনে আমরা হাঁপিয়ে উঠি। চীনদেশের লোক দু' হাজার বছর তার চেয়ে আরো জবরদস্ত শাসন সহ্য করে এসেছে। ভাষার বাঁধন, লিপির বাঁধন, সংস্কৃতির বাঁধনও তেমনি। অতখানি বাঁধন আমাদের ধাতে সইবে না। ভারতবর্ষ অসংখ্য বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের স্বাদ চায়, এক ছাঁচে ঢালা ইউনিফর্মিটির মাঝে ইউনিটির স্বাদ নয়। অনেকেই ইউনিফর্মিটির ভিতর দিয়ে ইউনিটি আনতে চান। তাঁরা অমনি করেই বিদ্রোহ ডেকে আনবেন। পাকিস্তান ওই করেই চৌচির হচ্ছে। ভারতও হতে পারে।

('পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার প্রশ্নের উত্তর।)

দুই দেশ

॥ ১ ॥

ভারত বরাবরই বলে এসেছে যে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেরাই স্থির করবেন তাঁরা কী রকম রাজনৈতিক সমাধান চান। তাঁরা যদি স্থির করতেন যে তাঁরা পাকিস্তানেরই অঙ্গ হিসেবে থাকবেন ও যথাসম্ভব বেশী স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করবেন তাহলে ভারত তাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতো। ভারত প্রত্যাশা করেনি যে তাঁরা হঠাৎ একদিন তাঁদের শাসকদের সঙ্গে বিরোধের দরুণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসবেন। তাঁরাই প্রথমে স্বীকৃতির জন্যে ভারতের কাছে অনুরোধ পাঠান। ভারত অপেক্ষা করে ও আশা করে যে পাকিস্তানের শাসকদের সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরোধ ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে। কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও দেখা গেল যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেকেরই নাম কেটে দিয়ে তাঁদের মুল আসনে উপনির্বাচন করা হচ্ছে এবং গত নির্বাচনে যাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন তাঁরাই বিনা দ্বন্দ্বে নির্বাচনে জয়ী বলে ঘোষিত হচ্ছেন। তাঁদেরই সহায়তায় কর্তৃপক্ষ স্বরচিত একটা সংবিধান দেশের উপর চাপিয়ে দিতে যাচ্ছেন এবং তাঁদেরই সহায়তায় কেন্দ্রে ও প্রদেশে তাঁবেদার সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। এইভাবে রাজনৈতিক সমাধান কখনই হতে পারে না। কারণ এর পেছনে জনগণের সমর্থন নেই। ইতিমধ্যে এক কোটি শরণার্থীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভরে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও শরণার্থী যে আসবে না তার নিশ্চয়তা কী? তারপর পূর্ববাংলার সমস্তক্ষণ যে মুক্তির সংগ্রাম চলেছে ও তার ফলে উভয় পক্ষে যে রক্তপাত ঘটেছে তাতে ভারতকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এই রকম অশান্ত অবস্থা অনন্তকাল চলতে পারে না।

সুতরাং পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। যুদ্ধ ঘটল বলেই স্বীকৃতিও অনিবার্য হয়ে উঠল। স্বীকৃতির ফলে ভারতীয় সৈন্য ও বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী এক সঙ্গে লড়াই করতে পারছে। এতে উভয়েরই সুবিধে। ভারতের স্বার্থ বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শরণার্থীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন, বাংলাদেশের স্বার্থ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা।

॥ ২ ॥

বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্র আছে এবং তারা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তবে বাংলাদেশও পারবে। আমাদের ঘরের কাছেই রয়েছে নেপাল, বর্মা, সিংহল ও আফগানিস্থান। আর একটু দূরে থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, লাওস, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। তবে কিছুদিনের জন্যে বাংলাদেশকে দেশরক্ষার জন্যে ভারতের মুখাপেক্ষী হতে হবে। আশা করা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সে তার নিজের সৈন্যদল, নৌবহর ও বিমান বহর গড়ে তুলতে পারবে। আসল কথা সে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে পারবে কি না? আজকালকার দিনে ষোল আনা স্বাবলম্বন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। স্বয়ং ইংলণ্ড এখন ইউরোপের 'কমন মার্কেট'এ যোগ দিচ্ছে। ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তান মিলে 'কমন মার্কেট' তৈরী করতে পারে। বাংলাদেশের মাটি উর্বরা, মানুষগুলিও পরিশ্রমী। ভাগ্যক্রমে যদি কোন রকম খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই সমৃদ্ধশালী হবে। জলপথ ও সমুদ্রপথের উন্নতি করলে বাণিজ্যও হবে সমৃদ্ধির অপর একটি কারণ। তাছাড়া শিল্পের বিকাশও চাই, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উপরও জোর দিতে হবে।

॥ ৩ ॥

সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশে ধর্মের বৈচিত্র্যের জন্যে নয়। হিন্দু-মুসলমান সাত শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। কেমন করে পাশাপাশি বাস করতে হয় তারা তা জানে। সাম্প্রদায়িকতার আসল কারণ চাকরি বাকরির জন্যে প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই ও ধনবৈষম্য। বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী স্বার্থও কাজ করছে।

আমাদের ঝগড়াগুলো উপর থেকে দেখলে ধর্মগত বলে মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সেগুলো অনেক সময় শ্রেণীগত। আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমরা আমাদের ঝগড়াঝাটি মিটমাটের জন্যে সরকারের কিংবা আদালতের কিংবা শালিসদের শরনাপন্ন হব। আইনকে নিজের হাতে নেব না। আমার বিশ্বাস সাম্প্রদায়িকতা ইতিমধ্যে কমেছে এবং আরও কমবে।

॥ ৪ ॥

বাংলাদেশের সরকার যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অপূর্ব মর্যাদা দিয়েছেন। এমন মর্যাদা ভারতও দেয় নি। তাঁরা মনে প্রাণে বাঙালী। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সমান আপনার। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী সাহিত্যিকদের তাঁরা আপনার লোক বলে মনে করেন। ওপারের বাঙালী পাঠকরাও আগ্রহের সঙ্গে এপারের বাঙালীদের রচনা পাঠ করেন, গান শোনেন, ছবি দেখেন। এরকম উদার মনোভাব এপারেও ধীরে ধীরে আসছে। আরও আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধের জন্যে আসে নি। এখন আর রাজনৈতিক বিরোধ নেই। সুতরাং ওপারের কবি, গায়ক, অভিনেতা ও লোকসাহিত্যিকরা এলে এপারে সর্বত্র

অভ্যর্থনা পাবেন। এমনি করে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সুগম হবে। তখন দেখা যাবে যে আমরা একই বৃন্তে ছুটি ফুল। বাংলাদেশ তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুক, তাকে পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণ বা অনুসরণ করতে হবে না। ঢাকাও কলকাতার মতো আরও একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র হোক। কলকাতার একাধিপত্য দূর হওয়া উচিত ছিল, দূর হয়েছে বলে আমি দুঃখিত নই। ঢাকাও আমাদের, কলকাতাও আমাদের। জার্মানীর যেমন বার্লিন ও অস্ট্রিয়ার যেমন ভিয়েনা, পশ্চিমবঙ্গের তেমনি কলকাতা এবং বাংলাদেশের তেমনি ঢাকা। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উভয় নগরে সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধশালী করবেন, যেমন জার্মানরা ও অস্ট্রিয়ানরা করছেন।

('পয়গামে'র প্রশ্নের উত্তর)

এবারকার পঁচিশে মার্চ

বাংলাদেশ যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। তার জন্যে যা দেবার তা দিয়েছে। হয়তো ওর চেয়ে কম দিলেও চলত। কিন্তু তা হলে আরো কিছুকাল দেরি হতো। আমার ধারণা ছিল ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ না বাধিয়ে ইয়াহিয়া খান্ শেখ মুজিবের সঙ্গে সন্ধি করতে হাত বাড়িয়ে দেবেন। সন্ধিসূত্রে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। রাতারাতি নয়, রয়ে সয়ে। কিন্তু দেখা গেল সেটা হবার নয়। যেটা হবার সেটাই হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। এ স্বাধীনতা ১৪ই আগস্টের সেই স্বাধীনতার মতো নয়। সেবারেও সেটা স্বাধীনতাই ছিল। পরাধীনতা নয়। তবু সেটার আড়ালে একটা ফাঁকি ছিল। মুসলিম লীগ তলে তলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তার প্রতি-পক্ষের সঙ্গে নয়। বছর কয়েক পরে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। বাগদাদ তথা সীয়াটো চুক্তিতে। পরবর্তীকালে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হলো। চীনের সঙ্গে চুক্তি দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হলো যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তি তখনো বলবৎ।

এই প্রথম দেখা যাচ্ছে সেন্টো ও সীয়াটো চুক্তি বাংলাদেশের বেলা বলবৎ নয়। চীনের সঙ্গে চুক্তিও তার বেলা প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে চুক্তিমুক্ত। সে এখন পাকিস্তানের মতো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিতে বাধ্য নয়। সে এখন ভারতের মতোই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেইজন্যে তার স্বাধীনতা ১৪ই আগস্টের সেই স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনীয় নয়।

সেবারকার স্বাধীনতার আড়ালে আরো একটা ব্যাপার চাপা ছিল। ভারতের সঙ্গে সব বিষয়ে বিরোধীভাব। যেন বিদেশীদের

অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে যে পাকিস্তান বরাবর ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করবে, বিদেশীদের স্বার্থে ঘা লাগলেই পাকিস্তান তাঁদের ইঙ্গিতে কাজ করবে। পাকিস্তানের উপর ভারত বিশ্বাস রাখতে পারেনি। রাখতে পারলে মিটমাট বহুদিন পূর্বেই ঘটতে পারত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আড়ালে ভারতের প্রতি বিরোধীভাব নেই। তার উপর ভারতের ষোল আনা বিশ্বাস আছে। তার সঙ্গে যখনি যে বিষয়ে মিটমাটের দবকাব হবে তখনি মিটমাট হবে। সে যেন আফগানিস্থান। তার অধিকাংশ লোক ধর্মে মুসলমান, অথচ রাজনীতিক্ষেত্রে নিরপেক্ষ। যেমন আফগানিস্থানের। ভারত আফগানিস্থানের মতো আর একটি বন্ধুরাষ্ট্র চেয়েছিল। এতদিন বাদে পেয়েছে। বাংলাদেশও এই সম্পর্কের ভিতর আপনার চিরস্থায়ী স্বাধীনতা অনুভব করবে।

বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ

স্বাধীনতা এমন জিনিস নয় যা কখনো বিনা ত্যাগে ও বিনা তপস্যায় পাওয়া যায়। যদি কেউ বিনা ত্যাগে বা বিনা তপস্যায় পায় তাহলে তা রাখতে পারে না। হারিয়ে ফেলে।

লীগপন্থী মুসলমানদের ধারণা ছিল যে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই স্বাধীনতা। তেমন স্বাধীনতা তারা তপস্যা করে পায়নি, ত্যাগ দিয়ে পায়নি, পেয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামশেষে সংগ্রামের ফলের একাংশ হিসেবে। কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে তাদের সেই স্বাধীনতা চক্রান্তকারী পাঞ্জাবীদের হাতে চলে গেছে। চক্রান্তকারীরা দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশের কাছে প্রকাশ্য বা গোপন চুক্তি করে বিকিয়ে দিয়েছে। পরিশেষে সেই স্বাধীনতা সামরিক কর্তাদের হাতে চলে যায়। তারা সোজাসুজি ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করে। জনসাধারণ তখন ধর্মের ঘোরে অচেতন, তাই বুঝতে পারেনি কী ভাবে বিড়ম্বিত হয়েছে। ধীরে ধীরে শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতারা উপলব্ধি করেন যে সত্যিকার স্বাধীনতা তাঁদের দেশের লোক পায়নি, যেটা পেয়েছে সেটা স্বাধীনতার একটা ঠাট। সেজন্যে তাঁরা প্রথমে ছ'দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। এই দাবীর ভিত্তিতেই তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয়লাভ করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, তাই সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু দেখা গেল পাকিস্তানের শাসকচক্র কোনরূপ সম্মানজনক মীমাংসায় সম্মত নন। শেখ মুজিবুর রহমানের দল প্রথমে করলেন অহিংস অসহযোগ ও প্রমাণ করে দিলেন যে সর্বসাধারণ তাঁদের পশ্চাতে। তাতেও সামরিক শাসকদের চৈতন্যোদয় হল না। তাঁরা

উল্টোপথ ধরলেন, সামরিক দাপট দিয়ে সাড়ে সাত কোটি লোকের অন্তরের কামনাকে দমন করতে চাইলেন। ফলে জনতাও সশস্ত্র বিদ্রোহের আশ্রয় নেয়। মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী ভারত প্রথমে এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে চায়নি, কিন্তু যখন ভারতের উপর এক কোটি শরণার্থী চাপিয়ে দেওয়া হল তখন ভারতকেও বিশ্বের সর্বত্র আবেদন নিবেদন করে বলতে হল যে পূর্ব বাংলায় একটি রাজনৈতিক সমাধান একান্ত আবশ্যক। তা না হলে শরণার্থীরা ফিরে যাবে না এবং ভারতকে আত্মরক্ষার জন্যে যা দরকার তা করতে হবে। অনেকদিন অপেক্ষা করেও রাজনৈতিক সমাধান ঘটতে দেখা গেল না, বরঞ্চ দেখা গেল একটি খামখেয়ালী সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে এবং একটি তাঁবেদার সরকার খাড়া করে সামরিক কর্তারা আড়াল থেকে রাজ্য পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অপরিহার্য। দুনিয়ার অন্যান্য শক্তিরা জেনেও জানলেন না, পাকিস্তানের উপর চাপ দিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দানে বাধ্য করলেন না। সময়মতো সেটা যদি ঘটত তাহলে হয়তো যুদ্ধ এড়ানো যেত। পাকিস্তান বোধ হয় ভেবেছিল যে যুদ্ব বেধে গেলে সে একদিকে যেমন কিছু হারাবে তেমনি আরেক দিকে কিছু পাবে। পূর্ব বাংলার কতক জায়গার বদলে কাশ্মীরের কতক জায়গা। কিন্তু ঘটনাচক্র সর্বত্র তার বিরুদ্ধে গেল। সে পূর্ব বাংলা তো হারালই, কাশ্মীরেও বিশেষ কিছু পেল না। পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত ক্ষিপ্ত হওয়ায় সামরিক কর্তারা বিদায় নিতে বাধ্য হলেন ও তাদের ক্ষমতা চলে গেল ভুট্টো সাহেব ও তাঁর দলবলের হাতে। তাঁরা নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যে পূর্ব বাংলার অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়েছেন। পূর্ব বাংলা এখন প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে এবং নিজের নতুন নামকরণ করেছে 'বাংলাদেশ'। তার সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে যে তত্ত্ব তার নাম বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্ব এখন সাতকোটি বাঙালীর কাছে অর্থহীন। তারা এখন মনে প্রাণে ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও মুসলমানরাই সেখানে সংখ্যাগুরু তথাপি তাদের আদর্শ এখন ভারতেরই মতো আরেকটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। উপরন্তু তারা এখন সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। দেখে শুনে মনে হয় যে, সমাজতন্ত্রের দিক দিয়ে তারা ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, সেখানে এত বেশি কায়েমী স্বার্থ নেই ও ক্ষতিপূরণের বোঝা এমন দুর্বহ নয়।

তবু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে এখন পদে পদে হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যেমন ত্যাগ ও তপস্যাসাপেক্ষ, দেশের পুনর্গঠনও তেমনি ত্যাগ ও তপস্যাসাপেক্ষ। সংগ্রামের একটা উন্মাদনা আছে, পুনর্গঠনের সেরূপ কোন উন্মাদনা নেই। সেজন্যে পুনর্গঠন অত্যন্ত নীরস। দেশের লোক যদি শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশমতো গঠনমূলক কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ নিরন্নকে অন্ন জোগাতে পারবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র জোগাতে পারবে, কর্মহীনকে কর্ম জোগাতে পারবে ও গৃহহীনকে গৃহ জোগাতে পারবে। এবং আরো পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি বন্দরে তাদের বাণিজ্যের জাহাজ দেখা যেতে পারবে। বাণিজ্য করতে গিয়ে কতক লোক বিদেশে বসবাস করবে, সেইভাবে বাংলাদেশ তার বিপুল জনসংখ্যার ভার থেকে আংশিকভাবে মুক্তি পাবে। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি যেমন করে হোক নিবারণ করা চাই, নয়তো ঐটুকুন দেশে কুলোবে না। তবে একটা বিষয়ে বাংলাদেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে—ভারত তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু তাকেও ভারতের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করতে হবে। ভারত যদি বোঝে যে বাংলাদেশের দিক থেকে তার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তাহলে ভারত অকারণে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করবে না, শান্তির পথ ধরে চলবে ও সেই পথে নিজে সমৃদ্ধ হবে ও বাংলাদেশকেও সমৃদ্ধির অংশ দেবে

আয়ারল্যাণ্ডের লোক যেমন বিনা ছাড়পত্রে ইংল্যাণ্ডে এসে জীবিকার সংস্থান করে বাংলাদেশের লোকও তেমনি বিনা ছাড়পত্রে ভারতে এসে কাজকর্ম জোটাতে পারবে। ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করে পাকিস্তানের লাভ কতটুকু হয়েছে জানিনে, কিন্তু পাকিস্তানের যে অংশটির নাম এখন বাংলাদেশ সে অংশটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এখন যদি উভয় দেশের নেতারা একসঙ্গে বসে যাবতীয় বিবাদ বিসম্বাদ আপোসে নিষ্পত্তি করে নেন তাহলে সহযোগিতার ফলে উভয় পক্ষই লাভবান হবেন।

বাংলাদেশ থাকবেই। ভারত বাংলাদেশকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না, বাংলাদেশও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় না। যাঁরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দেন তাঁরা যেন এমন অবাস্তব দাবি না তোলেন যে অখণ্ড বাংলাদেশ আবার ফিরে আসুক। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ তিনভাগে বিভক্ত থেকে যাবেই এক ভাগের নাম ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, আরেক ভাগের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও তৃতীয় ভাগের নাম পাকিস্তানী ফেডারেশন।

আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানও একদিন হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি হবে ও সেখান থেকে যে সব হিন্দু ও শিখ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তাঁরা সসম্মানে ঘরে ফিরে যাবেন ও মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুখ দুঃখে একাত্ম হয়ে বসবাস করবেন। গত পঁচিশ বছর একটা বিভীষিকা—এটা কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সবাই মিলবে ও মেলাবে, কেউ বাদ যাবে না। পাকিস্তানের লোক যদি মনে করে থাকে যে আমাদের চেয়ে চীন বা মার্কিনরা, আরব ইরানী বা তুর্কীরা তাদের আরো বেশি আপনার লোক তাহলে সেটা তাদের ভ্রম। তারা যেদিন ভ্রম থেকে মুক্ত হবে সেদিনই আমাদের আনন্দ সমাপ্ত হবে। আজ অর্ধসমাপ্ত।

মৈত্রী মেলা

বাংলাদেশ মৈত্রীপরিষদের দিক থেকে এটা প্রথম প্রচেষ্টা। আমার দিক থেকে কিন্তু তৃতীয় প্রচেষ্টা। আমার দিক থেকে প্রথম প্রচেষ্টা ছিল শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলা। সে আজ উনিশ বছর আগেকার কথা। সাহিত্যমেলায় আমরা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার পঁচিশজন সাহিত্যিককে জমায়েৎ করতে চেষ্টা করি। সমসংখ্যকের প্রত্যাশা করা তখনকার দিনে ছিল স্বপ্ন। তাই পূর্ববাংলার ভাগে পড়েছিল পাঁচ, পশ্চিমবাংলার ভাগে বিশ। পূর্ববাংলা থেকে আমন্ত্রিত পাঁচজনও আসতে পারলেন না, এলেন তিন। আরো দু'জন এসেছিলেন পর্যবেক্ষকরূপে, প্রতিনিধি রূপে নয়। মেলার আলোচ্য বিষয় ছিল বিগত পাঁচ বছরের বাংলাসাহিত্য। তাকেও পাঁচটি বৈঠকে বিভক্ত করা হয়েছিল। লোকসাহিত্য। কথাসাহিত্য। কাব্য। নাটক। প্রবন্ধ। এ ছাড়া আরো কয়েকটি অনুষ্ঠান ছিল। তার একটি তো কফি পার্টি। অনেক রাত পর্যন্ত কফি খাওয়া আর গান গাওয়া। কাজী মোতাহার হোসেনের মতো বিদ্বান ও বর্ষীয়ানকে দিয়ে গান গাওয়ানো। মেলার একটা অনুষ্ঠান বহির্ভূত দিক ছিল আড্ডা। সেইজন্যেই তার নাম রাখা হয়েছিল মেলা। সেইভাবে পূর্ব পশ্চিমের মেলবন্ধন হয়।

আমরা পূর্ব পশ্চিমকে আবার জোড়া দিতে চাইনি। আমাদের কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। তবে আমাদের তরুণ কর্মীরা একুশে ফেব্রুয়ারি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেইভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের মতে দেশ দু'ভাগ হলেও ভাষা এক, সাহিত্য এক, সংস্কৃতিও এক। সে সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতি। তাকে অমিশ্র করা কারো সাধ্য নয়।

পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মেলা বসবে, এই ছিল আমার পরিকল্পনা। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হিসাবনিকাশ হবে বাংলাসাহিত্য কতদূর অগ্রসর হলো বা হলো না। আশা ছিল আরো বেশী প্রতিনিধি ওপার থেকে আসবেন। সম্ভব হলে সমসংখ্যক। কিন্তু ঘটনার গতি হলো বিপরীতমুখী। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। আমিও হাল ছেড়ে দিলুম। বছর নয় পরে হাল তুলে নিলেন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত। এবার শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতায়। এবার মেলা নয়, সভা। তাঁর ধারণা ছিল সময় অনুকূল। নিমন্ত্রণ করলেই ওপার থেকে সাড়া পাওয়া যাবে। নিমন্ত্রণ করার ভার পড়ে আমার উপরে। নিমন্ত্রণ করে চিঠি লেখা হয়। কিন্তু একটি কি দুটি ছাড়া উত্তর আসে না। ঢাকার কাগজে আমার চিঠির প্রতিলিপি বেরিয়ে যায়। সম্পাদক লেখেন যে পশ্চিমবঙ্গে একটা গভীর চক্রান্ত চলেছে। অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরাই তো গতবার কলকাতার দাঙ্গায় প্ররোচনা জুগিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকরা যেন সাবধান হন। ফাঁদে পা না দেন। সত্যি, একজনও এলেন না।

কলকাতার দাঙ্গায় আমাদের ভূমিকা ওপারের লোক কেমন করে জানবেন? জানতেন যদি এপারে আসতেন, স্বকর্ণে শুনতেন, স্বচক্ষে দেখতেন। ছলে বলে কৌশলে তাঁদের আসা বন্ধ হলো। আমি আবার হাল ছেড়ে দিলুম। বুঝতে পারলুম যে যা করবার তা আমরা এপারে এককভাবেই করব, ওপারেও ওঁরা এককভাবে করবেন। মিলিতভাবে করা আপাতত অসম্ভব। চিঠিপত্র লিখে কেন কাউকে বিপদে ফেলা? ওপারের পুলিশ ওঁদের সন্দেহ করবে। আমি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও বন্ধ করে দিই।

ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে। এবার উদ্যোগী হয়েছেন বাংলাদেশ মৈত্রীপরিষদ্। কলকাতার প্রতিষ্ঠান। এবার সাহিত্যমেলা নয়, সংস্কৃতি ও মৈত্রী মেলা। এবার যোগ দিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন ওপার থেকেই একশো পাঁচজন কি তার

কাছাকাছি। এপার থেকে আরো বেশী। সব মিলিয়ে তিনশো ছাড়িয়ে যাবে, চারশোয় দাঁড়াতে পারে। এবার বসবে কবিসম্মেলন, তিনটি অধিবেশন তো নিশ্চিত, দরকার হলে আরো একটি। তার উপর আধ ডজন সেমিনার। বিচিত্র বিষয়ে। সাহিত্য তাদের একটি, ভাষা তাদের একটি।

এর উপর যাকে বলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার বিপুল আয়োজন হয়েছে। সংস্কৃতির সংজ্ঞার মধ্যে লোকসংস্কৃতিও পড়ে। তার কতক নমুনা আমরা জড়ো করেছি। কিন্তু সমগ্রের তুলনায় ছিটেফোঁটা। প্রধানত এটা দুই দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের মেলা। এইখানেই এর সীমাবদ্ধতা। এটা কুম্ভমেলাও নয়, কেন্দুলীর মেলাও নয়। এইজাতীয় মেলা এই প্রথম, যদি সাহিত্যমেলাকে বাদ দিই। দেশের মাটিতে এ গাছ টিকবে কি না সন্দেহ। আগে তো পায়ের তলায় মাটি পাই। তারপরে সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে পা বাড়াবার কথা ভাবব।

কুম্ভমেলার, কেন্দুলীর মেলার বিশেষত্ব সেখানে সাধুসমাগম হয়। আমাদের এই মেলার বিশেষত্ব সাধুসমাগম নয়, সুধীসমাগম। সাধুরা এদেশে চিরকাল সম্মান পেয়ে এসেছেন, জনগণ তাঁদের দর্শন পেতে বহুদূর থেকে বহু ক্লেশ স্বীকার করে উপস্থিত হয়েছে। সুধীরাও কি সম্মানের যোগ্য নন? তাঁদের দেখা পেতে কি লোকে অল্প দূর থেকে অল্প ক্লেশ স্বীকার করে হাজির হবে না? এই মেলায় তার পরীক্ষা হবে। বাংলাদেশের গুণী জ্ঞানীদের দেখবার জন্যে কলকাতাশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়বে না হয়তো, তবু ভিড় হবে আশা করি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তাঁরা অনেকেই প্রাণে বেঁচে গেছেন। আর একটু হলেই তাঁদের অনেকের প্রাণ যেত। এই মেলায় আমরা তাঁদের দেখা পেতুম না। সব চেয়ে শোক বোধ করি শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী, মোফজ্জল হায়দার চৌধুরী, জহির রায়হান,

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখ সুধীদের জন্যে, যাঁদের অবর্তমানে আমাদের এ মেলা নিষ্প্রভ।

অনেকেই আমরা সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর বাদে পরস্পরের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। আমি তো ভাবিনি যে এতদিন জীবিত থাকব। দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে যেটা দৃশ্যত অসম্ভব সেটাও সম্ভব হয়। আমি নিজে বেঁচে না থাকতে পারি, কিন্তু এই তরুণবয়সীরা তো বেঁচে থাকবে। এরাই একদিন দেখতে পাবে দেশ জোড়া না লাগলেও দেশের লোকের হৃদয় মন জোড়া লেগেছে। কেউ কারো ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না, যে যার স্বস্থানে থেকে স্বধর্ম পালন করছে, স্বকর্ম সাধন করছে। কে হিন্দু কে মুসলমান এ নিয়ে বাছবিচার উঠে গেছে। ভালোবাসা তাদের এক সূত্রে গেঁথেছে। হিংসা একেবারে অকল্পনীয়। মৈত্রী সর্বস্তরে।

(সভাপতির অভিভাষণ)